Regd. No. C 899.] [৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

শান্তিনিকেতন পত্র

মাঘ, ১৩৩২

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা।] [বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য তিন আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্য্যন্ত "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময়মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দর সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠা ৬৲, আধ পৃষ্ঠা ৩৷৹, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া জানিতে হয়।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৬। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

৭। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৮। পুরাতন বা নূতন গ্রাহকগণ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার সময়ে কুপনে নাম ও ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

পোঃ শান্তিনিকেতন, (বীরভূম) — শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী, কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭ম বর্ষ | মাঘ, সন ১৩৩২ সাল | ১ম সংখ্যা

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

মন্দির, ৭ই পৌষ, ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে।

উদ্বোধন

প্রতিদিনের প্রভাতের মধ্যে নূতন বাণী প্রতিদিন ধ্বনিত হয়। সমস্ত জরার অতীত ক্ষয়ের অতীত যিনি আছেন তাঁরই মুখ অরুণ আলোকে উদ্ঘাটিত হয়, তাঁকে দেখতে পাই, সব অন্ধকার সব শোক দুঃখ তাপ দূর হয়ে যায়। চিরসত্য চিরনবীন, তারই মধ্যে আমাদের আশা। জরা মৃত্যু অন্ধকারের অবসানে সমস্ত আকাশকে পরিপূর্ণ করে প্রতিদিনই সেই অজর অমর অভয়ের বাণী প্রকাশ পায়।

আমাদের জীবনে প্রতিদিনের প্রভাতের এই আশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এই অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চিরনবীন প্রকাশমান না হলে পৃথিবীর মলিনতার ভার অসহ্য হত। মাঝে মাঝে পর্দ্দা পড়ে, আবরণ আসে, নবীন, যা চিরনবীন, যার ভিতর ক্লান্তি নেই, সেই চিরসত্যকে তখন আবার নূতন করে দেখি।

আজকের প্রভাত আমদের কাছে সেই চিরনবীনকে যেন নিয়ে আসে। আমাদের কর্ম্মে, আমাদের সেবায় কত রকম ত্রুটি, কত রকম বিচ্যুতি ঘটে, আমাদের কর্ম্মজীবনের সব ক্লান্তি সব গ্লানি দূর হোক আশ্বাসে, সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। যদি মনে সংশয়

এসে থাকে সব কর্ম্ম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সব বৃথা হল—তবে বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ধুলির আকর্ষণ থেকে উপরে রেখে দিয়েছে সকলকে যে প্রাণ—প্রাণের যে আশ্বাস, তাকে নূতন করে জীবনে গ্রহণ করি, নব জাগরণের কিরণ আজ আমাদের মধ্যে সঙ্গীত জাগিয়ে তুলুক, তার আলোক আমাদের সব চৈতন্য, সব শক্তিকে উদ্বোধিত করে দিক। অজর অমর আশোক যিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের রক্তের মধ্যে প্রাণকে নূতন করে সঞ্চারিত করে দিক।

(উদ্বোধনের পর)

আমাদের পরিচয় কি—যথার্থ যেটি পরিচয় আপনার, তাকে মাঝে মাঝে ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয়। বাইরের নানা বিক্ষেপে নিজের গভীরতম যে স্বধর্ম্ম তাকে বারে বারে ভুলে যাই। সেইজন্য বৎসরে বৎসরে উৎসবের দিনে, আমরা কি, কোন সাধনাকে আমরা গ্রহণ করেছি, নিজেকে তা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হয়। আমাদের সব মলিনতা সব ধুলি ছেড়ে আমাদের জানতে হবে—আমরা কি?

আমাদের এই শান্তিনিকেতনে এই পরিচয়কে জাগ্রত করবার দীক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। দীক্ষা একবারের নয়, পৃথিবীর জ্যোতির দীক্ষা প্রতিদিনের, আমাদেরও বারে বারে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আজ আমরা সত্যের দীক্ষা গ্রহণ করব—যে সত্যকে আমরা স্বীকার করেছি, অথচ যে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে জীবনে সফল করবার শক্তি পাইনি, যাকে বিস্মৃত হয়ে আছি, অপমান করছি—বাইরের সব বিক্ষেপ সব ধুলি জঞ্জালকে দূর করে দিয়ে আপনার ভিতরকার সেই সত্য পরিচয়কে আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

যারা বিষয়ী যারা বিজ্ঞ তারা চারদিকে যা রয়েছে তাকেই হিসাবের মধ্যে আনে। তারা বলে—এই রকমই ঘটে। এই ভাবেই ত সংসার চলে—এবং সর্ব্বদা ঘটে থাকে তাকেই তারা চিরন্তন বলে বিশ্বাস করে, তারা ঠকতে চায় না। তারা ভাবে—সমস্ত সংসারের ধর্ম্ম স্বার্থের দিকে নিজের প্রয়োজনের দিকে; নিজের অহংকারের দিকে তার গতি, আমরা অন্যপথে গেলে বঞ্চিত হব, পৃথিবীতে বিড়ম্বিত হব। তারা উপস্থিতকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে যা আছে তাকেই তারা চরম বলে ধরে নেয়। যারা বাস্তবকে অতিক্রম করে সত্যকে দেখেছেন, বড়কে দেখেছেন তাঁদের এরা উপহাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে। যাঁরা মানুষকে পথ দেখাতে আসেন তাঁরা বলেন না—এইটেই ঘটে, এই হয়ে এসেছে এই দিকেই পৃথিবী চলেছে, এর বাইরে আমাদের সাধনাকে বেশী দূর নিয়ে গেলে আমরা ব্যর্থতার দিকে যাব। তাঁরা বাস্তবের ভিতর এবং বাস্তবকে অতিক্রম করে সত্যকে দেখতে পান, অসাধ্যকে স্বীকার করেন। আমাদের শান্তিনিকেতনে সেই দীক্ষাই আমাদের সেই অসাধ্য সাধনের দীক্ষা।

ইতিহাসে বারে বারে কি দেখিনি, যা স্বভাবসিদ্ধ মানুষ তাকে স্বীকার করেনি! তা যদি করত তাহলে পশুলোকে তার স্থান হত। বর্ত্তমান কালের চারদিকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যেটা অসম্ভব বলে বোধ হয়, তাকেই সে সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পেরেছে, তারই জোরে মানুষ জয়ী হয়েছে। সেই শক্তি আমাদের মনের ভিতর জাগিয়ে

রাখব। আমাদের বেদমন্ত্রে আছে—প্রজাপতি যিনি, তিনি সমস্ত প্রজার মধ্যে আপনাকে জন্ম দিচ্ছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষের মধ্যে সেই প্রজাপতি যিনি তাঁকে দেখব, তিনি পরম সত্য, তিনি সকলের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, এই কথা স্বীকার করব বলে এই শান্তিনিকেতনে এসেছি।

বেদমন্ত্রে হৃদয়কে বলেছে বিশ্বায়তন। সংসার একথা বলে না, সংসারের ক্ষুদ্রতার ভিতর যারা বদ্ধ এ কথা তাদের নয়। যিনি সত্যদ্রষ্টা, তিনিই একথা বলতে পেরেছেন। অসীম বিশ্বের আসন মানুষের হৃদয়, প্রতিদিনের চলিত কথায় এই সত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে, স্বার্থের জন্য, প্রয়োজনের জন্য, মারামারি কাড়াকাড়ি করে মানুষ আমরা এই সত্যকে অস্বীকার করে এসেছি। আজ এই সত্যটি আমাদের ধ্যানের বস্তু হোক, হৃদয়কে বিশ্বায়তন বলে আজ যেন উপলব্ধি করতে পারি!

প্রজাপতির আসন মানুষের মধ্যে। সকল দেশের সকল মনুষের মধ্যে, সকল কালের সকল মানব-ইতিহাসের মধ্যে তিনি বারবার আপনাকে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মোহ তাঁর প্রকাশকে আবরণ করে আছে, এই মোহ দূর হলেই মানুষের সত্যমূর্তি, বিশ্বমূর্তিকে দেখতে পাব। মানুষের দীনতা হৃদয়ে, সেই দীনতা দূর করে, মানুষের মধ্যে অনন্তস্বরূপের যে প্রকাশ তাকে অন্তরের ভিতর গ্রহণ করব, এই দীক্ষা শান্তিনিকেতনে আমরা পেয়েছি!

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের বাণী আমাদের এই দীক্ষাই দিয়েছে। তাঁরা জেনেছেন সেই এক বহুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বহুর মধ্যে এককে খণ্ড করে দেখেন নি। বহুর মধ্যে এক সত্যকে অন্তরের ভিতর উপলব্ধি করতে হবে—পিতামহদের এই অমৃতবাণী আমাদের দীক্ষামন্ত্র। সে মন্ত্রকে প্রতিদিনের সংসার উপহাস করেছে। বিচ্ছেদ, বিরোধ বুদ্ধি তাকে আবৃত করে রাখে। এই প্রচ্ছন্ন সত্যকে আমরা দেখতে পাই না। নানা অপমান, দারিদ্র্য অত্যাচারের তাড়নায় আজ আমাদের মন ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে, নিজের দৈন্য আজ ভোলা কঠিন। কিন্তু এই দৈন্যকেই যদি চরম বলে মেনে নি, এই যা উপস্থিত একেই যদি চরম বলে মানি, তা হলে বুঝতে হবে দৈন্যের শেষ নেই, অপমানের অন্ত নেই। ক্ষুদ্র অধিকার, অতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি, আপনার এত বড় পৈতৃক সম্পদ তার দিকে তাকাবার সময় নেই।

একথা সত্য চারদিকে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে, পরস্পর মারামারি কাড়াকাড়ির অন্ত নেই। এও সত্য, দস্যুবৃত্তি করে ধনী হওয়া যায়, কত জাতি পরজাতির ধন অপহরণ করে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ কি মানুষের ধর্ম্ম? উপস্থিত এই মুহূর্ত্তকেই দেখব, এই মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করে অসীমের ভিতর আমাদের দৃষ্টিকে কি প্রসারিত করব না? এই মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র খাঁচার ভিতর মানুষে মানুষে খোঁচাখুঁচি করছে কাড়াকাড়ি মারামারি করছে, অতি ক্ষুদ্র সে স্থান, এখানেই মানুষের বিশ্ব, এ কথা কি স্বীকার করতে হবে? এই মুহূর্ত্তটুকু মানুষকে যে রকম করে দেখাচ্ছে, সেই দেখাই

কি চরম দেখা? মঙ্গল যে, কল্যাণ যে নিত্য যে সে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, বাহিরের দিক থেকে সে পরাভূত হয়ে রয়েছে, তৎসত্ত্বেও সে সত্য।

আমাদের দেশে একটি মস্ত কথা আছে—ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের হিন্দুসামাজ এই ধর্ম্ম শব্দটিকে যে অর্থে গ্রহণ করেছে সে কত বড়! ধর্ম্ম মানে স্বভাব, যা কোনো জিনিসের প্রকৃতি গত তাই তার ধর্ম্ম। এ কত বড় কথা—মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের স্বভাব। কত বড় বিশ্বাসের কথা এ! প্রতিদিন দেখছি অধর্ম্ম স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা মিথ্যা আপনাকে জাহির করছে, প্রতিদিন তার চারিদিকে মানুষ এই-ই দেখছে, তবু এরই ভিতর থেকে সে কেমন করে বল্লে—মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে সত্য, মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে দয়া, ত্যাগ, মনুষ্যের সত্য তাই, মানুষের প্রকৃতি তাই! চারিদিকে যা রয়েছে যা আমাদের পীড়া দিচ্ছে - যার তাড়নায় ভুল পথে চলেছি, সে যে নেই,—তবুও সব তথ্যকে অতিক্রম করে এত বড় কথা মানুষ কি করে বল্লে—যে ধর্ম্ম মানুষের স্বভাব; সত্য, ত্যাগ, —মানুষের পরিচয়!—কোনও জন্তু ত এ-কথা বলতে পারে না যে তার ধর্ম্ম তার প্রতিদিনের ব্যবহারের চেয়ে বড়, তার প্রতি-দিনের ব্যবহার তার ধর্ম্মের বিরোধী! শুধু মানুষই একথা বলতে পেরেছে। সে বলে মিথ্যা যা আমার মধ্যে আছে, মোহ যা আছে, যা নিয়ে ভুলে আছি, বিরোধ বিদ্বেষ যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছি, সে আমার সত্য নয়, সে আমার প্রকৃতিকে পীড়া দিচ্ছে—সে আমার স্বভাবকে আচ্ছন্ন করছে। কত বড় আশ্চর্য্য কথা এ! সমস্ত ক্ষণকালকে অতিক্রম করে যে সব মানুষ অনন্তকালকে দেখেছেন মায়া মোহের ভিতর দুঃখ ক্লেশ দুর্ব্বলতার ভিতর নিজের শক্তিকে সত্য বলে জেনেছেন, যাঁরা সংসার ধর্ম্ম যা হল স্বার্থের ধর্ম্ম, তাকে অতিক্রম করে নিজের মধ্যে পরমাত্মার জ্যোতিকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, মানুষ সেই সব লোককেই নরোত্তম বলেছে, গুরু বলেছে।

এই সব মানুষকে মানুষ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বড় যখনই বলেছে তখনই সে তার প্রতিদিনকে অস্বীকার করেছে, প্রতিদিনের সংসার ধর্ম্ম, যেখানে ক্লেদ রয়েছে যা তাকে নীচের দিকে টানছে, মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন করছে, তাকে অস্বীকার করেছে। মানুষের ভিতর এই যে এত বড় একটা বাণী রয়েছে তাকে অবিশ্বাস করব? চিরদিন সমস্ত মানুষের ইতিহাসে এই সত্য আপনাকে বিকাশ করতে চেষ্টা করেছে, আজকে কি একে অস্বীকার করব?—এবং বলব মানুষকে মানুষ মারবে কাটবে, মানুষ যুদ্ধ করবে তা নইলে মানুষের ইতিহাস হয় না, মানুষকে মিথ্যা বলতে হবে, বঞ্চনা করতে হবে, না হলে মানুষের চলবে না? যাকে ধর্ম্ম বলি, মানুষের ভিতর যত রকমে যার প্রকাশ হচ্ছে, যার জন্য সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ কত প্রাণপণ করেছে তাকে মিথ্যা বলতে হবে, আর যা পশুধর্ম্ম, যা মিথ্যা মায়া তাকেই কি সত্য বলতে হবে?

মানুষের অপরাধ ত্রুটী পাপ সবই আছে। তবু এ সবকে স্বীকার করেও বলব, মানুষ সত্যকে মেনেছে বলেই আজকের দিনে যা হচ্ছে তা হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই যে মানুষ পরস্পর পরস্পর কাছে বসে আছে, এই যে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পেরেছে, ত্যাগ

করতে পেরেছে যত ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই হোক না কেন, সে কেন পেরেছে? প্রতিদিনের ঘটনাকে অতিক্রম করে সত্যকে বিশ্বাস করেছে বলে পেরেছে। এই বিশ্বাসের উপর আজকে দিনে আমাদের যেটুকু শান্তি সুবিধা আছে তা নির্ভর করছে, সমাজের ভিতর যতটুকু কল্যাণ আছে তা একে নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে নয়, আপনাকে বড় করবার ইচ্ছা থেকে নয়।

ত্যাগের ভিতর মানুষের সমস্ত সভ্যতা কল্যাণ নির্ভর করেছে। মানুষ দেখেছে, যে সমাজে ত্যাগের ধর্ম্ম প্রবল, সে সমাজে শ্রী সে সমাজে শক্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে, শিল্প সাহিত্যে ধর্ম্মে কর্ম্মে তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পেরেছে। তাই সে একথা বলতে পেরেছে। মানুষ দেখেছে, যেখানে মানুষ মানুষে কাটাকাটি করে না—দস্যুবৃত্তির দ্বারা একে অন্যকে পীড়িত করে না, পরস্পরকে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা করে, সেখানে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তাই সে বলেছে ধর্ম্মের জয় হবে, সত্যের জয় হবে। মানুষ যেখানে সত্যকে লাভ করেছে, সেখানে তার মনুষ্যত্ব জয়ী হয়েছে। নানা বিরোধের ভিতর মানুষ পরিচয় পেয়েছে এই পরিচয়ের দ্বারা আপনার ধর্ম্ম যে কি সমস্ত আবরণ ভেদ করে সে বুঝতে পেরেছে।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, অনন্তকালের ভিতর যে সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, সেই সত্যকে লাভ করবার কামনা আমাদের, সেই আমাদের সাধনা। জানি, ঘরে বাইরে এর জন্য আমরা বিদ্রূপভাজন। যাদের স্বার্থ বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল প্রখর তীক্ষ্ণ তারা যে রকম করে আপনাকে প্রকাশ ও প্রচার করছে, আমরা তেমন করে আপনার অহমিকাকে প্রকাশ করছি না, বলে আমাদের অনেকে আজ আক্ষেপ করেন, বিদ্রূপ করেন—বলেন এ সব দুর্ব্বলতা।

মানুষকে একবার বাইরের দিক থেকে ভেবে দেখা যাক। কি সে কামনা করছে, কি ইচ্ছা করেছে, কি ভাবে সে ইচ্ছা জয়ী হয়েছে? মানুষের কখনও পাখা ছিল না, সে পাখী নয় তবু স্বপ্নে ও জাগরণে সে ইচ্ছা করেছে আকাশ পথে সে চলবে। সে ইচ্ছার মত এমনতর অসম্ভব খাপ ছাড়া ইচ্ছা আপাততঃ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তবু ইচ্ছা করার দ্বারাই এ ইচ্ছা জয়ী হয়েছে। মানুষ পরীর রূপ কথায় ইচ্ছা করেছিল কি করে জুতা পায়ে দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সহস্র যোজন পথ অল্পকালের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারে, দূরত্বের যে ব্যবধান কি করলে তা ঘোচান যেতে পারে। যে দিন মানুষ এ ইচ্ছা করেছিল সে দিন উপস্থিতকে তথ্যকে সে দেখেনি, কিন্তু অসম্ভবকে মানুষ ইচ্ছা করেছিল বলেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

ইচ্ছা করার দ্বারা বাস্তব জগতে অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করেছে, কেবল আত্মার সম্বন্ধ, ধর্ম্মের দিকে সে ইচ্ছা খাটবে না, এইকথাই কি বলব? মানুষের অসম্ভব ইচ্ছা কেবল জড় জগতে খাটবে, এই কি বলতে হবে?

মানুষকে ইচ্ছা করতে হবে। এই যে বিরোধী বিদ্বেষ, হানাহানি, এর নিবৃত্তির ইচ্ছা মানুষ যদি না করে তবে সংসারে ধর্ম্ম সংস্থাপন কঠিন হবে। দেশ শুদ্ধ লোক সত্যকে দেখতে

পাবে তা সম্ভব নয়। আমাদের শান্তিনিকেতনে এই প্রার্থনাই আমরা করেছি, আমাদের জীবন সত্য হোক, মানুষের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে পরস্পর পরস্পরকে যে মারছে, এক জাতির প্রতি অন্য জাতির বিদ্বেষ বুদ্ধি সব দূর হয়ে সকলের ভিতর মৈত্রী সংস্থাপিত হোক। আজকের দিনে এ যতই অসাধ্য অসম্ভব বোধ হোক এ আমরা শুনব না—অন্তরের সঙ্গে অনেকে যদি আমরা এই করি তবে তা সিদ্ধ হবে, বহু লোকের অনিচ্ছার ভিতর অল্পলোকের সত্য ইচ্ছা একদিন জয়ী হবে। তার বেশী আশা করব না, করে লাভ নাই নিজের জীবনকে, সাধনকে সত্য করতে হবে। বিদ্বেষ বিদ্রূপ সব মাথায় করে আত্মীয় স্বজন যাদের ভালবাসি তাদের আঘাত সহ্য করে, একলা চলতে হবে।

এই দীক্ষা আমরা আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের কাছে পেয়েছি। তাঁরা বলেছেন সেই এক বস্তুর মধ্যে, ব্রহ্ম সকলের মধ্যে প্রকাশমান—

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মা-
লোকাদমৃতা ভবন্তি

স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে সেই একের প্রকাশ তাঁকে পেলে অমৃতত্ব লাভ করব, মুক্তির আর কোনও পন্থা নেই। যে মুক্তি আমরা চাই, সে ঠেলাঠেলি মারামারির জিনিস নয়। আমরা অমৃতকে চাই মুক্তিকে চাই, সকলের মধ্যে সেই পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চাই। —ক্ষুদ্র বৃহৎ আত্মীয় পর নিজের দেশ পরের দেশ, নির্ব্বিচারে সকলের মধ্যে সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করবার এই যে মুক্তির দীক্ষা, এ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি।—আজকের দিনে অন্যদেশের বাঁধিবুলি, ইতিহাসের নানা মোহের দ্বারা একে ভুলবার যতই ইচ্ছা করি, যতই স্পর্দ্ধা প্রকাশ করি, যতই বিদ্রূপ করি ভারতবর্ষের এ বাণী থাকবে, আমাদের একজনও যখন কেউ থাকবে না, তখনও এ থাকবে। ভারতবর্ষের সেই বাণী জীবনের মধ্যে সত্য হোক! আমাদের সাধনায় সোপান হোক। পশ্চিমের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, ঠেলাঠেলি মারামারি বিরোধ বিদ্বেষ জাগিয়ে সেই চরম সত্যকে অস্বীকার করবার মোহ আজকের দিনে আমাদের দূর হোক!

পূর্ব্ব পিতামহেরা যে হোমাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন, আজকের এই অন্ধকারের দিনে, তারই ভস্মের ভিতর থেকে আগুণ নিয়ে আমাদের বাতি জ্বালতে হবে। পৃথিবীর সামনে, সমস্ত বিরোধের সম্মুখীন হয়ে বলতে হবে, প্রজাপতি যিনি তাঁর প্রকাশ সমস্ত মানুষের মধ্যে, এই সত্য আমরা পেয়েছি—যত দুঃসাধ্যই হোক এই সত্যকে আমরা প্রচার করব। আমি জানি না কে এই সত্যকে গ্রহণ করবে। কে করবেন না। সত্যভাবে স্বীকার করার উপর সব নির্ভর করে। সত্যকে বাহিরে মৌখিক কথায় বিকৃত করা চলবে না। সত্যভাবে যদি একজনও একে স্বীকার করতে পারেন, সব মোহ, সব উপহাস, সব বিরুদ্ধতার বড়ের মুখে একজনও যদি এই চাওয়াকে যদি সমস্ত জীবন দিয়ে ঢেকে রক্ষা করে চলবার দীক্ষা যদি গ্রহণ করতে পারেন, তবে আমরা ধন্য হব, তিনি আশ্রমের যোগ্য হবেন।—যে পরিমাণে আমাদের ভিতর এই অমৃতকে অস্বীকার আছে সেই পরিমাণে থেকেও আমরা এখানকার নয়।

আজ এ কথা স্মরণ করবার দিন, আমরা যারা আশ্রমে আছি, এই চাওয়াকে যদি স্বীকার না করে থাকি, তবে আমরা এ আশ্রমের নয়—এ আশ্রম আমাদের অন্নদিক, জ্ঞানদিক, শান্তি-দিক, এ আশ্রমের ভিতর প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য আছে তা ভোগ করি, তবু আমরা এর কেউই নয়, যদি এই আশ্রম-লক্ষ্মীর সত্যকার যে অন্ন আছে, সেখানকার নিমন্ত্রণ যদি গ্রহণ না করি। অমৃতের পুত্র আমরা একথা যদি এখান থেকে না জেনে গেলুম, তবে কিছুই আমাদের জানা হল না। আশ্রমের বাইরে আমাদের যে বন্ধুরা আছেন,—আজ যাঁরা আমাদের উৎসবে এসেছেন তাঁদেরও আজ এই কথা বলবার দিন—নানা বুদ্ধি নানা চিন্তা নিয়ে তাঁরা এসেছেন, দেশহিত লোকহিত সম্বন্ধে তাঁদের নানা ধারণা, তাঁদেরও আমাদের কথা শোনাতে চাই। এ আমাদের বাণী নয়, এ ভারতবর্ষের বাণী, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের বাণী, আমাদের কণ্ঠে ভাল করে আজও প্রাকাশ পায় নি, তাই তাঁকে প্রকাশ করতে পারছি না, সমস্ত জীবন দিয়ে ডাকতে পারছি না, তাই সকলে ছুটে এসে পড়েন নি।

নবযুগ এসেছে হিংসা লোভ মোহের মেঘ দিগন্ত বিস্তৃত করে আছে বলেই কি বলব, সকাল হয় নি? প্রভাত এসেছে। পূর্ব্বারুণ মেঘে ঢাকা, ধরিত্রী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তবু বলব প্রভাত এসেছে, মেঘ দূর হবে দিকমণ্ডল উজ্জ্বল করে সূর্য্য উঠবে।

যা আছে, তার ভিতর যা থাকা উচিত তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে না হলে চারদিকের ভারে অভিভূত হয়ে, বহুকাল পূর্ব্বে সে নিঃশেষ হয়ে মরে যেত। সংসারের সহস্র পাপে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে রয়েছে কে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? আত্মার মধ্যে তার স্থান আছে বলে সংসারে সে আছে, সংসারের সমস্ত অপরাধের ভিতরও মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে, এই হচ্ছে মানুষের পরিচয়।

শান্তিনিকেতন সকলকে সেই আহ্বান করেছে। যাঁরা বিশ্বাস করেন সমস্তের উপর সত্যজয়ী হবে, কল্যাণ জয়ী হবে, ধর্ম্ম জয়ী হবে, যাঁরা বিশ্বাস করেন—

স্বল্পমপ্যস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ

তাঁরা আসুন, পূর্ব্বপুরুষদের এই বাণী জীবনে গ্রহণ করুণ। ধর্ম্মের বড় আয়তনের দরকার হয় না। গৃহের এক কোণে যখন দীপ জ্বলে ওঠে, তখন পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারময় থাকে না। দুজন চারজনের মধ্যে প্রকাশ যদি হয়, বাকী ত্রিশ কোটীর মধ্যে যদি নাও হয়, তবু বুঝতে হবে ধর্ম্ম জয়ী হয়ে, সে স্থান পেয়েছে কেউ তাকে মারতে পারবে না। এই বিশ্বাসকে অটল রেখে, বাংলাদেশের এই এক প্রান্তে, পূর্ব্ব পুরুষের কাছ থেকে যে অগ্নিকে পেয়েছি, তাকে প্রাণপণে রক্ষা করতে পারি। আমাদের মধ্যে যে প্রজাপতি আছেন, সকল প্রজার মধ্যে যাঁর স্থান সকলের মধ্যে যাঁর প্রকাশ, তাঁকে যেন দেখতে পাই।

ওঁ অসতোমা সদ্গময়।

সমুদ্র তীরে

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দুচারিটি কথা লিখেছিনু লীলাভরে
শুয়ে শুয়ে একা আনমনে বালু পরে।
বেশী কিছু নয়, শুধু নাম আপনার,
আর তারি পাশে—কি হবে ব'লে সে কা'র!
সমুখে গরজে অসীম অতল জল
ম্লান জ্যোৎস্নায় দুলিতেছে টলমল।
বালু আছে পড়ে, বেঁকে গেছে দূরে দূরে
ঢেউ তারি কোলে ছুটে আসে ঘুরে ঘুরে।
আকাশেতে চাঁদ, চারিদিকে দিশাহারা
স্বচ্ছ গগনে জ্বল জ্বল বহু তারা।
কেন যে একলা এরি মাঝে লিখিলাম
জানিনা কি ভেবে তোমার আমার নাম॥

বেড়ে গেলে রাতি, ঘরে এনু ধীরে ধীরে
ঝাউ-দেওয়া পথে ছায়া আলো ছিল ঘিরে।
আকুল হাওয়ায় ঢেউ-ভাঙা গরজনে
কোন্ কাতরতা উদাসিল সারা মনে—
অসীমে হারানো ভীরু প্রেম ক্ষণ ভুলে
যে-বাণী তাহার রেখে যেতে চায় কূলে,
ছুটেচলা কাল বিলয়ের তুলিকায়
নিমেষে কেন তা নিঃশেষে মুছে যায়?
স্বপনে মিলন কোথা জাগরণ তা'র
ভোরের আলোয় রবে কি স্মরণ আর?
ভাবি স্রোতে ভেসে কোথা পাবে পরিণাম
বালুতটে লেখা তোমার আমার নাম॥

পথ-আঙিনায় মধুরের সমাবেশ.
চকিতে কে আসে, মিলায় নিরুদ্দেশ।
ফুলে ফাল্গুনে রঙে রঙে দোলে ছবি
বন পটভূমি সে-ই থাকে, যায় সবি।
আর থাকে আলো আকাশ অসীম হ'য়ে
কি জেনেছে তা'রা কি হবে ভেবে তা ল'য়ে।
আমরা দুজনে শুনেছি দূরের বাঁশি
কোথা হ'তে এসে দুজনায় ভালোবাসি!
না হ'লে কি হত!—এই সুখে আঁখিজলে
স্বরগ-ভরসা চমকে হাসির ছলে!
সে-পাওয়ার পথে পাঠায়ে মনস্কাম
লিখিনু স্বপনে তোমার আমার নাম॥

প্রথম নিদ্রা

হে আদি-দম্পতী আমি ভাবিতেছি বসে
আদিম ধরাতে যবে প্রথম প্রদোষে
স্বপ্নের ইঙ্গিত ভরে সন্ধ্যা তারাটির
মৃগয়ানিবদ্ধধনু শিথিল-শরীর
এলাইয়া দিল দেহ প্রথম নিদ্রায়
তব প্রিয়তম ধীরে—সে রহস্য হায়
কি বিস্ময়ভীতি তব সঞ্চারিল মনে!
আকুল আগ্রহে তুমি তারে ক্ষণে ক্ষণে
নাড়া দিলে—বারে বারে নামখানি ধরে
ডাকিলে কতনা বার অভিমান ভরে!
কবরী-বিচ্যুত ফুল গুঁজে দিলে হাতে,
নিল না সে পড়ে গেল প্রথম সে রাতে।
তারপরে কখন্ যে স্বপ্নের আভাসে
আপনি পড়িলে ঢলি প্রিয় বাহুপাশে।

উর্ব্বশী

[একজন তরুণ রূপদক্ষের অন্তর্জীবনী]

১

বিদিশানগরীর রাজ-চিত্রশালায় আজ বড় ব্যস্ততা। আগামী কাল চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে স্বয়ং বিদিশাধিপতি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরকে পুরস্কৃত করিবেন। দূর দূরান্তর হইতে—গ্রাম হইতে—নগর হইতে—ছোট বড় সকল চিত্রকরের নিকট হইতেই—এখানে প্রদর্শিত হইবার জন্য বহু চিত্রপট আসিয়াছে! সেই সমস্ত চিত্র যথাযথ স্থানে স্থাপন করিতে চিত্রশালাকে সুসজ্জিত করিতে—চিত্রশালার কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত ব্যস্ত! স্বয়ং চিত্রাগারাধ্যক্ষ ক্ষীণ-শশাঙ্ক তাঁহার আসন্ন বার্দ্ধক্যকে অতি উৎসাহে এই কয়দিনের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছেন! তাঁহার শুভ্র উত্তরীয় বসন্তের শেষ-পুষ্প সৌরভের ন্যায় বাতাসে উড়িতেছে। মাথায় তাঁহার বিস্তৃত টাকের মরুভূমির মধ্যে এক-গোছা কাঁচা পাকা চুল—অবিন্যস্ত! বাড়ী হইতে আসিবার সময় ক্ষীণ-শশাঙ্ক উত্তমরূপে বার্দ্ধক্যের একমাত্র সহায় এই চুল কয়টিকে সুচারুরূপে বিন্যস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এমনি তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে মুহুর্মুহু কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা ব্যতীত তিনি কিছুতেই স্বস্তি বোধ করেন না! কিন্তু আবার রাজ-চিত্রাগারাধ্যক্ষের সৌন্দর্য্য জ্ঞান এত তীব্র যে যখনই এই শ্রস্ত কেশরাশির উপর চোখ পড়িতেছে অমনি যেন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া চুল পরিপাটি করিবার জন্য ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন! ব্যস্ততার মাত্রার সঙ্গে তাঁহার কেশরাশিতে অঙ্গুলি সঞ্চালনের মাত্রা আজ বাড়িয়া চলিয়াছিল; চিত্রশালার দেয়ালে টাঙানো আয়নার সংখ্যাও কম ছিল না; বারেবারেই তাঁহার চোখ সেই প্রতিবিম্বিত অসম্বদ্ধ কেশের উপর পড়িতেছিল; বারে-বারেই তিনি তাহা পুনরায় পরিপাটি করিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিতেছিলেন। এই দুর্ব্বলতা-টুকু তাঁহার ছাত্রদের অগোচর ছিল না; তাহারা অনেক সময় গুরুর এই অভ্যাস-টুকুতে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিত। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার বুকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কালো মেঘ কোমল ছায়াপাত করিয়া যাইত! এমিতর ছোটখাট দুর্ব্বলতাই প্রতিভাকে স্নিগ্ধ করে নহিলে কি বিশ্ববিজয়ী প্রতিভাবান্‌দিগের দিকে মানুষ তাকাইতে পারিত।

চিত্রশালার স্ফটিকস্বচ্ছ ভিত্তি প্রান্তে কারু-খচিত স্বর্ণদণ্ডে চিত্রগুলি গুণানুসারে সজ্জিত হইতেছিল। ছোট বড় মাঝারি নানাবিধ চিত্রপট! রঙীন ছবিগুলি একদিকে; অসংখ্য চিত্রকরের বিচিত্র তুলির হিল্লোলে রঙের তরঙ্গ উঠিয়াছে একদিকে; বর্ণের সহিত বর্ণের অবিমিশ্র মিলন যাহা চোখে পড়ে কিন্তু সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ভিন্ন করা যায় না; কোথায়

যে এক বর্ণ শেষ হইয়া অন্য বর্ণের দিগন্ত আরম্ভ হইয়াছে—তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য; বর্ণের অবিশ্রাম শ্রাবণ যেন কোন জাদুকর তুলির রেখায় রেখায় চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে; যেন শারদ সন্ধ্যাকাশের ক্ষণিক মেঘমালা অস্তমান রবিরশ্মির বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় লীলায়িত!

অন্যদিকে সেই ছবি—যাহা চোখের চেয়ে কল্পনাতেই স্পষ্ট দেখা যায়! বর্ণ-বিরল তুলির মর্ম্মস্পর্শী অতি ক্ষুদ্র রেখাগুলি সঙ্গীতাবসানের অনুরণনের মত, সুখরাত্রিশেষে স্মৃতিসুখের মত—দৃশ্য জগতের দূরতম দিগন্তর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে সাড়া দিতেছে—তাহা প্রতিধ্বনির মতই স্বচ্ছ অচ্ছোদ মধুময়!

রাজ্যের ছোট বড় সকল চিত্রকরের ছবিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কেবল দুই জনের দুইখানি ছবি এখনও আসে নাই! একজন রাজ চিত্রকর পুরন্দর—অন্যজন রাজ্যের অন্যতম চিত্রশিল্পী অনিরুদ্ধ! সকলে ইহাদের ছবির জন্যই উদ্‌গ্রীব ভাবে অপেক্ষা করিতেছে! ছবি আসিবার এখনও একদিন সময় আছে! পুরন্দর রাজ-চিত্রকর কাজেই রাজ্যের মধ্যে খ্যাতি তাহার বেশী কিন্তু সমজ্‌দারের বুঝিত অনিরুদ্ধ শিল্প প্রতিভায় তাহার শ্রেষ্ঠ! অনেকের বিশ্বাস ছিল এইবারকার প্রতিযোগিতায় এই কথাটা প্রমানিত হইয়া যাইবে—তাই এই দুইজনের ছবিই এবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল!

সহসা চিত্রশালার দরজার নিকটে একটা অস্ফুট মৃদুধ্বনির ঢেউ উঠিল; কিরূপ ছবি সংগ্রহ হইয়াছে দেখিবার জন্য পুরন্দর আসিয়াছেন, ক্ষীণ-শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করিয়া লইয়া রাজ-শিল্পীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন!

"নমস্কার"

"নমস্কার—আপনার ছবির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি!" পুরন্দর নিজের দুর্ব্বলতার কথা জানিত—তাই কথাটা তাহার কানে বিদ্রূপের মত লাগিল! আঘাত করিলে যাহারা আঘাত ফিরাইয়া দেয় পুরন্দর সেই দলের লোক। তাহার চোখে তীব্র হাসির একটা জ্বালা দেখা দিল; গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে মরুভূমির বালি যেমন রসলেশহীনতার গৌরবে চক্‌চক্ করিয়া ওঠে তেমনি! একটা অতিক্ষুদ্র হাসির রেখা অধরওষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া পুরন্দর বিনীত ভাবে কহিল "আমার আবার ছবি! যা হয় কাল একটা দেবো' খন।"

পুরন্দর এখন সেই বয়সে পৌঁছিয়াছে যখন ফসল পরিপক্ব হইয়াছে অথচ এখনও পাক ধরে নাই! তাহার প্রতিভার এখনও পাক ধরে নাই বটে কিন্তু তাহার বাড়িবার বয়সও গিয়াছে! এখন তাহার সেই বয়স যখন জগতের উপর হইতে ধীরে ধীরে বৈচিত্র্যের কুয়াশাময় স্বচ্ছ আবরণখানি উঠিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বাস্তবের প্রকৃত রূপটির সীমা রেখাগুলি চোখে পড়িতে থাকে—যখন জ্যোতির বদলে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি চোখদুটিতে আধিপত্য বিস্তার করে!

পুরন্দর দুই বাহু বুকের উপর নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখিতেছিল! চিত্রকরদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত ছিল—তাহারা এই রাজ-শিল্পীর প্রসাদ লাভের জন্য প্রত্যেকেই নিজের ছবিখানির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

ছিল! কিন্তু কোন ছবিই রাজ-শিল্পীর অটুট গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে পারিল না দেখিয়া কিশোর শিল্পীরা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। বাস্তবিক উৎসাহের উপর প্রতিভার কতটাই না নির্ভর করে!

একটি কিশোর শিল্পী পুরন্দরকে খুসী করিবার জন্যই বলিল "এবার বোধ হয় অনিরুদ্ধের ছবি কোন কাজের হবে না?" অনিরুদ্ধের ছবির উল্লেখমাত্র তাহার মুখের উপর কালিমা বুলাইয়া গেল—পুরন্দর তাড়াতাড়ি অন্যত্র সরিয়া গেল! বেচারা ভাবে নাই তাহার এমন দুর্দ্দশা ঘটিবে—সে অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে দলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল—অপর একজন তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

পুরন্দর বিশেষ করিয়া রঙীন ছবিগুলি দেখিতেছিল! রঙীন ছবিই তাহার প্রিয়। তাহার অন্তরের এই বর্ণ-প্রিয়তা যেন তাহার বসন ভূষণে তরঙ্গিত হইয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল! ক্ষীণশশাঙ্ক তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাল ছবিগুলি দেখাইতেছিলেন—পুরন্দর কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র এক একবার মৃদুভাবে মাথা নাড়িয়া এক ছবি হইতে অন্য ছবির কাছে যাইতেছিল!

চিত্রশালার পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়া বকুল তরু পল্লবের গাঢ় সবুজ রং টুকুর উপর একটি অতি ক্ষীণ চিক্কণতা প্রতিফলিত করিয়া অস্তগামী সন্ধ্যা সূর্য্যের শেষ রশ্মিলেখা চিত্রশালার স্ফটিক স্বচ্ছ ভিত্তি গাত্রে অনন্ত প্রতিভার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল! বন-রেখা শূন্য স্তম্ভিত দিগন্তের উপরে অপরিমিত বর্ণ সমাবেশে সূর্য্যাস্তের চিরন্তন আয়োজন চলিতেছিল! শরতের অপূর্ব্ব মেঘরাশি বিধাতার চিত্রশালার ন্যায় কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে অতল অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছিল! এই চিত্রশালাতেও অনাবিল আনন্দ রেখায় রেখায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে চিত্রগুলি ক্ষণিক—কিন্তু যে আনন্দ তাহারা দেয়—তাহা জীবনের অক্ষয় সম্পদ হইয়া স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রান্তদেশ জুড়িয়া বিরাজ করে! কিন্তু বিধাতার এই সান্ধ্য চিত্রশালার আনন্দের স্রোতের অন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার, নীচতার কঠিন শিলারাশি লুকাইয়া থাকিয়া অহরহঃ মানুষকে তার মনুষ্যত্বের উচ্চ সিংহাসন হইতে পলে পলে ধরণীর ধূলি তলে আকর্ষণ করে না! সৌন্দর্য্যের শুভ্র শতদল মৃণালের যে সূত্রে হৃদয়ের গভীরতম স্থানের সহিত নিত্য যুক্ত—নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে চিরদিনের জন্য তাহাকে ছিন্ন করিয়া কেহ কূল রেখা শূন্য অদৃষ্টের স্রোতে ভাসাইয়া দেয় না!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আমাদের পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ এই সংখ্যায় দিবার অভিপ্রায়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা পারি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার বহু কথা আছে। ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আজ এই সঙ্গে দুইটি কবিতা পাঠাইতেছি। ইহা তাঁহার বোধ হয় শেষ রচনা। প্রথম কবিতাটি (দ্বিজের ত্রিভঙ্গ) মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে লিখিত। ৪ঠা মাঘ সোমবার রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, আর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুধবারে শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য তিনি তাহার প্রুফ দেখিয়া দেন। দ্বিতীয় কবিতাটি (ত্রিপথগা আনন্দ লহরী) তাঁহার শেষ রচনা। মৃত্যুর দিন প্রাতে এক আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান আকারে ইহা তিনি সমাপ্ত করেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তিনি কি চিন্তা করিছিলেন। কি উপলব্ধি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অন্য কিছু না বলিলেও ঐ কবিতা দুইটিতেই প্রকাশ পাইবে।. তাহা ছাড়া যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, মনের কথা যাঁহাদিগকে বলিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট নিজের এক বিমল আনন্দের ও পরম শান্তির কথা সঙ্কোচের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীকে ইনি একখানি পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে এইরূপ একটি কথা ছিল যে, তিনি এক এমন শান্তি পাইয়াছেন যাহার পর আর কিছু অভিলাষ করিবার নাই। তিনি বলিতেন বহুদিন পূর্ব্বে একবার তিনি একবার এইরূপ শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও আর তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। (ইহা নারদের প্রথম ভগবদ্ দর্শনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।) বহুকাল পরে আবার তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইত। ভগবানের যে, তাঁহার প্রতি কত করুণা, তিনি যে তাঁহাকে কত ও কেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন ইহা তিনি প্রায়ই বলিতেন। উপনিষদে আছে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পরে বালকের মত থাকিবে। তাঁহার মধ্যে ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। এই যে জীবনের শেষভাগে অনেক সময় অধ্যাত্ম চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার বালকোচিত সরলতা ও বিচিত্র পরিহাস-প্রিয়তা শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। আলস্য তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু লিখিতেন, মৃত্যুর দিনেও ইহার অন্যথা হয় নাই। তাঁহার শেষ কবিতার শেষ দুই লাইন লিখিয়াছিলেন—

"মাথায় করিয়া লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু, রহে যে ধরি চরণ॥"

মরণের ভয়ের কোনো চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা যায় নাই, তিনি অতি স্থির ও শান্তভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই।

৭ই মাঘ রাত্রি, ১৩৩২।

সত্য প্রয়োগ

অথবা

আত্মকথা

(মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি)

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র কর্তৃক অনুদিত

ভূমিকা

চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার একটি নিকটতম সহকর্ম্মীর অনুরোধে আমি আমার আত্মচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হই, এবং উহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ছিলাম, কিন্তু প্রথম পাতা লেখা শেষ হইতে না হইতেই বোম্বায়ে দাঙ্গা আরম্ভ হইল, আর আমার লেখাটি যেমন তেমনিই পড়িয়া রহিল। তারপর কয়েকটি ঘটনা পর পর এই সময় এমনিভাবে ঘটিতে লাগিল, যাহাতে করিয়া পরিশেষে আমাকে যেরবদার কারাগারে অবরুদ্ধ হইতে হইল। সেখানে আমার কারাবাসের সঙ্গী শ্রীযুত জয়-রাম দাস সমস্ত কাজ ফেলিয়া আত্মজীবনীটি সর্ব্বাগ্রে লিখিতে পরামর্শ দিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে জানাই যে, নিজের ধারাবাহিক পাঠের জন্য কতকগুলি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি, সেই সকল পুস্তক শেষ না করিয়া আত্মজীবনীর কথা ভাবিতে পারিব না। যেরবদা জেলে কারাদণ্ডের পূর্ণমাত্রা সময়টুকু যদি ভোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আত্মজীবনী লেখা নিশ্চয়ই সমাপ্ত করিতাম। কিন্তু ঐ কাজে হাত দিতে যখন আরো এক বৎসর বাকি ছিল, তখনই আমার কারামুক্তি ঘটিল। স্বামী আনন্দ সেই প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করায়, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ঘটিত সত্যাগ্রহের ইতিহাস লেখা আমার শেষ হওয়ায়, আমি 'নবজীবন' পত্রিকায় আত্মজীবনী লিখিতে বড়ই উৎসুক হইয়া উঠিলাম। স্বামীজীর কিন্তু ইচ্ছা, আমি উহা পৃথগভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। কিন্তু একেই ত আমার হাতে অতিরিক্ত সময় নাই, তাহার উপর 'নবজীবন' পত্রিকায় যখন আমাকে প্রতিসপ্তাহে কিছু না কিছু লিখিতেই হইবে, তখন কেনই বা না তাহাতে আত্মজীবনী লিখি? স্বামীজী আমার এই কথায় রাজি হওয়ায়, আমি তাহা লিখিতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু জনৈক ধর্ম্মভীরু বন্ধুর মনে ইহাতে খট্‌কা লাগিল। আমার মৌনব্রতের দিনে তিনি আমাকে সেকথা

জানাইলেন যে, "এই দুঃসাহসিক কাজে কেন আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আত্মজীবনী লেখা ত বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশেরই একটা প্রথা। পশ্চিম দেশের প্রভাব যাঁহাদের উপর পড়িয়াছে, প্রাচ্যদেশীয় এমন কাহাকেও আমি জানি না, যিনি নিজের জীবনী লেখেন নাই। আর আপনি লিখিবেনই বা কি? ধরুন, আজ আপনি ধর্ম্মমত বলিয়া যাহা ধরিয়া রাখিয়াছেন, কাল যদি সে সমস্ত পরিহার করেন? অথবা, মনে করুন, আপনি যদি বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে যে সকল লোকেরা আপনার বলা বা লেখা কথার উপর ভর করিয়া নিজেদের চরিত্র গঠন করিতেছে, সেই সকল লোকেদের কি ভুল পথে চালনা করা হইবে না? যদি আপনাকে আত্মচরিত একান্তই লিখিতে হয়, তাহা হইলে এখনও তেমন কিছু লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই,—এই কথাটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা কি আপনার উচিত নয়?

এই যুক্তি সত্য সত্যই আমাকে একটু নাড়া দিল, কিন্তু নিছক আত্মজীবনী লেখা ত আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্যের নানা প্রয়োগ, যাহা আমি আমার জীবনে করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহাই বলিতে চাহি এবং আমার জীবন সত্যের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া উহা আত্মচরিতেরই আকার ধারণ করিবে। ইহার প্রতিপৃষ্ঠায় শুধু কেবল সেই সত্যের প্রয়োগসম্বন্ধেই যদি লিপিবদ্ধ হয়, তাহাতে আমার আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। এই সকল পরীক্ষা ও প্রয়োগের ইতিবৃত্তের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারিলে পাঠক লাভবান্ বই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, ইহাই আমার বিশ্বাস; অন্তত এই বিশ্বাসেই আমি নিজের মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমার যাবতীয় সত্যপ্রয়োগের কথা, শুধু ভারতে নয়, প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছে। আমার কাছে তাহাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই, এবং সেই কারণেই আমার জন্য যে "মহাত্মা" উপাধিটি তাহারা অর্জ্জন করিয়া দিয়াছে, তাহার মূল্য ত আরও কম। অনেক সময় এই উপাধিটি আমাকে মর্ম্মান্তিক ভাবে পীড়িত করিয়াছে এবং উহা যে আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও উল্লসিত করিয়াছে তাহা আমার মনে হয় না। পরন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমার সত্যপ্রয়োগগুলি নিশ্চয়ই আমি বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি, কারণ উহা হইতে রাজনীতিক্ষেত্রে আমি প্রভূত বল ও শক্তি লাভ করিয়াছি, এবং সেগুলি আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। আমার সত্যপ্রয়োগগুলি প্রকৃত পক্ষে যদি আধ্যাত্মিক হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মশ্লাঘার কোন স্থানই থাকিতে পারে না। উহাতে তো আমার দীনতাই প্রকাশ পাইবার কথা। গত জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া আমি যতই ভাবিয়া দেখিতেছি আমার ত্রুটিগুলি ততই আমার কাছে স্পষ্টতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি যাহা লাভ করিতে চাহিয়াছি, যাহা পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি ও একান্ত দুঃখ পাইতেছি, তাহা কেবলমাত্র আত্মোপলব্ধির জন্য অথবা ভগবদ্দর্শনের জন্য। এই লক্ষ্যের অনুসরণ করাই আমার জীবনের একমাত্র ও প্রধান কর্ত্তব্য। আমি মুখে যাহা বলি, অথবা কাগজে যাহা লিখি, আমার রাজনীতিক্ষেত্রের

যাবতীয় কার্য্যকলাপ সেই একই লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হইয়াছে। আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে, আমি যাহা করিতে পারি সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর, তাই আমার সত্যসাধনা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে না রাখিয়া খোলাখুলিভাবে সর্ব্বজন-সমক্ষে ধরিয়াছি এবং তজ্জন্য তাহাদের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব যে কিছুমাত্র লাঘব হইয়াছে, তাহা মনে করি না। আমাদের সকলের জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে, যাহা কেবল আমরা জানি এবং আমাদের অন্তর্যামী জানেন, তাহা আর কেহই জানিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সত্যই কাহাকেও বলা যায় না। সেইরূপ কোন কথা এখানে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য বিষয়টিকে আধ্যাত্মিক অথবা নৈতিক গবেষণা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কারণ ধর্ম্ম ও যা নীতিও তা। কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই ধর্ম্মের যে সমস্ত তত্ত্ব সহজে বুঝিতে ও ভাবিতে সক্ষম, তাহাই এই আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমি যদি নির্লিপ্ত ও বিনীতভাবে উহা বিবৃত করিতে পারি, তাহা হইলে অন্যান্য বহু জিজ্ঞাসু তাঁহাদের সাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় ইহা হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আবার এই সকল প্রয়োগের ফলাফল যে পূর্ণ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এমন কোন দাবী রাখে না। অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া অতি নিখুঁত ও সূক্ষ্ম গবেষণা করা সত্বেও একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যেরূপ তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে একেবারে চরম বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন না, বরং তৎসম্বন্ধে নব নব তথ্যগ্রহণে উন্মুখ থাকেন, তদনুরূপ আমার সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে তাঁহার চেয়ে অধিক কিছুই বলিবার আমার অভিপ্রায় নহে। আমি গভীর আত্মচিন্তা দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া নিজের অন্তর খুঁজিয়াছি, প্রত্যেক মনস্তত্ত্বগত ভাব বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি আমার উপনীত সিদ্ধান্তগুলিকে চূড়ান্ত অথবা অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহি না। কিন্তু একটি কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমার নিজের পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলি আমার কাছে একেবারে ধ্রুব সত্য এবং উপস্থিতকার মত সেগুলিকে চূড়ান্ত বলিয়াই মনে করি। যদি ঐরূপ মনে না করিতাম তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্তগুলির উপর আমার কোন কার্য্যের ভিত্তিই স্থাপন করিতে পারিতাম না। আমি পদে পদে গ্রহণ ও বর্জ্জন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেই অনুসারে কাজ করিয়াছি, এবং যাবৎ আমার অন্তরাত্মা বা বিচারবুদ্ধি তাহাতে সাড় দিবে তাবৎ আমার সেই গোড়ার সিদ্ধান্তগুলিকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব।

আমাকে যদি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রগত মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে আত্মজীবনী লিখিবার প্রয়াস আমার পক্ষে না করাই শ্রেয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হইতেছে কি না ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের নানাবিধ লৌকিক ও ব্যাবহারিক প্রয়োগের একটা বিবরণ দেওয়া ; আমি তাই যে সকল প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখিব মনে করিয়াছি সেগুলির পূর্ব্বে "সত্যের প্রয়োগ অথবা আত্মকথা" এই শিরোনামটি জুড়িয়া দিয়াছি। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আমাদের আচরণগত নানা মূলতত্ত্বগুলিকে অনেকেই সত্য হইতে

পৃথক্ করিয়া দেখেন, আমি কিন্তু সেগুলিকে সত্যের সহিত এক করিয়াই দেখি। আমার কাছে সত্যই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলতত্ত্ব এবং তাহারই মধ্যে নানা মূলতত্ত্বের সমাবেশ হইয়াছে। এই সত্যটি যে শুধু কেবল সত্য কথন তাহা নয়, ইহা সত্য ভাবনাও বটে। ইহা কেবল আমাদের বুদ্ধি-মনের গোচর খণ্ড সত্য নহে, ইহা আমাদের বুদ্ধিমনের অতীত চিরন্তন মূলতত্ত্ব অখণ্ড সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। ভগবানের নানা সংজ্ঞা, অসংখ্য তাঁর রূপ। বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সেগুলি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং এক একবার ক্ষণেকের তরে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। কিন্তু আমি ভগবানকে একমাত্র সত্যরূপেই উপাসনা করি। তিনিই একমাত্র সত্য আর সমস্তই অসত্য। আমি তাঁহাকে এখনও পাই নাই, কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানে লাগিয়া আছি। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাকে যদি আমার প্রিয়তম সামগ্রী উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা করিতে আমি উদ্যত আছি—তাঁহার জন্য আবশ্যক হইলে, আমার মনে হয় প্রাণপর্য্যন্ত, আমি দিতে পারি। কিন্তু যেপর্য্যন্ত সেই পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি না করিতে পারি, সেপর্য্যন্ত আমার বুদ্ধি-মনের গোচর এই খণ্ড সত্যকেই ধরিয়া থাকিব। এই খণ্ডসত্যই ততদিন আমার পথপ্রদর্শক প্রদীপ আমার আত্মরক্ষার একমাত্র আশ্রয়স্থান, যদিও আমি জানি যে, এই পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—শাণিত ক্ষুরের ন্যায় দুর্গম, তথাপি ইহাই এখন আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজতম পথ। আমি অতি নিষ্ঠার সহিত এই পথ ধরিয়া এতদিন চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া হিমালয়ের মত আমার বিপুল ভুলগুলিপর্য্যন্ত আমার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পথ আমাকে নানা দুঃখ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং আমি আপন আলোক অনুযায়ী সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। কতদিন আমি আমার সাধনপথে সেই পরম সত্যস্বরূপ ভগবানের ক্ষীণ আভাস পাইয়াছি, এবং তিনি যে একমাত্র সত্য আর সবই অসত্য, এই দৃঢ় বিশ্বাসটি আমার কাছে দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক যাঁহারা আমার এই লেখা পাঠ করেন, অথবা আমার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানুন কেমন করিয়া এই বিশ্বাসটি আমার মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহারা আমার সাধনপথের সহযাত্রী হউন এবং যদি সম্ভব হয় আমার সত্যানুভূতিটি নিজের বলিয়া গ্রহণ করুন। আর একটি বিশ্বাস আমার মনে উত্তরোত্তর বললাভ করিতেছে, তাহা এই যে, আমার পক্ষে যাহা সম্ভব একটি শিশুর পক্ষেও তাহা সম্ভবপর এবং এই কথা যে বলিতেছি তাহার গভীর যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সত্যানু-সন্ধানের উপায় যতই সহজসাধ্য, ততই কঠিন। অহঙ্কারস্ফীত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু একটি নির্ম্মলচিত্ত শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণই সম্ভবপর। সত্যানুসন্ধিৎসুকে ধূলিকণা অপেক্ষাও দীনতর হইতে হইবে। সংসারের সকল লোকেই পা দিয়া ধূলা মাড়াইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাকে এতই বিনীত হইতে হইবে যে এমন কি ধূলিকণাও তাঁহাকে মাড়াইয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র তখনই তিনি সত্যের একটুখানি আভাস পাইতে পারেন, তাহার পূর্ব্বে কখনই নয়। বিশ্বামিত্র

এবং বশিষ্ঠের কথোপকথনে এই সত্যটি সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্মে শাস্ত্রের নানাস্থানে এই কথার সার পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাঠক যদি গর্ব্বের নাম গন্ধও পান, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সত্যপ্রয়োগের মধ্যে কোথায় কিছু গলদ আছে এবং আমার সত্যালোকের আভাস মরীচিকা বই আর কিছুই নয়। আমার মত শত শত লোক বিনষ্ট হউক, কিন্তু, সত্যমেব জয়তি—সত্যের জয় হউক। আমরা যেন আমার মত ভ্রান্ত মর্ত্ত্যজীবদের বিচার করিতে গিয়া সত্যের আদর্শকে একচুলও এদিক ওদিক করিয়া খাটো না করি।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমার যে সব মতামত বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেগুলি প্রমাণ বলিয়া কেহ যেন ধরিয়া না লন। আমার সত্যপ্রয়োগের ফলাফলগুলিকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহারই আলোকে নিজের শক্তি সামর্থ্য ও অনুরাগ অনুসারে নিজ নিজ সত্যের সহিত মিলাইয়া সকলেই পরখ করিয়া দেখিতে পারেন—ইহার চেয়ে বেশী কিছু আমি প্রত্যাশা করি না। উহাদিগকে উদাহরণস্বরূপ কাজে লাগাইলে, প্রভূত উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহার কারণ যাহা আমি বলা প্রয়োজন মনে করি যতই অসুন্দর হউক না কেন, তাহার কিছুই কমাইয়া অথবা গোপন করিয়া বলিব না, এবং আমার দোষ গুণ ভুল ভ্রান্তি পাঠকদিগকে সমস্তই খোলাখুলিভাবে জানাইব। সত্যাগ্রহরূপ বিজ্ঞানের গবেষণার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য—আমি যে কত ভাল, সে কথা ফলাইয়া তোলা আমার অভিপ্রায় নহে। নিজেকে বিচার করিবার সময় আমি যেরূপ সত্যের মতই কঠোর, অপরকেও তদনুরূপ হইতে বলি।

এই আদর্শের মাপকাটিতে নিজেকে মাপিয়া ভক্ত সুরদাসের মত যেন বলিতে পারি যে, "আমার মত এমন দুর্ব্বৃত্ত ও জঘন্য হতভাগা আর কে আছে? আমি আমার পরম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি এতই ভক্তিহীন অকৃতজ্ঞ।"

যাঁহার আমি সন্তান, আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস যাঁহার আদেশে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার নিকট আমি কত দূরেই না পড়িয়া আছি, এই চিন্তা আমার নিরবচ্ছিন্ন মর্ম্মবেদনার কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার অসৎ-প্রবৃত্তিগুলিই যে আমাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, সে কথা আমি জানি এবং ইহাও জানি যে এখনো তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই।

এইখানে কিন্তু এই পর্য্যন্ত থাক। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রকৃত আখ্যায়িকাটি আরম্ভ করিব।

বিশ্বভারতী সংবাদ

বড়বাবু

গত ৪ঠা মাঘ সোমবার শেষরাত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলিতে গেলে কোনো কষ্ট পান নাই। মৃত্যুকে কত সহজে যে গ্রহণ করা যায়—এই মৃত্যুতে আমরা তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানটি কাহারো চোখে পড়ে নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনেও শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য তাঁহার কবিতার প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য একটু ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহ এই আসন্ন সম্পূর্ণতার কথা বুঝিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ গত ত্রিশ বৎসর হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন যে স্থানটিতে তিনি থাকিতেন তাহার নাম নীচু বাংলা স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। প্রাচীন আমলকী, বট, প্রভৃতি বনস্পতির তলদেশে সযত্ন বর্দ্ধিত জবা, কামিনী, পেয়ারা প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছে বেষ্টিত এই টালির গৃহটি—দক্ষিণে একটি জলাশয় আছে। বর্ষায় স্ফীত হইতে হইতে তাহার জলতল অতিকষ্টে মুখটি উঁচু-করিয়া-রাখা লাল শাপলার দল লইয়া ধীরে ধীরে তীরের তালের গুঁড়ি গুলিকে ডুবাইয়া দিতে থাকে। পরপারে ভুবনডাঙা গ্রামের অস্পষ্ট জন-কূজন জলে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্পষ্টতর রূপে এই নীচুবাংলায় আসিয়া পৌঁছে। বৈশাখের খরায় জলাশয়ের তলাবশেষী জলমধ্যে গো মহিষাদি গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। এই বাংলার শাখায় শাখায় শালিক, কাকের বাসা—বৃক্ষ কোটরে কাঠ বিড়ালীর ঘরকরণা। কাঠ বিড়ালীর দল প্রভাতে কোটর ছাড়িয়া মাটিতে আহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই টালির গৃহের বারান্দা পর্য্যন্ত আসে—উন্নত চাকরের বা তাহার ঘুনসী পরা ছেলেটার পরিচিত তাড়া খায়না—বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে প্রবেশ করে—দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে রৌদ্রে পা রাখিয়া বড়বাবু বসিয়া আছেন সেখানে যায়। মৃদু শব্দে জানাইয়া দেয় ক্ষুধিত তাহারা। খাদ্যের ভাগ চায়—সাহস পাইয়া শালিক আসে, অবশেষে অবিশ্বাসী এবং cynic কাকও দেখা দিতে থাকে। আর আসে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মুনীশ্বরের শিশু ছেলে দুইটা—তাহাদের মুখে নিজহাতে নিজ খাদ্যের অংশ তুলিয়া দিতে দিতে আহার করিতে থাকেন—মনে তাঁহার তখন সেই সব চিন্তা যেখানে ওই ছেলে দুটার কোনো প্রবেশ নাই। ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী অনিলবাবুর ডাক পড়ে—তখন উচ্ছ্বসিত হাস্যের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় শৈশবের ছড়াগুলি লিখিবার ধুম পড়িয়া যায়—যাহার অনেক পরিচয় আমাদের পাঠকগণ পাইয়াছেন।

ঠাকুর পরিবার প্রতিভার যে বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথে তাহার অনেকগুলিই

বর্ত্তিয়াছিল। তিনি কবি, দার্শনিক, মানব প্রেমিক। প্রথম বয়সে তিনি কবিতা লিখিতেন অবশেষে তাঁহা ত্যাগ করিয়া দর্শন শাস্ত্রে মনো-নিবেশ করেন কিন্তু কাব্যের সরসতা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তাঁহার কথা মনে হইলে ইংরাজ কবি কোলরীজের জীবনী মনে পড়ে। সকলেই জানেন কোলরীজের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা অল্পবয়সে সমাপ্ত হইয়াছিল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জর্ম্মাণ তত্ত্ববিদ্যার জটিল ও অহিফেনের অন্ধকার পথে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে স্বপ্নপ্রয়াণের পথ ত্যাগ করিয়া তত্ত্ব বিদ্যার গভীরতায় প্রবেশ করেন। কোল-রীজের সহিত তাঁহার আর একটি ঐক্য আছে কোলরীজের কাব্য কল্পনাপ্রধান, আবেগ প্রধান নহে। তাঁহার বৃদ্ধ নাবিকের গল্প, ক্রিষ্টাবেল এবং কুবলা খাঁর গল্প পাঠকের চারিপাশে ধীরে ধীরে একটি স্বপ্নের কুয়াশা রচনা করিয়া করিয়া দিয়া এমন এক অলৌ-কিক রাজ্যের আভাস সৃষ্টি করি যেখানে স্বপ্ন ও সত্যের প্রভেদ বুঝিবার ক্ষমতা আর থাকে না। কঠিন পাথর ও অশরীরী বাষ্পের মধ্যে প্রভেদ যতই অপরিহার্য্য মনে হোক্ না কেন—আসল যে প্রভেদ তাহা তাহা কেবলমাত্র একটা অবস্থাভেদের অর্থাৎ তাহা নির্ভর করে আবহাওয়ার উপরে—প্রকৃতিগত সে প্রভেদ নহে। সেই রকম স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে যে ভেদ তাহা দেশ ও কালের আবহাওয়ার সাহায্যে স্বপ্নও সত্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে—কোল-রীজের সেই অলৌকিক শক্তি ছিল যাহার প্রভাবে দেশকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বপ্ন সত্য হইয়া দাঁড়াইত। স্বপ্নকে সাধারণত আমরা মনে করি মিথ্যার নামান্তর। স্বপ্ন মাত্রেই যদি মিথ্যা হইত তবে মিথ্যাস্বপ্ন নামে একটা কথা সৃষ্টি হইবে কেন? সময় বিশেষে কোনো সত্যও মিথ্যা। স্বপ্ন ও সত্যের এই আশ্চর্য্য লীলা আছে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থে—স্বপ্নপ্রয়াণে। এই গ্রন্থখানি কবির দোষগুণ উভয়ে বিজড়িত। কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্যার ইহা ইহা সময় নহে। অন্য কোনো বারে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সেই দিন বিকালে ৪ টার সময়ে তাঁহার দেহকে পুষ্প চন্দনে সুসজ্জিত করিয়া ছাতিম তলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার প্রিয় "কর তাঁর নাম গান" সঙ্গীতটি গীত হয়। অবশেষে আশ্রমের উত্তরে খোয়াইএর মধ্যে যেখানে মহেশ্বরের পিঙ্গল জটা জালের মত এক সারি তালগাছ উঠিয়াছে—সেইখানকার শ্মশানে সকলে শবানুগমন করে। মানুষ মৃত্যুর পরে এই পর্য্যন্ত আসিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ও শ্রীকৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

১৪ই মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ছাতিম তলায় শ্রাদ্ধ বাসর হইয়াছিল। ঠাকুর পরি-বারের প্রথামত শাস্ত্রপাঠ করিয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর দান ও বৃষ উৎসর্গাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী ও শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী এই উপলক্ষ্যে বেদ পাঠ করেন।

বিকাল বেলা আম্রকুঞ্জে তাঁহার জীবনী আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গীতা পাঠ করের তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে কিয়দংশ পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বড় বাবুর জীবনীর কয়েকটি ঘটনা বিবৃতি করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বাংলা সমাজের উপর বড়বাবুর প্রভাব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

গত ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু তিথি উপলক্ষ্যে একটি সভার অধিবেশন হয়। অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার এই উপলক্ষ্যটি একটু বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছিল।

৫ই মাঘ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণত্যাগ করেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে পূজনীয় আচার্য্যদেব আর্ট কনফারেন্স উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত নিম্নলিখিতেরা ছিলেন। শ্রীমতী প্রতিমাদেবী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ মরিস, মিঃ বাকে এবং মিসেস্ বাকে। তিনি অধিকদিন লক্ষ্ণৌ থাকিতে পারেন নাই—অকস্মাৎ বড়বাবুর মৃত্যু সংবাদে আশ্রমে চলিয়া আসেন।

বড়বাবুর মৃত্যু সংবাদের তার পাইয়া আমেদাবাদ হইতে মহাত্মাজী পূজনীয় আচার্য্যদেবকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক তার করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় এণ্ড্রুজ সাহেব বড়বাবুর মৃত্যু সংবাদের তার পাইয়া পূজনীয় আচার্য্যদেবকে সমবেদনা সূচক এক তারের খবর পাঠাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি আচার্য্যদেব পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া ঢাকায় গিয়াছেন। সেখান হইতে ক্রমে মৈমনসিং, কুমিল্লা ও আগরতলা যাইবার কথা আছে। তাঁহার সহিত শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমাদেবী আছেন। বিশ্বভারতী কলেজের অধ্যক্ষ নেপালচন্দ্র রায় এতদ্ব্যতীত মিঃ মরিস, অধ্যাপক ফর্মিকী ও অধ্যাপক টুচি আছেন।

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসব

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীনিকেতনের প্রাঙ্গণে পূজনীয় আচার্য্যদেব উপাসনা করেন। তৎপরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনবাসিগণ জলযোগ করেন। দুপুরবেলা বনের মধ্যে বনভোজন হয়। বৈকালে একটি জন-সভায় আচার্য্যদেব বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যাতে সাধারণের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীর কোন্ কোন্ বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কত তাহার একটা হিসাব দিলাম। A'5

পূর্ব্ব বিভাগ

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১২২	৫৩	১৭৫
	শিক্ষা ভবন	
২৩	৯	৩২
	বিদ্যা ভবন	
৪	×	৪
	কলা ভবন	
১০	×	১০
		২২১

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীশশধর সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সত্যব্রত সিংহ কিছুদিন পূর্ব্বে নিউমোনিয়াতে মারা গিয়াছে। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আশ্রম-বাসিগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। গত দুই বৎসর নানাকারণে এই খেলা হইতে পারে নাই। এবার প্রধানত পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা বর্গের উৎসাহে এবং চেষ্টায় সম্ভব ইহা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীগণ ব্যতীত শ্রীমান্ ব্রহ্মব্রত, হীরাসিং এবং নলিনী বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। খেলার পুরস্কার ক্রয় করিবার জন্য ইহারা আশ্রমবাসিদের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া ৬৩৷৷৵০ উঠাইয়া ছিলেন—এতদ্বাবদ ৭৪৷৷৵০ খরচ হইয়াছিল—বাকী টাকাটা ইহারা দিয়াছিলেন।

বুধবার বেলা ১২টায় সময় আশ্রমের ফুটবলের জমিতে খেলা আরম্ভ হয়। ক্রীড়া প্রাঙ্গন রঙীন পতাকায় সজ্জিত ছিল এবং মহিলাদের বসিবার স্থানটি সামিয়ানা টাঙাইয়া ছায়া করা হইয়াছিল।

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৮ রকম খেলার আয়োজন ছিল বড়, ছোট মাঝারি ছেলেদের এবং ছোট বড় মেয়েদের জন্যই বিভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছিল। তন্মধ্য হইতে বিশেষ জ্ঞাতব্যগুলিই আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

উঁচু লাফ

১। কিরণ দাস
২। ধ্রুববাবু

শ্রীমান্ কিরণ ৫′—১″ লাফাইয়া ছিলেন।

পোল জাম্প

১। সুশীল
২। শান্তিময়
৩। নির্ম্মল

শ্রীমান্ সুশীল ৭′—১১″ ইঞ্চি লাফাইয়া ছিলেন।

১০০ গজ দৌড়

১। নলিনী
২। শিবরাম
৩। নন্দদুলাল

৭৫ গজ দৌড় (মাঝারি)

১। প্রাণকৃষ্ণ
২। চিত্ত
৩। দেবেন বর্ম্মা

¼ মাইল দৌড়

১। নলিনী
২। নক্ষত্র
৩। আকুল

তিন-পা দৌড়

১। প্রবোধ ও প্রসাদ

লোহার গোলা নিক্ষেপ

১। নীহার

২। সুশীল

২। কিরণ

ভার উত্তোলন

১। মহারাজ (রান্নাঘরের ঠাকুর)

২। কিরণ

লম্বা লাফ

১। কালীপদ (প্রাক্তন ছাত্র)

২। ধ্রুববাবু

৩। নন্দিনী

½ মাইল দৌড়

১। ঊষা

২। আব্দুল

৩। নক্ষত্র

সাইকেল—ছুট (১ মাইল)

১। শান্তিময়

২। নন্দিনী

সাঁতার ছুট

ইহা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের পুকুরে হইয়াছিল।

১। রঘু সিং (শিক্ষা-ভবন)

২। অক্ষয়বাবু

ছোটদের—

১। ভুপেন

২। চিত্ত (শিক্ষাসত্র)

৩। বেণু (শিক্ষাসত্র)

৫০ গজ দৌড় (ছোট)

১। মনোমোহন

২। সুকুমার

চোখ-বাঁধা দৌড় (ছোট)

১। পরেশ

২। ভূপতি

৩। রাধাকান্ত

আলু-চামচ দৌড় (বড় মেয়ে)

১। ছোট অমিতা

২। অমিতা চক্রবর্ত্তী

হাঁটার প্রতিযোগিতা (ছোট মেয়ে)

১। খুকু

২। সুপ্রভা

৩। বুড়ী

৪। রেণু

সুচ-সুতা দৌড় (বড় মেয়ে)

১। তাপসী দাস

২। লতিকা

৩। যমুনা

উপরোক্ত প্রতিযোগিতা ছাড়া Relay Race ছিল। পুরাতন ও নূতন প্রবেশিকা ছাত্রদের মধ্যে নূতন দল জয়লাভ করেন।

সমস্ত খেলা শেষ হইতে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল। খেলাশেষে শ্রীযুক্তা সুধীরা দেবী সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ আবদুলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রধানত তাহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

গত মাসে পরীক্ষার্থিগণের যে নামের তালিকা আমরা ছাপিয়াছিলাম তাহাতে নিম্ন লিখিত দুইটি নাম বাদ পড়িয়াছিল।

শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী ও শ্রীসুনীতিকুমার মণ্ডল এবং নিম্নলিখিত নাম দুইটি অশুদ্ধরূপে ছাপা হইয়াছিল। শ্রীনীহাররঞ্জন চৌধুরী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ গত দুইমাস কষ্ট সহ্য

করিয়া তিনটি তাঁবুতে বাস করিতেছেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এবার আশ্রমে চারটি দলের সহিত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হইয়াছে। প্রথমটি বর্দ্ধমানের সহিত। ইহাতে আশ্রমের দল ১৩১ দৌড় ও অন্য দল ১৮ দৌড় করিয়াছিল। ইহাতে মিঃ উইলিয়মস ২১ দৌড় তেজেশবাবু ৩৩ দৌড় ও শ্রীমান্ সুধীরঞ্জন ২৪ দৌড় করিয়াছিলেন। এই খেলায় মণিলাল প্যাটেল ১০ ওভারে ৪ জনকে ও বাচুভাই ৮ ওভারে ৬ জনকে শেষ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় খেলাটি হয় শ্রীরামপুর কলেজের সহিত। ইহাতে উভয় পক্ষে সমান-সমান খেলা হয়। ইহাদের সহিত দুই দফা খেলা হয়। প্রথমবার শ্রীরামপুরের দল ৪২ দৌড় ও আমাদের দল ৫২ দৌড় করেন। দ্বিতীয় দফায় শ্রীরামপুরের দল ৮২ ও আশ্রমের দল ৬১ দৌড় করেন। দ্বিতীয় বারে খেলা শেষ হয় নাই—সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে খেলা বন্ধ করিতে হয়—খেলা শেষ হইবার সময় আশ্রমের ৪ জন খেলোয়াড় বাকি ছিল। ইহাদের সহিত খেলায় মিঃ উইলিয়ামস্ ৩৫ দৌড় তেজেশবাবু ১০ দৌড় করেন। মণিলাল ২০ ওভারে ৬ জনকে ও বাচুভাই ৩০ ওভারে ৭ জনকে শেষ করেন।

তৃতীয় খেলা সেন্টপলস্ দলের সহিত হয়। ইহাতে আশ্রম ১০৩ দৌড় ও অন্য দল ৫৬ দৌড় করিতে পারে। এই উপলক্ষে মিঃ উইলিয়ামস্ ৩১ দৌড়, তেজেশবাবু ১৯ দৌড়, বাচুভাই ২৫ দৌড় ও গৌরদা ২৩ দৌড় করেন।

মণিলাল ৩৫ ওভারে ৮ জনকে ও বাচুভাই ১৮ ওভারে ২ জনকে শেষ করেন।

তৃতীয় খেলাটি হয় কলিকাতার Law কলেজের সহিত। এই খেলায় আশ্রমের বিপক্ষ দল জয়লাভ করেন। শ্রীমণিলাল প্যাটেল বর্ত্তমানে আশ্রমের ক্রিকেট দলের কাপ্তান—তাহার উৎসাহে ও পরিশ্রমে এই সব খেলা সম্ভব হইয়াছিল। তাহাকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এ বৎসর আশ্রম সমিতিতে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক মণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত :—

১। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২। শ্রীনেপালচন্দ্র রায়
৩। শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ
৪। শ্রীনন্দলাল বসু
৫। শ্রীজগদানন্দ রায়
৬। শ্রীমতী হেমবালা সেন

সংসদ হইতে নির্ব্বাচিত :—

৭। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন

মনোনীত :—

৯। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
১০। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু
১১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
১২। শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

* * *

শ্রীযুক্ত সত্যজীবন পাল, বি, এ, বি, টি মহাশয় পাঠভবনের ইংরাজী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিতেছেন। আশা করা যায়

তাঁহার আগমনে আশ্রমে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইবে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে পূজনীয় গুরুদেবের বাংলা গান শিখাইবার জন্য আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীরমা দেবী সঙ্গীত বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বাংলা গানে বিশেষ পারদর্শী। তিনি বিদ্যালয়ে ও পরে বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভ করেন। বাংলা গান শিখান ছাড়া তিনি শ্রীমতী হেমবালা সেনকে নারী-বিভাগ পরিচালনে সাহায্য করিবেন।

* * *

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর একটী মোটর বাস আশ্রমকে দান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার দানের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

* * *

পিঠাপুরমের মহারাজা তিন বৎসর কাল প্রতি বৎসর দুই হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। এই দানের জন্য আমরা মহারাজকে ধন্যবাদ দিতেছি।

* * *

সাবোরের শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বসু মহাশয় তাঁহার মৃত কন্যা অমিতা ও অরুণার স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর হস্তে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা হইতে গরীব দুঃস্থদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়া সাহায্য লইতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। সেই জন্য এই টাকা শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগের হাতে দেওয়া হইবে। আশা করা যায় ইহার দ্বারা পল্লীতে কাজের সুবিধা হইবে।

* * *

কলিকাতায় চীনা সভ্য (Chinese Association) আছে, সেই সভ্য অধ্যাপক লিমের কাছে বিশ্বভারতীতে চীনা সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য চারি শত টাকা দিয়াছেন। আর সিঙ্গাপুরের চীনা সভ্য একই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীতে তিন হাজার টাকা ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই সাহায্য পাওয়া যাওয়াতে আমাদের চীনা অধ্যাপক মিঃ লিমকে এখানে আরও কয়েক মাস রাখিবার সুবিধা হইবে।

* * *

পূজনীয় শ্রীজগদানন্দ রায় মহাশয় শান্তিনিকেতন সমিতি হইতে সুরুল সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

রাজর্ষি

নূতন বিশ্বভারতী সংস্করণ

"বালক" পত্রিকার প্রথম ছাপা ও পুরাতন সংস্করণগুলি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে, বিস্তারিত পাঠ পরিচয় সহিত প্রকাশিত হইল।

মূল্য—১৲; বাঁধাই—১।০

TALKS IN CHINA

A collection of lectures delivered in China, during the Far Eastern Tour of the Poet in April and May, 1924.

Demy 8vo, 157 pages, on Antique paper.

Price—Re 1-8

TALKS IN JAPAN

Will be out shortly.

প্রবাহিনী

নূতন গানের বই। "গীতগান," "প্রত্যাশা," "পূজা," "অবসান," "বিবিধ" ও "ঋতুচক্র" এই ছয় ভাগে বিভক্ত। মোট ২৩৫টি গান আছে।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মনোরম ছাপা। উপহারের বিশেষ উপযোগী। ডিমাই আট পেজি, ১৮০ পৃষ্ঠা।

মূল্য—১॥০; বাঁধাই—২৲

মোটা এণ্টিক কাগজে—২৲ ও ২॥০।

গৃহপ্রবেশ

নূতন নাটক। মাসি গল্পটি অবলম্বনে লেখা। মূল্য ॥৵০।

"গীতাঞ্জলি," "কথা ও কাহিনী," ও "শিশু"র নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 899.] [৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

শান্তিনিকেতন পত্র

ফাল্গুন, ১৩৩২

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা।] [বার্ষিক মূল্য দুই টাকা

শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য তিন আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্যান্ত "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময়মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দর সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠা ৬৲, আধ পৃষ্ঠা ৩॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া জানিতে হয়।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৬। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

৭। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৮। পুরাতন বা নূতন গ্রাহকগণ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার সময়ে কুপনে নাম ও ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

পোঃ শান্তিনিকেতন,
(বীরভূম)

শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

// শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ | ফাল্গুন, সন ১৩৩২ সাল | ২য় সংখ্যা

পত্র

শুক্রবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা রূপ-দক্ষ এবং রসিকও বটে আমি এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি—আজ সকাল থেকে আলোর একটি সাদা পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দুজনে দুটী পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বল্লে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বল—ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্চি—আমার নাম ডোবে যদি তোমরা কেউ এর সদুত্তর একটি সাদা পালক আর একটি কাল পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও। দিন রাত দুজনে আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে তোমাদের ওখানে উৎসব করতে গেছে—আমি এখানে বসে মনের আসনে সাদা কালোর আল্পনা টানচি আর কল্পনায় দেখছি কবির সঙ্গে তোমরা সেই আসনে বসে উৎসব করছো।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও বন্ধু-জনকে সম্ভাষণ জানিও তোমরা এবং ছোটরা আমার বাকি যে শুভকামনা নিয়ো। মন গেল উড়ে সেখানে মাথা বসে বসে ভাবছে সাদা কালো পালকের তত্ত্বকথা। আর থেকে থেকে পাখার বাতাস খাচ্ছে।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

রবিবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

তোমার আর রমেনের কাছ থেকে প্রশ্নটির পরিপাটি উত্তর পেয়ে আনন্দিত হলেম। গিরিমাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত ভাবে বসে থাকে রূপের পরশ রংএর আভা তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী, সাদা কাগজ সাধাসিধে মানুষটি তাকে রং রূপ দুজনেই সহজেই কাবু করে রংএর সঙ্গে রূপের সঙ্গে সে লিপ্ত হয়ে যেতেই চায় "রংএর ধারায় (রূপ) হৃদয় হারায়" এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে—কিন্তু মানুষের চিত্র সেখানে রূপকে সজাগ করে দিতে রইলো বৈরাগী ও রং রূপকে রংএর সমুদ্র রংএর আবর্ত্ত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চল্‌ল বৈরাগী নয়ও বটে প্রায় সাদা কাগজ বটে আবার রং বল্লেই চলে ওকে। তার পরে আর এক কথা গিরিমাটির রং হল জাৎসাপের মতো ওর একটা আভিজাত্য আছে, অন্য রং তারা আভা রং নয় তারা হঠাৎ নবাবের মতো বহুরূপী ও ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটির মতো তারা সাজসজ্জা করে যখন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই করেন বটে মনে হয় কিন্তু ঘাটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বসেই থাকে ঠিক জায়গায় রংএর খেলায় রূপের লীলায় তিনি বাধা দেন না এইটেই প্রমাণ করেন যেন তিনি কেউ নয় রূপ রং তারাই সব, রংএর বাক্সর থেকে তিনি ডেকে বলেন আমি তৃণাদপি কম জোর আমার চেয়ে রংরাই সব কার্য্যকরী ওদের নিয়ে খেলাঘর বাধ ওরা কেউ শক্তিমান কেউ রূপবান আমার রূপও নেই শক্তিও নেই কিন্তু মাটির মতো আমি স্থির রূপের রংএর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ আমাকে জেনো আমার মধ্যে রং রূপ আছে এবং নেই।

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছে তাই তোমাদের সকলকে আর্ট সম্বন্ধে আমার একটা বচন উপহার পাঠাই—

পুতুলী গড়তে চারদিক দেখি
পটুটি লিখতে একদিক দেখি

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—

চিত্র একমুখি—গড়ন চারমুখি এখন ছবিতে ও Perspective ইত্যাদি দিয়ে চার মুখ দেখানো হচ্ছে আসলে কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছে না গড়ন হচ্ছে খাঁটি পট লিখবে তো এক মুখ লিখবে। পারস্য দেশের গালিচা এক-মুখি পটের নমুনা—বিলাতি গালিচ চতুর্ম্মুখ গড়নের নমুনা।

মুসলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

আজকাল ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা হচ্ছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রথমে ভারতীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন, আংশিক ইতিহাস অনেকেই দিয়েছেন। ডাক্তার আনন্দকুমার স্বামী সিংহলের শিল্পের ইতিহাস ও তাহার সহিত ভারতীয় শিল্পের কিছু বিবরণ দিয়েছেন, একটি কথা অনেকেই স্বীকার করেন যে মুসলমান যুগের আগে হয়ত ভারতে শিল্পের নিদর্শন অনেক ছিল যা মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু নেই। ইতিহাসের দিক থেকে আলোচনা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের জন্যে মুসলমান আক্রমণকারীরা অনেক পরিমাণে দায়ী।

সুলতান মামুদ যে ভারত আক্রমণ করেছিলেন সতের বার তা আজকালকার বিদ্যালয়ের ছেলেরাও জানে। তাঁর আক্রমণের সময় ভারতের নানাস্থানে দেবমন্দির ও মূর্ত্তি ছিল যা তিনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। খৃঃ ১০০৯ অব্দে তিনি কাংড়া লুট করেন। সেখান থেকে তিনি যে সব জিনিষ নিয়ে যান তার মধ্যে একটি ছিল রূপার বাড়ী। সেই বাড়ীটি ৩০ গজ লম্বা ও ১৫ গজ চওড়া ছিল। এই বাড়ীটি এমন মজার ছিল যে এটা টুকরা টুকরা করে খুলে নেওয়া যেতে পারত, আবার পরান যেত।

সে সময় মথুরায় অনেক মন্দির ছিল, সম্ভবতঃ বিষ্ণুমন্দির। একটি মন্দির ছিল সহরের মাঝখানে, সেটি অন্য সব মন্দিরের চেয়ে বড় ও সুন্দর ছিল। সুলতান মামুদ সে মন্দিরটি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে সেটা নির্ম্মাণ করতে নিশ্চয়ই দু'শ বৎসর লেগেছিল। সে মন্দির এত সুন্দর ছিল, যে সেটা নাকি বর্ণনা করা যায় না। এই মন্দিরে পাঁচটি মূর্ত্তি ছিল, সেই মূর্ত্তিগুলি সোণা দিয়ে তৈরী। এক একটি মূর্ত্তি পাঁচ গজ উচ্চ ছিল আর তাদের চোখ ছিল খুব দামী রত্নে তৈরী। সুলতান মামুদ হুকুম দিয়েছিলেন এই সব মন্দির আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে।

কান্যকুব্জে সে সময় না কি দশ হাজার মন্দির ছিল। মামুদ এ সহরও আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু এ সব মন্দির ভাঙতে বলেছিলেন কিনা তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

তারপর সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির। সেটা কাঠের তৈরী ছিল। এ মন্দিরে মধ্যখানে যে বড় হলটা ছিল, সেখানে ৫৬টা স্তম্ভ ছিল। এ স্তম্ভ ও কাঠের তৈরী, কিন্তু সীসা দিয়ে ঢাকা ছিল। এখন শুধু এই বিখ্যাত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

মুসলমানদের আসবার আগে এই রকম ভারতে অনেক মন্দির ও মূর্ত্তি ছিল, যার কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা এখন পাই না। সেই সব শিল্প নিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পেলে আমরা ভারতীয় শিল্পের একটি সম্পূর্ণ

ইতিহাস লিখতে পারি। আমরা বল্‌তে চাই না যে মুসলমান আগমণে ভারতের লাভও হয়েছে। শিল্পের দিক্ থেকে আমরা তাজমহল পেয়েছি, সোণা মসজিদ পেয়েছি, জুম্মা মসজিদ পেয়েছি। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মোসলেম সভ্যতার দান অনেক আছে। কিন্তু যতদিন না আমরা ঠিক্ জান্‌তে পারব যে ভারতীয় শিল্পের কি কি নিদর্শন মুসলমান যুগের আগে ছিল, যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে, ততদিন ভারতীয় শিল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

আলোক-লতা

হে মোর আলোকলতা
এ শাখা আমার ছিল যে একদা
ফুলে ফলে অবনতা।
তপন যেমন কিরণ-লতায়
লক্ষ পাকেতে আকাশে জড়ায়
তেমনি আমারে করিয়াছ তুমি
হরিয়াছ সব কথা
তুমিও বধির আমিও অধীর
হে মোর আলোকলতা।

এবার ফাগুনে যবে
মত্ত-কোকিল আম্র-কানন
জ্যোৎস্না-উদাস হবে—
কথায় মধুর চুত-মঞ্জরী
ক্ষণিক-সমীরে প'ড়বেক ঝরি—
আমি কি ঝরাবো রিক্ত দীর্ণ
কে তাহা আমারে কবে—
তুমিও বধির আমিও অধীর
কাননে ফাগুন যবে।

কে জানিত হবে হেন?
আমার সকল সিদ্ধি সাধনা
তোমারি লাগিয়া যেন।
পল্লব-জাল গিয়েছে লুকায়ে
পুষ্প বিলাস গিয়েছে শুকায়ে—
আমারে শুষিয়া তুমি যে সরস
আমি বীতরস কেন?
তুমিও বধির আমিও অধীর
কে জানিত হবে হেন।

উর্ব্বশী

[একজন তরুণ রূপদক্ষের অন্তর্জীবনী]

বিদিশার কাছে যমুনা নদী যেখানে একটা পাক খাইয়া উত্তর দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটা বালুচর নদীর হৃদয়ের শুষ্কতার মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেইখানে একটি যুবক বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছিল। শুভ্র বালির উপরে একটা কাঠি দিয়া একখানি মুখচ্ছবি বহু চেষ্টা করিয়াও ফুটাইয়া তুলিতে পারিতে ছিল না। একবার ছবি খানি আঁকিতেছিল; কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে মাথা নাড়িয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আবার আঁকিতে মন দিতেছিল।

কিছু দূরে কালো তুলিতে যমুনার জল কল্পলোকের কি এক অপরূপ মূর্ত্তি শতবার চেষ্টা করিয়াও তট বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—যে তুলিতে সে আঁকে সেই তুলির টানেই তাহা ধুইয়া যায়। বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব এক কালো তুলির মত সেদিনকার আসন্ন প্রায় সন্ধ্যার ছায়ায় যমুনার তরল জল ধারা শুভ্র সৈকতের শুষ্ক বক্ষে সুখ দুঃখের কত বিচিত্র রেখা লীলায়িত করিয়া অদৃষ্টের মত অন্ধকার রাত্রির অভিমুখে বহিয়া যাইতেছিল। পরপারের শুষ্ক বনরাজির উপরে হইতে দিনের সূর্য্যের আলো নিভিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো রাত্রির যবনিকাপাত হয় নাই। সহসা মৌনবনান্তরাল হইতে আসন্ন প্রায় পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদ সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়ের মত উঠিয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে আকাশ জোড়া অন্ধকার বিশাল মহীরুহের মত যাহার শাখা প্রশাখা-দিকে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল জ্যোৎস্নার স্রোতে উন্মূলিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল সেই দেশে যেখানে আমাদের জীবনের তুচ্ছতম সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ, আলো অন্ধকার একে একে খেয়া পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তারকাহীন স্বচ্ছ আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ—আশে পাশে দু এক খানা শুভ্র মেঘ জমাট সুধার মত; দিগন্ত রহস্যময় পাণ্ডুরাভ একটি ক্ষীণ বন রেখা; তারপরে চলু মাঠ জ্যোস্নালোক অপূর্ব্ব বেশ পরিগ্রহ করিয়া নদী পর্য্যন্ত আসিয়াছে! সর্ব্বশেষে ক্ষীণধ্বনি নদী-রেখা জ্যোৎস্না বিমূঢ় এই নৈশপ্রকৃতিকে আপনার অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় বেষ্টনী দ্বারা বিশ্ব জোড়া একটি বিরাট সমঞ্জস্যের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

সহসা উচ্চাকাশে একটা টি টিভ পাখী এই বিশাল প্রকৃতির বিরাট ব্যর্থতার মত টি টি রবে আকাশকে চকিত করিয়া চলিয়া গেল। এই শব্দে যুবকটির মৌনী ভাঙিয়া গেল। চমকিয়া সে যেন জাগিয়া উঠিল। বাস্তব পৃথিবীর কথা ক্রমে ক্রমে তাহার মনে পড়িতে লাগিল! মনে পড়িল সে বসিয়া আছে যমুনার তীরে; ফিরিতে হইবে তাহাকে বাড়ীতে; কাজ তাহার এখনো অনেক খানি বাকী; কালই চিত্র প্রদর্শনী! সে আর বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে পড়িতে লাগিল এক খানি মুখ বার বার চেষ্টা করিয়াও যাহাকে বালির উপরে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই! অনেক

সময় যে কথাটা আমরা তাড়াতাড়ি মনে করিতে যাই কিন্তু সেটা কিছুতেই মনে পড়িতে চায় না—ঠিক তেমনি দশা হইয়াছিল তাহার। যতই সেই মুখচ্ছবি সে মনে আনিতে চাহিতে ছিল ততই তাহা যে ল'টে হইয়া উঠিতে ছিল! বারবার বিফল হইয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। শেষে তাহার সেই সুন্দর মুখ খানির উপর রাগ হইল! সে ভাবিতে লাগিল কেন অলকা আজ কয়েক দিন হইল তাহার কাছে আসে নাই। এবং কয়দিন আগে যখন আসিয়াছিল তখন কেন মন খুলিয়া কথা বলে নাই। সে প্রতিদিনই অলকা আসিবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়াছে কিন্তু আজ যেন তাহার অভাব গভীর ভাবে তাহার মনে অঙ্কিত হইতে গেল! অভিমান করিয়া থাকিলে তাহা সহ্য করা যায়; কিন্তু অভাব যে অসহনীয়! সে স্থির করিল আজ রাত্রে ছবিখানি শেষ করিয়া অলকার বাড়ীতে একবার খোঁজ করিয়া আসিবে।

অন্তমনে অনিরুদ্ধ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরের প্রান্তে যমুনার তীরে তাহার বাড়ী; একদিকে বড় বড় বকুল গাছের সারি তাহাদের মসৃন পল্লবপুঞ্জে জ্যোৎস্না শতধা হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে! দোতালার একপাশে শ্বেত পাথরের তৈরী ছোট একটি ঘর—ইহাই অনিরুদ্ধের চিত্রশালা। ছোট ঘরটি বাড়ীর এক প্রান্তে শূন্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অসীম আকাশের সীমা লক্ষ্য করিয়া যেন পাখা মেলিয়া দিয়াছে! দক্ষিনের জানলাটি খুলিলে পৃথিবীর কিছুই দেখা যায় না কেবল একরাশ নীল আকাশ অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আকুল করিয়া তোলে! এই শূন্তবিহারী ঘরে বসিয়া অনিরুদ্ধ ছবি আঁকে; স্বর্গ মর্ত্যের সীমার ঠিক্ উপরের ছোট্ট ঘরটিতে উভয় রাজ্যের খবর এমন সূক্ষ্মভাবে মিলিয়া রেখায় রেখায় বিরাজ করে যে শিল্পীর তুলি তাহা দ্বিতীয় ভার অনুলেখন করিতে পারেনা! অনিরুদ্ধ ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—দরজা বন্ধ; ঘর অন্ধকার। অনিরুদ্ধ অন্তবর হইতে প্রদীপ আনিতে প্রস্থান করিল। ইতি মধ্যে চিত্রশালা হইতে কে যেন বাহির হইয়া গেল। শিল্পীরা চর্ম্মচক্ষে পৃথিবী দেখেনা; নতুবা অনিরুদ্ধ দেখিতে পাইত বাগানের মধ্যে বকুল গাছের স্তর বিন্যস্ত ছায়ায় ছায়া মিলাইয়া কে যেন পলায়ন করিতেছে! কিন্তু ইহার কিছুই অনিরুদ্ধ দেখিতে পাইল না। সে প্রদীপ আনিয়া চিত্রশালার দরজা খুলিল ঘরে প্রবেশ করিয়া দীপাধারে দীপটি রাখিয়া সমাপ্ত প্রায় ছবিটির দিকে তাকাইল। তাহার একবার মনে হইল ছবি খানি নাই। কিন্তু পরক্ষণেই যেন সে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল—বিস্তৃত চিত্রপট ওইযে খাঁচাটি ওইযে উড্ডীয়মান পাখীটি, কি সজীব তাহার পক্ষ বিধূনন—যেন তাহার বাতাস আসিয়া অনিরুদ্ধের গায়ে লাগিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি ছবি খানি শেষ করিবার জন্ম কুলুঙ্গী হইতে রং, তুলি লইয়া পটের কাছে আসিয়া দেখে সত্যই ছবি নাই। এই না ছবি ছিল! ছবি আছে—ছবি আছে এখনো আছে! চুরি গিয়াছে যাহা সে তো সামান্ত একখানি পটমাত্র গায়ে তাহার কয়েকটি তুলির রেখা আর রঙের ছায়া সুষুমা। কিন্তু সেই যে অপূর্ব্ব ছবি খানি যাহা তোমার মানস চিত্রালয়ে চিরাঙ্কিত যাহার শতাংশের

একাংশও তোমার তুলির মুখে প্রকাশ পায় না তাহা এখনও তেম্নি অটুট রহিয়াছে তোমার চিত্তপটাগারে!

অনিরুদ্ধ প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া দেখিল হাতড়াইয়া দেখিল প্রদীপ লইয়া দেখিল—ছবি নাই! কাহারও উপর সন্দেহ করিতে না পারিয়া তাহার অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব হইতে লাগিল। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যার গুমট যেমন অসহ্য হয় কতকটা তেম্নি! সে আর ভাবিতে পারিল না এক ফুঁয়ে প্রদীপটা নিভাইয়া দিতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। সে প্রকৃতির এই মৌন আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিল না বাহিরের ছাদে গিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না কি অপূর্ব্ব এই জ্যোৎস্না দিনের আলোর মত সব প্রকাশ করা—রাতের অন্ধকারের মত সব ঢাকিয়া রাখা—আলো অন্ধকারের সূক্ষ্মসংমিশ্রনে কে রচনা করিল এই অলৌকিক জ্যোৎস্না। সুখ নহে দুঃখ নহে একটি গভীর শান্তি অনিরুদ্ধের মন ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইল। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত তাহার সব চিন্তা রাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কোন কথাই সে ভাবিতে পারিতে ছিল না। মাঝরাত্রে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন দেখিল সন্ধ্যার প্রথম উদ্দামতা থামিয়া গিয়াছে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে যৌবনের একটি গভীর পরিণতি দেখা গিয়াছে। সমস্ত প্রকৃতির উপরে অবসাদের যে একটি লঘু আবরণ পড়িয়াছিল তাহা যেন অনিরুদ্ধের দেহের উপরেও তাহার আঁচল ছড়াইয়া দিল। সন্ধ্যাবেলার কোন ঘটনাই তাহার মনে পড়িল না। কিন্তু তবু সে হৃদয়ের কোন্ নিভৃতে একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল প্রথমটা বুঝিতে না পারিলেও ক্রমে তাহার কাছে স্পষ্ট তাহা হইয়া উঠিল।

আজ কয়দিন অলকা তাহার কাছে আসে নাই! তাহার কত পুরাতন কথা মনে হইতে লাগিল! সাধারণ হিসাবে তাহাদের মধ্যে ক্রম পরম্পরতা নাই, প্রত্যক্ষত কোন যোগ নাই কিন্তু স্বভাবের যে অমোঘ শাসনশৃঙ্খলে প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠে তাহার অনুশাসনে সমস্তই যথারীতি বিধৃত হইয়া আছে।

একদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল! সেদিন অনিরুদ্ধ পীড়িত হইয়া নির্জ্জন ঘরে পড়িয়াছিল! সহসা দরজা খুলিয়া অলকা প্রবেশ করিল। আর কিছুই সে স্মরণ করিতে পারিল না। কিন্তু সে দিন তার সেই ম্লানমুগ্ধ মুখচ্ছবি, কণ্ঠের ছায়ার মত সুন্দর হারটি, আঁচলের ঈষদধীর প্রান্তভাগ সবগুলি মিলিয়া তাহার মানস লোকে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সে ব্যর্থ তুলিকায় কত বার ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু যে নিয়মে প্রদীপ তাহার নিকটতম স্থানটুকুকে আলোকিত করিতে পারেনা সেই নিয়মেই অনিরুদ্ধ তাহার গভীরতম দরদটুকু বর্ণচ্ছটায় প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে অসমর্থ হইয়াছে।

আর একদিন সে এক বসন্ত জ্যোস্নার রাত্রি। নবস্ফুট শালবনের স্নিগ্ধ অন্ধকার ঢালা বনপ্রাঙ্গনে সেদিন নগরের নরনারীরা সমবেত হইয়া ছিল! সকলের চোখেই মূর্ত্তিমতী বাসন্তীর মত অলকা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! সেদিন সে যেমন গৌরব অনুভব

করিয়াছিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু হিংসার জ্বালাও যে না ছিল এমন নয়! সেই দিন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যাহাকে সে এতদিন অস্বীকার করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহাকে সেদিন আর প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না অনিরুদ্ধ বুঝিতে পারিল অলকাকে সে ভাল বাসে। এতদিন তাহাকে সৌন্দর্যোন্মাদনার জন্য শিল্পী হিসাবে তাহার ভাল লাগিয়াছে কিন্তু সেই দিনই স্পষ্ট হইল যে শুধু ভাল লাগা নয় ক্রমে ক্রমে ভালবাসা শিল্পীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অনিরুদ্ধ বুঝিতে পারিল যে শিল্পীর চেয়েও বড় কিছু—সেই বড়ত্বেই তার গৌরব! সেই মাহাত্ম্যের গৌরব আজ তাকে এমন অভিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিল যে তাহার একখানা উত্তম ছবি গেল কি রহিল কাল সে পুরস্কার পাইবে কি না কিছুই তাহার মনে স্থান পাইল না।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে কতবার সে পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কিছুদিন হইতেই যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ভাবাকাশ চারী অনিরুদ্ধের চোখে পড়ে নাই। অলকা যে তাহার বাড়ীতে আসা কত কমাইয়া দিয়াছে তাহ সে চিত্রাঙ্কনে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিয়া ছিল বলিয়া বুঝিতে পারে নাই! সে শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে অলকার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে দেখিতে পাইয়াছিল সে সত্য যে দেখে তাহার কাছেই সত্য তাহাকে কতখানি ফাঁকি দিতেছিল তাহা সে উপলব্ধি করে নাই! সেই জন্য শিল্পী হিসাবে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু যখন সে ভাবের ব্যোম বিহার হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষের মধ্যে মানুষের দেহে বিচরণ করিত তখন তাহার মনুষ্য সুলভ ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলা বিশেষ করিয়া একটি মানুষের জন্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

কিন্তু আজ এই রাত্রে আজ এই জ্যোস্নাতে আজ এই শারদ নিশার বায়ুলেশহীন স্তব্ধ শেফালী সুরভিত আকাশের তলে, না শিশির সম্পাতস্নিগ্ধ তারকা মণ্ডলে অনিরুদ্ধ সেই মহোচ্চ শিল্পস্বর্গে বিরাজ করিতে ছিল যেখান হইতে পৃথিবীর সুখ দুঃখ নিতান্তই অসম্ভব মনে হয়।

ওই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার পূর্ণ অর্ঘ্য আকাশের দিগন্তাভিমুখে চলিয়া পড়িতে ধীরে ধীরে চলিয়াছে কি মোহ কি মাধুর্য্য কি স্বপ্নকথা উহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কেন ওই চাঁদ আমাদের ভাল লাগে! অনিরুদ্ধের মনে হইতেছিল—উহাকে মনুষ্য জীবনের সুখ সম্পদের সাথে তুলনায় নিতান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া উহাকে আমরা করুণা করিয়া থাকি! হায় বিগতযৌবনা বিগতজীবনা, হায় একদাজীবধাত্রী জননি তোমার বুকের শুষ্ক গিরিরাজি বিরাট মরুভূমি অগস্ত্যের মত যাহার বুক জোড়া তৃষ্ণা, জলবহীন অতল সাগরগহ্বর রেখমাত্রাবসান নদীমালা সমস্তই কেবল গৌরবময় মহা অতীতের সাক্ষী, তোমার বুকের পাঁজরে পাঁজরে স্মৃতির মধুমাছির বাসা মধু যাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে হুল যাহাদের তীক্ষ্ণতর।

পথ তোমাকে বলিয়া দিতে কেহ নাই, প্রশ্ন করিতে কেহ নাই, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই একমনে এক পথে এক দিগন্ত হইতে

দিগন্তান্তরে কোথায় তুমি চলিতেছ! পৃথিবীর সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্য কি তুমি স্বপ্নেও দেখিতে পাও না! আর কিছু তোমার দেশে না থাকে অন্তত স্বপ্ন তো আছে! না তাহাও নাই! তবে কি স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা! প্রশ্ন-বহুল পৃথিবীতে ইহার কে উত্তর দিবে!

নূতনের ভুল

নূতন বন্ধুর মাঝে পাবে তুমি ঠাঁই
নূতন নদীর কূলে নব তৃণতীরে,
নূতন ভাষায় কথা কহিবে সদাই
কত না নূতন মুখ তোমা সখি ঘিরে
সত্য মিথ্যা কভু হেসে কভু অশ্রু নীরে।
সে সময় মনে রেখো চির অশ্রুহারা
পুরাতন গৃহে তব ওঠে সন্ধ্যা তারা।

নূতন বসন্তে সাজি ভরিবে তোমার
মালিকা গাঁথিতে পাবে নব নব ডোর—
মনে রেখো সে সময় হেথাও আবার
ফুটেছে নূতন ফুল সুগন্ধি-বিভোর
মুকুল-বিলাসী নব পিক গাহে জোর।
সেদিন নূতন চুলে গুঁজি যদি ফুল
রাগিয়োনা জেনো তাহা—নূতনের ভুল

প্রথম মৃত্যু

হে আদি-দম্পতী আমি ভাবিতেছি বসে
সৃষ্টির নির্জ্জনে সেই চেতনা-প্রদোষে
এলাইয়া দিল দেহ প্রিয়তম যবে—
ভাবিলে গৃহের কর্ম্মে বুঝি নিদ্রা হবে।
বল্কল-অঞ্চল টানি বুকের উপরে
শত তুচ্ছ-কর্ম্ম নিয়ে ছিলে বন-ঘরে।
সহসা জাগাতে তারে করিলে প্রয়াস

নড়িল না—জাগিল না—তুমি ভগ্ন-আশ
নিশ্চিন্তে ঘুমালে রাত্রি প্রভাতের তরে;
ভাঙিল না ঘুম তবু; কি বিস্ময় ভরে
ভাবিলে এ কোন্ নিদ্রা কোথা এর তল।
প্রথম নয়নে তব এল মৃদু জল।
তারপরে কত পরে কেমনে তা বলি
তুমিও ত সে নিদ্রায় পড়িয়াছ ঢলি।

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

১

দ্বিজেন্দ্রনাথ আর ইহ-জগতে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে 'শান্তিনিকেতন পত্রে' কিছু লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক লিখিবার আছে অথচ কিছু না লিখিলেও চলে। কারণ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অক্লান্ত কর্ম্ম ও সাধনার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে—তাঁহাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাকে কবি ও দার্শনিক বলিয়াই বহুলোকে জানে। তাঁহার অন্তরের সাধক পুরুষটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা অনেকেরই জানা নাই। বহু পুণ্যফলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই মহাপুরুষের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য ঘটে। আমার পরম সুহৃদ এণ্ড্রুজ সাহেব আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেদিন কত ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁর শিশুর মত সরল স্বভাব ও প্রাণ-খোলা অট্টহাস্য আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রবাসী পত্রিকার জন্য তখন তিনি ধারাবাহিক ভাবে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। আমাকে তিনি তাঁর সেদিনের লেখাটি পড়িতে দিলেন। সেদিনকার পড়াতে আমার কোন ভুল হয় নাই তাই আমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সহিত আমার যোগের এই প্রথম সূত্রপাত। তার পর এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার অতি নিকটে আসিবার ও কাছে থাকিবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম।

তাঁহার জীবনী লেখার মত শক্তি ও যোগ্যতা আমার নাই। তাই সেরূপ চেষ্টা আমি করিব না। তাঁহার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি তাহাই সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের অনেক কথা বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে বলিতেন। আমি সেগুলি ঘরে গিয়া লিখিয়া রাখিতাম। বিশেষভাবে তাহাই এই সকল প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইবে। যতদূর সম্ভব আমার ব্যক্তিগত মতামতের উল্লেখ ইহাতে থাকিবে না। তাঁহার মহৎ জীবনটি ফোটাইয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার মুখের কথা যাহা আমি আমার 'ডায়েরী'তে ধরিয়া রাখিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিব মনে করিয়াছি।

তাঁহাকে বহুবার তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাহাতে তিনি বলিতেন।

"আমার আবার আত্মজীবনী! আমার জীবনে কোন ঘটনা নাই। আর যা' আছে সে সব কথা বলবার নয়। আসল কথা কি জান, আমি এখনও বড় কাঁচা। আমি নিজেকেই এখনো ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, অপরকে আমার সম্বন্ধে কি বলিব। কেহ কি বুঝিবে? আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহাই আমার জীবনী। আত্মজীবনী পড়িতে যদি হয় ত কর্ত্তার (মহর্ষিদেবের) আত্মজীবনী পড়।"

এইরূপে করিয়া কথাটা চাপা পড়িয়া যাইত। তবুও আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া সেকালের অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি তাহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। তিনি নিজের মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না বলিয়া নিজের বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতেন। তিনি তাঁহার আত্মকথা লিখিয়া জান নাই তাহাতে তাঁহার বিনয়ই প্রকাশ পাইতেছে। আরও অনেক গল্প আছে যাহাতে তাঁহার বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই বিনয় গুণ তাঁহার মধ্যে স্বভাব সিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি নিজেকে জন সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাকে সংযত করিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছিলেন এবং একাগ্রমনে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ভগবদ্দর্শনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই সাধনার ইতিহাস লিখিব মনে করিয়াছি তাই এই প্রবন্ধ গুলির নাম দিয়াছি—'সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁহার জীবনে যাবতীয় কার্য্যকলাপ ও চেষ্টার মূলে ছিল ভগবদ্ আরাধনা। ক্রমেই তাহা প্রকাশ করিব।

সপ্তদশী

যাবে সখি চলে যবে—যাবে শুধু তুমি
আর সবি পড়ে রবে—যাহাদের সাথে
মিলিয়া সম্পূর্ণ ছিলে—এই বনভূমি
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছাতুর—তব পদপাতে।
ইহাদের বাদ দিলে কতটুকু তুমি
এই মালতীর লতা—শিরিষের ছায়া,
এই যে মাধবী শাখা রয়েছে কুসুমি,
সবে মিলি তবে তুমি একখানি মায়া।
যে তরুতে দিতে জল—সোদরের স্নেহে,
যে দোলায় দোল খেতে অবকাশ-রসে,
শত তুচ্ছকর্ম্ম নিয়ে পশিতে যে গেহে,
বাতায়নে দাঁড়াইতে আলস্য-রভসে।
যেখানে বসিতে তুমি সেথা গিয়া বসি
আর কি করিতে পারি—অয়ি সপ্তদশি।

মনে রেখো

বিস্মৃতির বৈতরণী পার হ'য়ে সখি
চলে যাবে জানি তাহা—তবু কি ঝলকি
অতীতের সিন্ধু হ'তে স্মৃতির ঝিনুক
একটিও উঠিবে না—ভাবি এইটুক্!
মনে রেখো বীথিপথে শুষ্ক পল্লবের
মঞ্জীর উঠিবে বাজি—কাঠ বিড়ালের
তব পদধ্বনি আশে কাটিবে সময়
মনে রেখো—আরো কেহ সেথা জেগে রয়!
আরেক বসন্তে সখি ক্ষুব্ধ সমীরণ
বনের অঞ্চলে গিয়ো দিয়েছিল হায়
বলেছিল—মনে রেখো মনে রেখো বন
হাসি মুখে নিয়ো ফিরে আসিব যখন!
বন কি চিনেছে তারে বুঝা নাহি যায়!
হাসিছে না কাঁদে ওই তরু-মর্ম্মরণ!

মানব সভ্যতার হাতের কাজ

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

হাতের কাজ (Manual training) মানুষের সাধারণ শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। সকল দেশের শিক্ষাতত্ত্ববিদগণকেই এই কথার রূপ এভাবে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। শুধু হাতের দক্ষতা অর্জ্জনই হাতের কাজের সীমা বলিয়া আমরা সাধারণভাবে বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক তাহা নহে; বিজ্ঞান জগতে রাসায়নিক আপনার পরীক্ষাগারে নানা যন্ত্রপতি সংযোগে কাজ করিয়া থাকেন। সেখানে তাঁহাকে দক্ষতার সহিত যন্ত্রপতি নাড়াচাড়া করিতে হয়। কিন্তু সেই উপায়ে হাতের চালনা শক্তি বাড়ানোকে হাতের কাজের সীমা বলা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে ইহার অর্থ অধিকতর ব্যাপক। সাধারণভাবে এই বলা যায় যে মানব আপনার বিভিন্নমুখী চিন্তারাশি যে কৌশলে যন্ত্রের সাহায্যে নানাবস্তুতে যথা কাগজ, কাদা, কাঠ, লৌহ, পিত্তল, তাম্র প্রভৃতি জিনিসে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার কাজ করিয়া থাকে তাহাই হাতের কাজ। আর এই হাতের কাজ সম্পর্কে এই কথাও বলা প্রয়োজন যে বিশেষ কোন ব্যবসা শিক্ষা পাওয়াই হাতের কাজ নহে।

আদিম ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে উপরে যে যন্ত্রের কথা বলা হল মানুষ সেই যন্ত্র ব্যবহারগত প্রাণী (Tool using animal) এই যন্ত্র ব্যবহার মনুষের প্রকৃতিগত। এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ধাপের উপরই মানুষ আপনার সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়াছে। পাথর, লৌহ, তামা প্রভৃতি ধাতব বস্তুতে নির্ম্মিত কুড়াল প্রভৃতি পুরাকালের জিনিস মাটি খুড়িয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহাতে প্রাচীন কালের মানুষের জীবন ধারার অনেক তথ্যই জানা যায়। পৃথিবী যেমন আপনার ইতিহাসকে অগাধ জলরাশির মধ্যে উদ্ভাবিত করিয়াছে, মানুষও তেমনি আপনার ক্রমোন্নতির ইতিহাস এই যন্ত্রের সহায়ে সৃষ্টি করিয়াছে। মানব সৃষ্টির সময়ে যন্ত্র না থাকিলেও যন্ত্রব্যতীত মানুষকে কল্পনা করা সম্ভব হয় না। আদিম মানুষ উলঙ্গ ছিল। তাহার আহার প্রস্তুতের প্রয়োজন হইত না। পর্ব্বত গুহা বা গাছের কোটর তাহার বাসস্থান ছিল। বৃক্ষ-পতিত ফল সে কুড়াইয়া লইত। বলবান প্রাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আড়াল খুঁজিত। আবার দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে ছাড়িত না। আগুন পাইয়া তাহার সভ্যতা আরম্ভ হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কখন মানব আগুনকে আপনার কাজে প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সকলই নিরুত্তর। আগুন আবিষ্কারের পূর্ব্বে যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। আর সম্ভবতঃ সেই সকল যন্ত্রই মানুষকে আগুন আবিষ্কারের পথে টানিয়া লইয়াছিল। আগুনের সাহায্যে মানব আপনাকে রক্ষা করিবার উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বচ্ছন্দতা বাড়াইতে পারিয়াছে। অগ্নি ভয়ে ভীত হিংস্র জন্তুকে তাড়াইবার জন্য আগুনই প্রধান অস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

শীত নিবারণের জন্য আগুনই প্রধান সম্বল ছিল পরিবারের মধ্যে অসহায় শিশু রুগ্ন ও চলিতে অসমর্থ বৃদ্ধগণ অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া থাকিত। আর সবলগণ সকলের আহার জোগাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইত।

মানুষ প্রাণীজগতে অনেকের চেয়ে দুর্ব্বল ছিল। সেজন্য আত্মরক্ষার্থ আগুনও যথন যথেষ্ট বিবেচিত হইলনা তখন তাহাকে অন্যপথ খুঁজিতে হইল। সেই সময়কার মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতে গিয়া পশ্চিমদেশীয় মনিষী Katharine Elizabeth Dopp. বলেন—"অশ্বের ন্যায় মানুষ দৌড়াইতে পারিত না, মাছের ন্যায় জলে সাঁতার কাটিতে পারিত পারিত না, পাখীর ন্যায় উড়িতে পারিত না, সাপের ন্যায় গতিবিশিষ্ট ছিল না। বাহিরের আঘাত হইতে নিজের দেহকে রক্ষা করিবার জন্য গণ্ডারের মত চামড়া ছিল না।" বলা বাহুল্য এ সকল গুণ মানুষের আজও নাই। তবে এই সকল কথার অর্থ এই যে প্রকৃতিগত বিপত্তি হইতে নিজকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই তাহার জানা ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তিতে অনেক প্রাণীই তাহার উপরে ছিল। কিন্তু এই সব দুর্ব্বলতার ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন হইল যন্ত্রের। সেই কালের যন্ত্র আজিকার তুলনায় যদিও খুব অদ্ভুত রকমের ছিল তবু মানুষ ঐ প্রকার যন্ত্র নিম্মাণে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিত। প্রথমে তাহার হাত এবং দাঁতই সকল যন্ত্রের কাজ করিত। তাহার প্রথম মস্তিষ্কপ্রসূত যন্ত্র হাতুড়ি। নারিকেলের মত শক্ত জিনিসের খুলিকে আঘাত করিয়া ভাঙিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে এই হাতুড়ি ব্যবহৃত হইত। তখনকার যুগে সম্মুখ যুদ্ধেই হাতের মুষ্টিই প্রধান অস্ত্র ছিল। কিন্তু হাতুড়ি নির্ম্মাণ করিয়া মানুষ দেখিল যে তাহা অপেক্ষা সবল প্রাণীকেও ইহার আঘাতে দুর্ব্বল করিতে পারে। পরে মানুষের পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধও উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইল না। তখন সে দূর হইতে যুদ্ধ বা আত্মরক্ষার কৌশল উদ্ভাবনে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজিত করিল। এবং ইহাই তীর ধনুক আবিষ্কারের প্রধান কারণ। আর প্রাচীন যুগের মানবের ইহাই প্রধান অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত।

কালের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীর ধনুকের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বলবান বা হিংস্রজন্তু যথন এই তীর ধনুকের শক্তির নিকট পরাভূত হইল তখন মানুষ ইহার সাহায্যে আপনার আহার ও বস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগ দিল। বলা বাহুল্য এই তীর ধনুকের উন্নতির সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। এই তীর ধনুক সৃষ্টির পর ইহার ব্যবহারের সুবিধাজনক পথ খুঁজিতে গিয়া নানা প্রকার যুক্তিপূর্ণ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। প্রথম যে কাঠ দ্বারা ধনুক তৈয়ার হইত, তাহা কখন কি অবস্থায় কাটিতে হইবে, কি ভাবে শুকাইতে হইবে, কতটুকু লম্বা ও মোটা হওয়া প্রয়োজন—তারপর ধনুকের টানার দড়ি, লক্ষ্যভেদে শক্তিশালী বহুদূরগামী তীর একে একে মানুষ এই সকলের সমাধানে প্রবৃত্ত হইল। সেই বহু পুরাতন কালের তীর ধনুক নির্ম্মাণ কৌশল আজিও প্রাচীন সভ্যতার আকর ভারতবর্ষের পাহাড়ি জাতিদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা ঠিক যে এই তীরধনুক নিজেদের বয়স ও শক্তির

অনুপাতে বিভিন্ন আকারে তৈরী হইত। বস্তুতঃ মানবের সৃষ্টির মধ্যে এই তীরধনুকই প্রধান। প্রধান বলিবার কারণ এই যে ইহাকে অবলম্বন করিয়াই যন্ত্র বিজ্ঞানের উদ্ভব —আর এই যন্ত্র বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই কল্পনা মানুষকে গড়িবার শক্তিদান করিয়াছে। কলে, কৌশলে, কর্ম্মে জীব জগতের সকল-স্থলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীকে—শুধু প্রাণী নহে জগতের প্রাকৃতিক নিয়মকে ও অনেক-স্থলে লঙ্ঘন করিতে সামর্থ্যবান। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই যন্ত্রের রকম বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়াছিল।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ মানুষের কর্ম্মশক্তির ধারা আজ পর্য্যন্ত যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানব সভ্যতার প্রথমযুগে সকল ব্যাপারই যার যার গৃহে আবদ্ধ ছিল। এই গৃহজীবনকে ইংরাজীতে Period of Domestic Economy বলা হইয়া থাকে। দশম শতাব্দীতে নাগরিক জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, দশম শতাব্দী হইতে মানুষের নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়, সে সময়ে মানুষের হাতের কলা কৌশল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে যুগের স্থায়িত্ব বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ইংরাজীতে এই যুগকে The Period of Town Economy or the Period of Handicraft বলা হইয়া থাকে। তার পরই বর্ত্তমান যুগ—যে যুগে আমরা এখন বাস করিতেছি। এই যুগ জাতীয় ও কলকজার যুগ (The Period of National Economy or the Age of Machinery Factory)। কিন্তু কর্ম্মশক্তির এই তিনটি ধারায় মানবজীবনের ক্রিয়া ক্রমে নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকের ভাষায় সে সকলকে যথাক্রমে শীকারের অবস্থা (Hunting Stage), মৎস্য ধরিবার অবস্থা (The Fishing Stage), রাখালিয়া অবস্থা (The Pastoral Stage), কৃষক-জীবন (Agricultural Stage), ধাতব-কাল (The age of metal), শিল্প যুগ (The stage of Trade), ভ্রাম্যমাণ অবস্থা (Travel), পণ্য আদান প্রদান (Trasper-tation), নাগরিক যুগ (The city Stage) জায়গীর প্রথা (Feudal System), হস্ত-শিল্পের প্রথা (Handicraft System) তার পর কলকারখানার প্রথা (Factory System), বলা যায়।

ইতিহাসের খাতায় দেখিতে পাই মানুষ চিন্তায় যাহা পাইয়াছে কর্ম্মে তাহাই গড়িয়া রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার এই গড়া জিনিসকে অবলম্বন করিয়াই কল্পনা সুদূর প্রসারিত হইয়াছে সেই চিন্তায় ও কল্পনায় মানুষ আপনার মাথা খাটাইয়াছে। আর চিন্তিত ও কাল্পনিক জিনিসকে গড়িবার জন্য হাত পার পটুতা বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় সভ্য মানবসমাজ মাথা ও হাতের কাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য-রূপে স্বীকার করিয়া আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনিষীর মত। সেজন্য দেখিতে পাই মানব শিশু যাহাতে মাথা ও হাতের কাজ—উভয়ের সামঞ্জস্যমূলক ভিত্তির উপর আপনার সরল

সহজ সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে পারে—আজিকার দিনের শিশুশিক্ষায় তারই চেষ্টা।

মানুষ তাহার আদিম অধিবাসীদের সহিত আপনার সভ্যতার পার্থক্য দৃঢ়তর করিয়াছে ৭টি যন্ত্র সৃষ্টি দ্বারা। যথা—হাতুড়ি, কুড়ুল, করাত, রাঁদা, মাটাম, বাটালি, এবং বেত। মানুষের সভ্যতায় এই যন্ত্রের আধিপত্য কতটুকু তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া পশ্চিম দেশীয় মনিষী Carlyle বলিয়াছেন—

Man is a toolusing animal. He can use tools, can devise tools: with these the granite mountains melt into light dust before him; he kneads iron as if it were soft paste; seas are his smooth high ways; winds and fire his unwearing steeds.

No where we find him without tools; without tools he is nothing, with tools he is all.

পূর্ব্ব সময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিদ্যালয় গড়িয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য আপন গৃহেই শিশুর সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। গ্রাম্য জীবনে যেখানে বর্ত্তমানের হাওয়া এখনও পৌঁছায় নাই সেসব স্থলের সুসংবদ্ধ পরিবারে শিক্ষার সকল ব্যবস্থারই নিজেদের গৃহকর্ম্মের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একথা স্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান সময়ে গৃহস্থজীবন পূর্ব্বকালের ন্যায় সুসংবদ্ধ নহে, সেইজন্যই দেখিতে পাই বিদ্যালয়ে শিশুজীবন গড়িবার গুরুত্ব বর্ত্তমানকালে বেশী, মানব প্রকৃতিতে সকল সময়ই কাজ করিয়া গড়িবার চেষ্টাই প্রবল, আর শিশুজীবনেই এই সত্য বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট, ইহা লক্ষ্য করিয়া Professor O'Shea বলিয়াছেন—

"In the earliest years the pupil's chief interest is in constructive activity. If he be given freedom to do as he chooses and suitable equipment, by far the largest part of his time will be spent in construction, in imitation of the activities going on about him. If he has blocks, he will be building; if paper and scissors, he will be cutting; if sand, he will be moulding; if tools, he will be framing a box or a house or what not; all, of course, in a crude, imperfact way." বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই কথাই বিভিন্ন ভাষায় বলিয়াছেন। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে তাহাদেরই দু একটি কথা প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিব। ১৯০১ সালে Eastern Manual Training association এর সমক্ষে F. W. Parker মহোদয় "Expression in its Relation to Education নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে বলেন "Making or Manual Training has done more for the human race than the exercise of any, if not all, of the other modes of expression. It is absolutely indispensable to nomal physical development; it has had a mighty influence upon

brain building: it has cultivated ethics as a basis of normal growth. এই প্রসঙ্গে Scripture সাহেব Manual Training magazine এ "Manual Training and Mental Development" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"(I) Manual Training develops the intellectual side of the mind as nothing else can (II) Manual Training develops character as nothing else can. (III) Manual Training furnishes the pupil with real knowledge; it teaches him something. The laboratory method—the method of learning by doing—is after all the only method of learning anything whether it be drawing or greek or chemistry or mathematics. The attempt to comit facts to memory by reading books is hopeless, what is memorized in this way fades in short-time, leaving little or no trace—" ১৯০৭ সালে উক্ত পত্রিকায় Professor Bennette সাহেব লিখিতেছেন—"Two of the direct results of art instruction and manual training are, first, power to do and record, ability to appriciate what is done by others."

আজিকার প্রবন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। যেখানে যে শিক্ষায় যে সমাজে এই সম্বন্ধ কার্য্যত অস্বীকার করিয়া কোন একটির প্রাধান্য দিয়াছে সেখানেই মানুষ আপনার সমাজের একত্বকে খণ্ডিত করিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রমিক ও ধনীদের মধ্যে যে বিরোধ জগতময় চলিয়াছে তার মূলে ও একই তথ্য বিদ্যমান যদিও দেশের অবস্থা ভেদে এতদুভয়ের সম্পর্ক কতকটা বিভিন্ন রকমের। যে দিন সমাজের বুদ্ধিজীবির দল অপর দলকে বলিল আমরা চিন্তা করিয়া পথ বাহির করিব আর তোমরা গায়ে খাটিয়া তাহা সফল করিবে সেদিনই হয়তো অলক্ষ্যে এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত দল (যাহাকে শ্রমিক ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে) প্রথমে সহজভাবেই এই কাজের বোঝাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু যেদিন তাহাদের চৈতন্য দেবতা জাগ্রত হইলেন তখন তাহারা দেখিল নিজেদের শ্রম দিয়া যাহাদিগকে এতদিন পুষ্ট করিয়াছে তাহারাই তাহাদিগকে নিজেদের চেয়েও হেয় জ্ঞান করে। মানব সমাজের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই মহামতি John Ruskin ক্ষোভে বলিয়াছেন—

"We are always in these days endeavoring to separate intellect and maunal labor; we want one man to be always thinking and another to be always working, and we call one a gentleman and other an operative, wheras the the workman ought often to be thinking and the thinker often to be working, and both should be

gentleman in the best sense. As it is, we make both ungentle the one envying, the other despising, his brother ; and the mass of society is made up of morbid thinkers and misérable workers.

The following Paper by Prof. J. J. Vakil was read by Prof. Ariam Williams on the occassion of the farewell of Prof. Formichi.

We have known four types of Occidentals, as they appear to us Indians. There is the type that can see nothing in our culture and the type that swears by India, because it has not understood the West. For both these types we have no use. The third type is that which, while understaning both the good and the bad in their own culture, have turned to India to satisfy some urgent need of their personality. Their approach is primarily through the heart, but they differ from the raw-enthusiast type in having at their disposal the highest mental equipment which the West can give to its children. The fourth type is the oriental scholar whose primarily intellectual approach is qualified more or less by emotion. To think of Prof. Formichi as a member of one of the first two types, is manifestly absurd, and only a very little thought is required to convince us that he does not fit into the two other types either. Yet these are the only four broad types of Occidentals that we—at least, I—know. What then—to say that Prof. Formichi stands the sole representative of a tpye unique of its kind, would be flattery, to say that he is the only representative known to me of such a type, but the bare truth. He is really a combination of the profound scholar of things Indian, and the highest product of western civilisation turning to India for something which she alone can give him. Unlike any profound scholar that I know, he is a profound scholar of that which stirs his heart.

Like all scholars he has had to count the dry bones of the body of Indian civilisation, but he has never for one moment, I feel, lost the vision of the lover. I, who am not a scholar know him as a lover of India, and knowing him so, I marvel that he is also, among great Pundits, admittedly one of the very greatest.

And not only has he loved India, but India—and here I do not refer to the people of India--has loved him. We all love the moon and see her as we love her, but what do they see whom the moon loves? Does she not, as Browning says,

"Turn a new side to her mortal,
Side unseen of herdsman, huntsman, steersman—
Blank to Zoroaster on his terrace,
Blind to Galileo on his turret,
Dumb to Homer, dumb to Keats—him, even ......
What were seen? None knows, none ever shall know.
Only this is sure—the sight were other,
Not the moon's same side, born late in Florence,
Dying now impoverished here in London.
God be thanked, the meanest of his creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her.

India too has two soul sides—one to face the world with, one to show a man when she loves him. And Prof. Formichi has been shown the other side than that she faces the world with.

All oriental scholars carry with them a greater responsibility than that of mere scholarship, especially at the present day when the East and the West need one another as never before in history. Prof. Formichi, carries an even greater responsibility because he is an Italian scholar. England may fail to understand and appreciate India, we shall not despair of Europe; but if Italy fails to understand, then we should be tempted to endorse the much-abused lines "East is East and West is West etc."

Therefore I, who am, by no means a gushing admirer of Europeans, had set up a higher standard for an Italian scholar of oriental studies than from a European scholar of any other nationality, and Prof. Formichi has more than

fulfilled my expectations. I feel that he has appreciated our culture fully, has pushed appreciation to the furthest limit to which it can go without degenerating into flattery or sentimentalism. He has lingered fondly over each jewel of Indian thought, but he has not spared to tell us how—to use his own well-chosen expression—it lies imbedded in a heap of rubbish and nonsense. Not being a scholar I cannot tell how many of these jewels, Prof. Formichi has unearthed for the first time from the dung-hill of ritualistic formularies; how many, already discovered he has polished and refined; how many minor lights he has caused to shine with a brilliancy as of a star of the first magnitude in the blue sky of Italy. But I know this; that I shall always be grateful to Prof. Formichi for pointing out to us one such jewel—that wonderful second hymn on the human body in the tenth book of the Atharva Veda, which has never before been understood in its true significance; which has lain mute and patient in the heap of rubbish, waiting for the day when the voice of its maker, the Indian poet-seer of hundreds of years ago, should penetrate the heart of this Italian poet-scholar and wake response there, across the gulf of ages. Here the Italian heart has gazed into the heart of India and is one with it, and this is a great thing that has happened, for I feel that this hymn X, 2 of the Atharva Veda with its spiritualisation of the body may well be the basis of another and a greater Upanishad of the Future—an Upanishad not of India's only, but of the world. Therefore when Prof. Formichi charges with ignorance those people who do not know that the right religious term with which to label him, is that of Buddhist, I am tempted to bring the same charge against him, because he does not know that he is not so much a Buddhist—the intermediate descendant of the poets of the Vedas, through the Upanishads—but the direct descendant of that Indian poet whose spirit suffused every limb of his body as he chanted for the first time that nuptial hymn of the marriage of Earth and Heaven, which we know as Hymn X, 2 of the Atharva Veda.

শ্রীমান্ গোখ্‌লে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পক্ষ হইতে এই অভিনন্দনটী পাঠ করেন :—

Dear Prof. Formichi,

As you will leave us tomorrow, and India shortly after, I take this opportunity of offering, on behalf of the Vishvabharati Students' Association, our best regards to yourself and wishing you a happy journey.

The time during which we had the privilege of having you amongst us, was but too short ; yet the inspiration which you have brought us will be a parmanent asset in the oft faltering persuit of our ideal. Ours is a bold endeavour. The time may not seem to be ripe for such a reconciliation of the human mind as we are endeavouring to bring about. There may be sufficient cause for being sceptic about immediate success ; but our strength lies not in any hope of success, but in our non surrender to the temptation of success. Love and unity have been our watch-words and we cherish the faith that the human mind shall have its ultimate fulfilment in the complete blossoming of all its organisms in a beautiful harmony of knowledge. During your short stay, you must have had glimpses of the true India, the India which eludes the eye of the indifferent or the merely curious and speculative observer. True understanding cannot come except through deep sympathy and power for identification, and those of us who had the opportunity of coming into closer touch with you than the rest, could not have failed to be impressed by the remarkable gift you have for grasping the fundamental standpoints of each Indian thought whether ancient or modern, and bringing to bear upon it a comparative yet deeply sympathetic outlook, which gives a peculiar force and point to every argument and conclusion of yours. We have found in you a sincere admirer of the synthetic and creative activities of India, which in the past testified to a life of undaunted viour and deep vision and which in the present, are sowing the seed of a new life of enterprise and idealism, through which she seek to fulfil humanity in its own heri-

tage. Among the great scholars of the west who have appreciated the ideal of the Visvabharati and contributed to its growth and realisation, you have forged the latest strong link of association between the West and the East, and this link we fully trust, is strong enough to bear the greatest strain of disappointment and adversity, which may like winter, be shedding the dead leaves from the branches only to brace them up to bear the new blossom of spring.

We, the students of the Vishva-bharati, are only a few in number but the pioneer, of every great cause are always few and the faith that ours is a true and a noble cause is enough to support us through the throng of pressing self-interests and adverse criticisms. You have known something of our activities here with regard to both the artistic and the purely literary branches of knowledge. The great attractions, which have brought us here together from all parts of India and outside have been the nobility and courageousness of true ideal, the love of nature which Santiniketan inspires and expresses through the hand of the artist, the voice of the musician and the words of wisdom and beauty and last but not the least, the great personality that has day by day, watered this tender plant an Ashram and soared and brooded over it, to shads it as it were under its ample wings of fancy, lest it get scorched ere it shows its prime. You have known our aspirations and also along with them our failngs and weakenesses. We do not seek to throw the mantle of secrecy over the latter, because a rigid exposure alone will wither them and crumble them to dust. We only ask you, in future, through your busy life, to reserve for us a soft corner in your heart which will cherish the memory of what little good you have found in us and which will rectify our blemishes through the gentle force of love and sympathy. We hope, Italy will through your services understand India and the Vishvabharati better than ever before, and help to maintain a permanent bond of unity between the two representatives of two great ancient cultures.

I once more wish you a happy voyage and pray you may live long to see the fruit of the seeds you have sown here.

গান

লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে সুর দেহ তার আনি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস কর ভাসাও অশ্রুজলে
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II র্সা র্সা -া। র্সর্রা ^র্সা। ^র্সা -না I র্রা র্সা -া। র্সা -া। র্সা
ল হ ল০ ০ হ০ ০ তু লে ০ ল ০ হ

-র্রা I ধর্সা র্সা না। না -ধা। পা -হ্মা I পা -া ধা। না -া। পা
০ নী র ব বী ০ ণা ০ খা ০০ ০ নি ০ তো

পা I পা -দা দা। দা -া। দা -ণা I পা -া দা। পা -া। পা
মার্ ন ন্ দ ন ০ নি ০ কু ন্ জ হ ০ তে

-হ্মা I পা -ণা ণা। ^ণদা -া। পা -া I মপা -া গা। গা -া।
০ সু র দে হ ০ তা র্ আ ০ নি ও ০

গা -মা I পা -না না। ধা -নধা। পা -ধা I মা -পা পা। পা
হে ॰ সু ন্ দ র ॰॰ হে ॰ সু ন্ দ র

-া। -া -া II
॰ ॰ ॰

না না II নর্সা র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I র্সা র্সা -া। র্সা -া।
আ মি আঁ ধা ॰ র ॰ বি ॰ ছা য়ে ॰ আ ॰

র্সা -না I র্সা র্সা -জ্ঞা। জ্ঞা -া। জ্ঞা -জ্ঞর্রা I র্সা র্রা -া। -া
হি ॰ রা তে ॰ ব ॰ আ ॰॰ কা শে ॰ ॰

-া। -া -র্মা I র্রমা র্মা -া। জ্ঞা -া। জ্ঞা -র্রসা I র্সর্রা র্সনা -া।
॰ ॰ ॰ তো মা ॰ রি ॰ আ ॰॰ খা নে ॰

-া -া। -া -া I নর্সা র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I র্সর্রা র্সা -া। র্সা
॰ ॰ ॰ ॰ তা রা য় তা ॰ রা য় জা গা ও তো

-া। র্রর্সা না I না র্সা -া। র্সা -না। না -র্সা I ধনা -র্সনা ধা।
॰ মা র্ আ লো ক্ ভ ॰ রা ॰ বা ॰ ॰ ॰ নী

পা ।। পা -ধা I পা -না না। ধা -না। পা -ধা I মা -পা পা।
ও ॰ হে ॰ সু ন্ দ র ॰ হে ॰ সু ন্ দ

পা -া। -া -া II
র ॰ ॰ ॰

-া -া II {সা সা -া। রা -া। রা -গা I মা পা -দা। দমা
॰ ॰ পা ষা ণ আ ॰ মা র্ ক ঠি ন্ দু

-পা। গা -া I গা গা -মা। রা -গা। গা -পা I পমা গা -া।
॰ খে ॰ তো মা য় কেঁ ॰ দে ॰ ব লে ॰

-া -া। -া -া I গা মা মা। মা -া। মা -া I মা পা পা।
০ ০ ০ ০ প র শ দি ০ য়ে ০ স র স

পা -া। পা দা I দা দা -া। দা -া। পা -পা I পদা পা -া।
ক ০ র ০ ভা সা ও অ ০ শ্রু ০ জ লে ০

পা -া। পা -দা I মা -া পা। দা -পা। দপা -মা I গা -মা
ও ০ হে ০ সু ন্ দ র ০ হে ০ সু ন্

পমা। মগা -া। -া -া} I র্সা -া র্সা। র্সা -া। র্সা -া I র্সা -া
দ র ০ ০ ০ শু ষ্ ক যে ০ এ ই ন গ্

র্সা। র্সা -া। র্র্সা -না I র্সা -া জ্ঞা। জ্ঞা -া। জ্ঞা -র্রা I র্সা
ন ম ০ রু ০ নি ০ ত্য ম ০ রে ০ লা

র্রা -া। -া -া। -া -র্মা I র্রমা র্মা -া। জ্ঞা -া। জ্ঞর্রা র্সা I
জে ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্ চি ০ ত্ত ০ ০

র্সর্রা র্সনা -া। -া -া। -া -া I র্সা র্সা া। র্সা -া। র্সা -া I
মা ঝে ০ ০ ০ ০ ০ শ্যা ম ল র ০ সে র্

র্সা র্সা -া। র্সা -া। র্র্সা -না I না -া র্সা। র্সা -া। না -র্সনা I
আঁ চ ল্ তা ০ হা র্ ব ০ ক্ষে দে ০ হ ০ ০

ধনা -া পা। পা -া। পা -ধা I পা -না না। ধা -া। পা -ধা I
টা ০ নি ও ০ হে ০ সু ন্ দ র ০ হে ০

মা -পা পা। পা -া। -া -া II II
সু ন্ দ র ০ ০ ০

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

VISVA-BHARATI

VARSHIKA PARISHAT

(ANNUAL GENERAL MEETING.)

24th December, 1924.

The Third Varshika Parishat (Annual General Meeting) was held in the Mango Grove of Santiniketan at 8 o a.m. on Wednesday the 24th December, 1924.

Present:

Charles F. Andrews (in the chair)

Vidhusekhar Sastri
Kshitimohan Sen
Sunitikumar Chatterji
Kalidas Nag
Prodyotkumar Sen
Jitendramohan Sen
Sailendranath Sinha
H. P. Morris
Karunabindu Biswas
P. C. Lal
Devendramohan Bose
Snehamaya Datta
Kalipada Mitra
Surendrakumar Sarkar
Narendranath Ray
Anathnath Bose
Amiyachandra Chakravarti
Monindrachandra Sen Gupta
Govindachandra Choudhuri
Upendranath Bose Roy
Santoshchandra Majumdar
Dhirendranath Mukerji
Madhusudan Sen Gupta
Gourgopal Ghosh
Charuchandra Bhattacharya
Kalimohan Ghosh
Jatindranath Mukerji
Promodaranjan Ghosh
J. J. Vakil
Punyendranath Majumdar
Santosh Bihari Bose
Dinendranath Tagore
Anadikumar Dastidar
Nagendranath Aich
Aswinikumar Ghosh
Nepalchandra Ray
Jyotishchandra Ghosh
Priyanath Das
Mrs. Nirmalkumari Mahalanobis
Miss Hembala Sen
Miss Renuka Majumdar
Pryanath Naik

Prasantachandra Mahalanobis (Karma-sachiva)

Opening of the Parishat.

Prasantachandra Mahalanobis, Karma-sachiva (General Secretary) opened the proceedings with the words:

"To order members in Parishat".

Charles F. Andrews, Pradhana, escorted by the members of the Visva-bharati entered and took the presidential seat.

The opening vedic hymn was then chanted, all standing.

Affirmation of Ideals.

Vidhusekhar Sastri, on behalf of the Chairman, proceeded with the Sankalpa-vachana (Affirmation of Ideals).

Notice and Agenda.

The Karma-sachiva (General Secretary) then read the notice of the meeting and placed the following agenda before the meeting.

ANNUAL GENERAL MEETING.

The Varshika Parishat (Annual General Meeting) of the Visva-bharti will be held at Santiniketan at 8 a.m. on Wednesday, the 24th December, 1924. All Sadasyas (Members) are earnestly requested to attend.

10, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA.
15th November, 1924.

PRASANTACHANDRA MAHALANOBIS
Karma-sachiva (Secretary)
Visva-bharati.

AGENDA.

(1) Address by Dr. Brajendranath Seal and other persons nominated by the President.
(2) Annual Report and Audited Accounts.
(3) Budget Estimates for 1924-25.
(4) Election of the Karma-sachiva (Secretary).
(5) Election of the Members of the Samsad (Governing Body).
(6) Appointment of Auditors.
(7) Amendment of Statutes.
(8) Confirmation of Bye-laws and amendments to Regulations.
(9) Resolutions under Regulation 6 and 10, if any.
(10) Interpellations, if any.
(11) Miscellaneous.

Chairman: Charles F. Andrews.

In the absence of Rabindranath Tagore and also of Brajendranath Seal, Charles F. Andrews, Pradhana delivered the Annual Address (Published separately).

He then called upon Dr. Sten Konow, (Oslo, Norway) Visiting Professor for 1924-25, to address the meeting.

Address by Dr. Sten Konow.

Dr. Sten Konow delivered an address in Sanskrit and also spoke a few words in English, a summary of which is given below.

"My friends, I bow down in reverence to the poet to whom we owe the idea of the Visva-bharati. It is a poet's vision. To this home of peace (Santiniketan) men can come from every quarter of the globe in a common endeavour to promote mutual understanding and good will."

"It is a poet's vision and it came at a time when men were in sore need. The Gospel of Jesus had proved powerless when people rose against people in Europe and in the name of the King of Peace told men to take to arms. The Church invoked His Name to support the cause of each contending country and exhorted men to kill men from the pulpit."

"The outlook in the West was hopeless when the poet came from the East and asked us to seek salvation through faith in new ideals. Wise men of the world smiled but there were individuals who felt that there was still hope for humanity. The poet's vision must, some day, become true. The nations of the world must join hands in a common endeavour to make a new history of the world."

"I am waiting for this new development. It will not do to bring every country and every continent under European rule and European influence. Asia, asleep for ages, must wake and make her own contribution. All the peoples of the world must come together working towards common ideals for the welfare of the whole world."

"There are differences and there are conflicts of interest and it will be idle to ignore them. But it is the aim of the Visva-bharati to study such differences with a view to reconciling them. Life is harmony, rich in its variety. Death alone is uniform. The aim of the Visva-bharati is life-giving; it is to achieve unity in diversity."

"I take it to be a good omen that the Visva-bharati has had its origin in India. India has never attempted to conquer the world by force and violence. Millions in India have kept their faith in lofty ideals. We shall move forward inspired by the spirit of India and fulfil the poet's vision."

Address by Mr. Ngo-Chang Lim.

The Chairman next called upon Mr. Ngo-Chang Lim of China, Visva-bharati Visiting Lecturer for 1924-25 to address the meeting.

Mr. Ngo-Chang Lim gave a short address in English a summary of which is given below.

"My friends, I congratulate you on the occasion of this meeting and wish you all the happiness of an overflowing life. I feel very fortunate indeed in having the privilege of being with you at this time of the festivities and to see with my eyes and feel with my heart the atmosphere of peace and good will which is essential for making a world happier than we have hitherto known it to be."

"We can see the happiness of re-union and fellowship reflected on every face. We can see in this meeting a tie, as it were, linking the past with the present; and we can also see with our mind's eye the possibilities of the future. We are reminded on this occasion of the lofty idealism of the founder of the Visva-bharati who has dedicated this Institution to humanity."

"On this occasion of my first participation in a meeting of this kind among Indian friends my mind goes back to by-gone ages when Chinese pilgrims used to come to this country despite long and weary journeys to seek truth and peace of mind. The early Indian Buddhists who visited China and the early Chinese pilgrims who sought the holy land of India for enlightenment constituted a cultural tie between China and India in the past. It is desirable that this tie should be renewed and strengthened by us. I hope the Visva-bharati will succeed in achieving this and in maintaining an unbroken cultural contact between China and India. I hope that a branch of the Visva-bharati might be soon established in China."

"It has been my great ambition to see India and to come to Santiniketan ever since I met the poet and came under his personal inspiration. I cannot tell you how happy I am in finding myself here at this time. I offer you my greeting and wish you all happiness."

Address by Pandit Vidhusekhar Sastri.

Vidhusekhar Sastri spoke a few words in response and conveyed the greetings of the Visva-bharati to all visitors.

Adjournment of the Parishat.

The meeting was then adjourned to 1-30 p.m. on the same day at the Santiniketan Kala-bhavan.

(Sd.) P. C. Mahalanobis
Karma-sachiva.

ADJOURNED VARSHIKA PARISHAT, 1924.

The adjourned meeting of the Parishat was held in the Kala-bhavan, Santiniketan at 1-30 p.m. on Wednesday the 24th December, 1924, with Charles F. Andrews in the chair.

(The same members were present).

Annual Report for 1924.

1. Prasantachandra Mahalanobis, Karma-sachiva read the Annual Report for 1924.

Resolved that the Annual Report for 1924 be adopted subject to such verbal additions and alterations and subject also to the additions of such appendices as the Karma-samiti may think necessary.

Proposed by—Jitendranath Sen
Seconded by—Nepal Chandra Ray
} *carried nem. con.*

Balance sheet for the Period ended 31st December, 1923.

2. Read the following resolution of the Samsad (Governing Body) dated the 23rd December, 1924.

"Resolved that the Audited Accounts for 1922 and 1923 be forwarded to the Parishat for consideration and necessary action."

The Karma-sachiva then placed before the meeting the Auditor's Report (annexed hereto) on the Accounts for the period ended 31st December, 1923, submitted by Messrs. Ray & Ray, Chartered Accountants and added the following explanatory remarks.

(*a*) The Visva-bharati was formally constituted on the 16th May, 1922 while the system of keeping central accounts for the Visva-bharati as a whole was started from the 1st January, 1923 (*Vide* resolution of the First Varshika Parishat, dated 26th December, 1922). This explained why the auditors were obliged to accept certain estimated figures in drawing up the Balance Sheet for the period ended 31st December, 1923. Certain items of Capital Expenditure had been passed by the Department of Rural Reconstruction in consolidated form without keeping detailed vouchers before the system of central accounts had been brought into operation for that department.

(*b*) The Karma-sachiva further explained that out of the donation expenses of Rs. 18,101-4-3 (Rupees Eighteen thousand one hundred and one, annas four and pies three only) shown under the head "General Account", a sum of Rs. 16,001 (Rupees sixteen thousand and one only) represented a transfer to the "Life Members Fund" shown under the latter head so that real expenses for collecting donations amounted to about Rs. 2,100-4-3 (Rupees two thousand one hundred four annas and three pies only).

Resolved that the audited accounts for the period ended 31st December, 1923 be passed.

Proposed by—JYOTISHCHANDRA GHOSH
Seconded by—CHARUCHANDRA BHATTACHARYA } *carried nem. con.*

Election of Karma-sachivas.

3. The Karma-sachiva reported that the Samsad had nominated Rathindranath Tagore and Prasantachandra Mahalanobis for election as Karma-sachivas (General Secretaries) for the next term of office and that no further nomination had been received for such election. The Chairman declared Rathindranath Tagore and Prasantachandra Mahalanobis elected as Karma-sachivas (General Secretaries) of the Visva-bharati for the next term of office.

Election of Members of the Samsad.

4. The Karma-sachiva handed over to the Chairman the report of the scrutineers appointed by the Samsad for counting the votes for election of members of the Samsad.

The Chairman declared the following persons to be elected members of the Samsad (Governing Body).

(*i*) *Adhyapaka Mandali, Santiniketan*:—(1) Vidhusekhar Sastri, (2) Pramadaranjan Ghosh, (3) Jagadananda Ray, (4) Phanindranath Bose, (5) Bibhuti Bhusan Gupta.

(*ii*) *Sriniketan Samiti*:—(1) Kalimohan Ghosh, (2) Santosh Chandra Majumdar and (3) Santosh Bihari Bose.

(*iii*) *Asramik-Sangha*:—Amiya Kumar Bhattacharya.

(*iv*) *Visva-bharati Sammilani, Calcutta*:—Suniti Kumar Chatterji.

(*v*) *Ordinary Members*:—(1) Charuchandra Bhattacharya, (2) Indu Bhusan Sen, (3) Mrs. Kiranbala Sen, (4) Narendranath Law, (5) Jehangir J. Vakil, (6) Jitendramohan Sen, (7) Dwijendranath Maitra, (8) Sisir Kumar Mitra and (9) Amal Home.

Appointment of Auditors: Messrs. Ray and Ray.

5. Read a resolution of the Samsad dated 23rd December, 1924 recommending the appointment of Messrs. Ray & Ray as Auditors for the financial year ending 30th September, 1925.

Resolved that Messrs. Ray & Ray be appointed as Auditors for the financial year ending 30th September, 1925.

Proposed by—CHARUCHANDRA BHATTACHARYA
Seconded by—SANTOSHCHANDRA MAJUMDAR } (*carried nem. con.*).

Changes in Statutes.

6. Prasantachandra Mahalanobis, Karma-sachiva moved on behalf of the Karma-samiti the following changes in Statutes. The proposals were seconded by Nepalchandra Roy and were carried *nem. con.*

Statute 9.—Add "Sumantra Sabha" under "Constituent Bodies."

Statute 15.—(Powers of the Samsad) Add the following clause:

"To appoint one or more Assistant Secretaries or Deputy Secretaries with such powers as the Samsad may think fit."

Statute 15, clause (iv): Add "In case of every employee with whom any Constituent Body is empowered to deal an appeal shall however lie with the Samsad."

Statute 15, clause (xiv): Add "the Sumantra Sabha" after the words "The Parishat."

Statutes 22 and 30: Add "or Local Secretaries" after the words "There shall be a Local Secretary."

Statute 29: Substitute "Sriniketan Karmi-Sangha" for members of the Sriniketan Staff.

Statute 36: Substitute the words "or Karma-sachivas (General Secretaries) being appointed" for the words "In the case of a Joint Secretary being appointed."

Statute 43: Add "The General Banking Account shall be operated on by the Artha-sachiva (Treasurer) or in the absense by a Trustee authorised to do so by the Artha-sachiva under Statutes 35. Departmental Accounts may be opened and may be operated on by officers authorised to do so by the Samsad."

Substitute "Institute of Rural Reconstruction" for "Department of Agriculture and Village Economics" wherever it occurs.

(all carried *nem. con.*).

With the permission of the Chairman and the meeting the Karma-sachiva withdrew the proposed change of Statutes 10 and 13.

Changes in Regulations.

7. The Karma-sachiva reported that no changes had been made in the Regulations since the last sitting of the Parishat.

Retrenchment Committee.

8. Jyotishchandra Ghosh moved and Jatindranath Mukerji seconded the following resolution standing against the name of the former and of which notice had been given under Regulation 10.

"That the Varshika Parishat recommends to the Samsad (Governing Body) that every effort be made to reduce the deficit for the current financial year."

With the permission of the Chairman and of the meeting Prasanta Chandra Mahalanobis moved the following amendment which was accepted by the mover of the original resolution, that the following words be added: "and a Committee consisting of the following persons be appointed to make definite recommendations to the Samsad in this connection."

(carried by majority with one dissentient vote).

The original resolution as amended was passed *nem. con.*

The following persons were elected to serve on the above committee: C. F. Andrews, Jyotishchandra Ghosh, Punyendu Chandra Majumdar, Snehamaya Datta and Prafulla Chandra Sen (to be assisted by the different Secretaries who, however, will not be members of the Committee).

(Carried nem. con.).

Committee for Office Forms.

9. With the permission of the Chairman and of the Parishat Prasantachandra Mahalanobis moved and Jitendramohan Sen seconded the following resolution which was carried *nem. con.*

Resolved that a Committee consisting of Shehamaya Datta, Prafulla-chandra Sen and Prasantachandra Mahalanobis be appointed to make recommendations about the form of receipt to be issued by persons collecting donations and subscriptions on behalf of the Visva-bharati.

(*carried mem. con.*).

Vote of thanks to Auditors.

10. **Resolved that** the Varshika Parishat places on record its grateful appreciation of the honorary services of Messrs. Ray & Ray, Chartered Accountants.

Proposed by—NEPALCHANDRA RAY
Seconded by—PRASANTACHANDRA MAHALANOBIS } *carried nem. con.*

Vote of thanks: Retiring Members of the Samsad and other Committees.

11. **Resolved that** the Varshika Parishat places on record its grateful appreciation of the services rendered by the retiring members of the Samsad, the Karma-samiti and other committees of the Visva-bharati.

Proposed by—NEPAL CHANDRA RAY
Seconded by—PRASANTACHANDRA MAHALANOBIS } *carried nem. con.*

Confirmation of Parishat Proceedings dated 26th December, 1923 and 17th February, 1924.

12. **Resolved that** the proceedings of the Second Varshika Parishat dated 26th December, 1923 and of the Sadharana Parishat dated 17th February, 1924 as presented by the Karma-sachiva be confirmed.

Proposed by—JITENDRAMOHAN SEN
Seconded by—KALIMOHAN GHOSH } *carried nem. con.*

Greetings to Rabindranath Tagore.

13. **Resolved that** the members of the Visva-bharati in Varshika Parishat assembled wish with all reverence Godspeed to Rabindranath Tagore during his present tour in South America and send him their respectful and affectionate greetings.

(Proposed from the Chair and carried unanimously).

Greetings to Rathindranath Tagore.

14. **Resolved that** the members of the Visva-bharati in Parishat assembled send their affectionate greetings to Rathindranath Tagore, Karma-sachiva (General Secretary) of the Visva-bharati, now touring in Europe on behalf of the Visva-bharati.

(Proposed from the Chair and carried unanimously).

Greetings to Kishorimohan Santra.

15. **Resolved that** the members of the Visva-bharati in Parishat assembled send their affectionate greetings to Kisorimohan Santra, Assistant General Secretary, on leave due to ill health, and wish him a quick recovery from his illness.

(Proposed from the Chair and carried unanimously).

Committee for confirmation of Proceedings.

16. **Resolved that** in accordance with Regulation 14, a Committee consisting of C. F. Andrews (Chairman), Devendramohan Bose, Charu Chandra Bhattacharya, Snehamaya Datta, Jitendramohan Sen and the Karma-sachiva be appointed for confirmation of the proceedings of the Varshika Parishat dated 24th December, 1924.

Shanti-Vachana.

The proceedings terminated with the chanting of the Santi-vachana.

Confirmed.
(Sd.) C. F. ANDREWS
Chairman.

P. C. MAHALANOBIS,
Karma-sachiva (General Secretary),
Visva-bharati.

1. (Sd.) D. M. BOSE
2. ,, C. C. BHATTACHARYA
3. ,, S. DATTA
4. ,, J. M. SEN

Members, Confirmation Committee.

VISVA-BHARATI

SADHARANA PARISHAT

(ORDINARY GENERAL MEETING.)

12th April, 1925.

An ordinary Parishat was held at Santiniketan at 7-0 a.m. on Sunday the 12th April, 1925.

C. F. Andrews, (in the chair)

Aich, Nagendranath
Bose, Devendramohan
Banerji, Abinashchandra
Basu, Anathnath
Basu, Phanindranath
Benoit, F.
Basu, Santoshbehari
Bhattacharya, Charuchandra
Bhattacharya, Amiyanath
Biswas, Karunabindu
Bose, Nandalal
Chaudhuri, Govindachandra
Chaudhuri, Saroj Ranjan
Das, Saroj Kumar
Datta, Snehamay
Ghosh, Gourgopal
,, Pramadaranjan
,, Ramanimohan
,, Kalimohan
,, Batuk Krishna
,, Upendranath
Ganguli, Jyotirmoyee (Miss)
Home, Amalchandra
Kar, Surendranath
Lal, Premchand
Majumdar, Santoshchandra
Mitra, Anil Kumar
Mahomed, I. A.
Mukerji, Jatindranath
,, Prabhat Kumar
Mahalanobis, Nirmalkumari (Mrs.)
Nag, Kalidas
Ray, Jagadananda
,, Nepalchandra
Sarma, L.
Sethi, Gurudutt
Sen, Arunchandra
,, Indu Bhusan
,, Hembala (Miss)
,, Kshitimohan
,, Kiranbala (Mrs.)
Sen Gupta, Madhusudan
Tagore, Kritindranath
,, Pratima (Mrs.)
Vakil, J. J.
and others

Rathindranath Tagore (Karma-sachiva).

Rathindranath Tagore, Karma-sachiva, opened the meeting by calling the members to order in Parishat.

Chairman : C. F. Andrews.

1. In the absence of the President, C. F. Andrews, Pradhana took the chair. C. F. Andrews reported that although Rabindranath Tagore was present at Santiniketan ill-health prevented him from presiding over the Parishat but he was with them in spirit.

Notice and Agenda.

2. Rathindranath Tagore, Karma-sachiva, placed before the meeting the notice and agenda for the meeting.

GENERAL MEETING.

The Parishat (General Meeting) of the Visva-bharati will be held at Santiniketan on Sunday, the 12th April, 1925, at 7 a.m. All Sadasyas (members) are earnestly requested to attend.

10, Cornwallis Street,
Calcutta.
12th March, 1925.

PRASANTACHANDRA MAHALANOBIS,
Karma-sachiva (Secretary),
Visva-bharati.

AGENDA.

1. Address by the President.
2. Amendment of Statutes.
3. Audited accounts for the year ending on 30th September, 1924.
4. Miscellaneous.

VISVA-BHARATI PARISHAT.

(Supplementary Agenda).

Notice is given under Regulation 10, Clause (*a*) that the following proposals for changes in Statutes will be moved on behalf of the Karma-samiti at the Parishat to be held in Santiniketan at 7-0 a.m. on Sunday the 12th April, 1925.

10, Cornwallis Street, Calcutta,
4th April, 1925.

P. C. MAHALANOBIS,
Karma-sachiva.

PROPOSED CHANGES IN STATUTES.

Substitute everywhere :—

(*i*) "Institutions of Visva-bharati" *for* "Constituent Bodies of Visva-bharati."
(*ii*) "Sumantra Sabha" *for* "Nyasika Sabha" (unless otherwise stated).
(*iii*) "Santiniketan Samiti" *for* "Asram Samiti" and "Santiniketan Sachiva" *for* "Asram Sachiva."
(*iv*) "Sriniketan Samiti" *for* "Surul Samiti" and "Sriniketan Sachiva" *for* "Surul Sachiva."
(*v*) "Immoveable property" *for* "Real property."

Statute 1. Delete : "(including Corporate Bodies, Societies, Institutions and Associations)".

Statute 8. Modify as follows : "Members of not less than 1 year's standing shall have one vote each. Votes shall be exerciseable in person or by letter in manner prescribed in the Regulations."

Statute 9. Delete Statute 9.

Statute 10. Modify as follows: "Persons other than members of Visva-bharati shall not be eligible to be a member (*exofficio* or otherwise) of the Parishat, the Sumantra Sabha, the Samsad or the Executive Committee of any Institution through which Visva-bharati out of its funds carries out its objects or executes its powers."

Statute 11. Delete the clause: "To sanction or refuse sanction to capital expenditure exceeding Rs. 10,000 under any one head."

Add: "By 3/4ths majority of members voting" *before* "to add to, alter or rescind the Statutes or any of them."

Statute 12. Modify as follows: "The number of Parishats to be convened each year, the notice, agenda, quorum and procedure for the conduct of business generally at a Parishat shall be prescribed in the Regulations subject to the following provisions:

(*i*) On the written requisition of not less than 20 members of Visva-bharati the Samsad shall convene a Visesha (Special) Parishat for the transaction of the requisitioned business. If within three months the Samsad fails to convene the Visesha Parishat so requisitioned the requisitionists themselves may convene a Visesha Parishat to be held at Santiniketan for the transaction of the requisitioned business.

(*ii*) Any 50 members of Visva-bharati may state a proposition of policy (leaving out the details of its execution) in carrying out one or more of the objects or powers of Visva-bharati and request the Karma-sachiva to convene a special Parishat to consider whether there should be a referendum on such proposal of policy only.

The Parishat may by a majority of members voting direct the Karma-sachiva to ascertain the opinion of all members of Visva-bharati by post:

(*i*) as to whether such policy stated as aforesaid should be initiated by the Samsad; or

(*ii*) as to whether any policy already initiated is in direct conflict with the said proposition of policy.

The opinion of members when ascertained by the Karma-sachiva shall be placed before a Special Parishat and the opinion of 2/3rds of the entire body of members voting shall bind the Samsad but the Sumantra Sabha shall have the right to suspend its operation for not more than 6 months."

Modify the Statutes regarding the Sumantra Sabha (existing Statutes 12A and 12B and the Nyasika Sabha (existing Statutes 17, 18 & 19) as follows:

Statute 12A. There shall be a Council of Visva-bharati (called the Sumantra Sabha) consisting of Sabhasads as follows:—

(*i*) The present and retired Karma-kartas (Office-bearers), the present and retired Pradhanas, the present and retired Trustees, ex-officio for life.

(*ii*) Honorary members, *ex-officio* for life.

(*iii*) The Trustees of the Santiniketan Asram Trust, *ex-officio.*

(*iv*) Two life Trustees nominated by the Pratisthata-Acharya (Founder-President) who shall hold office for life or till previous retirement and shall have the right to nominate their respective successors provided that failing such appointment the continuing Life Trustee may fill the vacancy so occurring.

(*v*) Donors of Rs. 25,000 or more for life.

(*vi*) Such other persons (being members of Visva-bharati of not less than 3 years' standing) as may be elected Sabhasads by the Parishat by a 3/5ths majority of members voting for such period as may be determined by the Parishat for distinguished services rendered to the cause of Visva-bharati, provided that the number of such elected Sabhasads shall not exceed the total number of other Sabhasads.

Statute 12B. The Sumantra Sabha shall have the following powers :—

(*i*) To advise the Parishat, as well as the Samsad from time to time about the policy and programme of Visva-bharati.

(*ii*) To veto any proposed diversion of funds for purposes inconsistent with the Memorandum of Association, unless a 3/5ths majority of members voting at a Parishat consider that the proposed expenditure is not inconsistent with the Memorandum of Association.

(*iii*) To refer to the Parishat questions relating to the general policy of Visva-bharati; in case of such reference the action recommended by the Sumantra Sabha may be approved by the Parishat by a bare majority but action against the recommendations of the Sumantra Sabha shall require a 3/5ths majority of members voting.

(*iv*) To postpone action being taken on any decision of the Parishat by Referendum for not more than 6 months.

(*v*) To elect its own Secretary and subject to confirmation by the Parishat to frame, alter or rescind rules for its own working.

Statute 12C.

(*i*) There shall be a Committee of the Sumantra Sabha called the Artha-samiti (Board of Trustees) consisting of the Karma-kartas (Office-bearers), Upacharya (Vice-President), the Trustees of the Santiniketan Asram Trust, the two Life Trustees nominated by the Pratisthata-Acharya (Founder President) or their successors and the Trustees of the Trust Deed of Visva-bharati dated 24th December, 1922 and 4 (or such other number as the Sumantra Sabha may determine) Trustees to be elected by the Sumantra Sabha out of its own members. The Artha-sachiva shall act as Secretary to the Artha-samiti (Board of Trustees).

(*ii*) The Artha-samiti (Board of Trustees) shall submit periodical reports to the Sumantra Sabha and shall be subordinate to it and bound by its decision in all matters.

Statute 12D. Subject to Statute 12C, (*ii*), the Artha-samiti shall have the following powers, rights and duties :—

Existing clauses in Statute 19 with the following modifications :

(*i*) "lease for a period of 5 years or more" *for* "lease for a period of 3 years or more".

(*iv*) "To appoint one or more of their own number to execute documents on behalf of the Artha-samiti (Board of Trustees).

(*iva*) "To fill up vacancies among the Trustees of the Visva-bharati Trust-deed dated 24th December, 1922".

Add new clause :

"In consultation with the Samsad to appoint an Assistant Treasurer or other officer or officers to help the Artha-sachiva (Treasurer) on such terms and with such functions as the Artha-samiti may think fit."

Statute 13. Modify as follows: "There shall be a Governing Body called the Samsad consisting of Sadasyas as follows :—

Clause (i) Add "the Upacharya".

Substitute for clauses (ii) & (iii) : "Such number of representatives as the Samsad may determine by Regulation to be elected by each of the Institutions of Visva-bharati (recognised for this purpose by the Samsad) whereby with its funds the objects of Visva-bharati are carried out or its powers executed, provided that no such Institution shall have the right to nominate any representative unless it comprises not less than 10 members of Visva-bharati.

Clause (v) and other clauses : *Add* "by Regulation" *after* "as may be determined by the Samsad".

Clause (vii) : "A number of Sadasyas (repreesntatives) not less than the total number of representatives elected under clauses *(ii)*, *(iii)* and *(iv)* to be elected by the members of Visva-bharati from among members of not less than 2 years' standing, provided that the Samsad shall have power to declare as eligible any particular member of less than 2 years' standing. The number of Sadasyas (representatives) to be elected under this clause shall be determined by the Samsad by Regulation."

Statute 13. Add new clause (viia) : "One or such number of members as may be determined by the Samsad by Regulation to be elected by the members of Visva-bharati from among members of not less than 2 years' standing ordinarily resident outside Bengal provided the Samsad may declare as eligible any particular member of less than 2 years' standing

Statute 14. Add as clause (ii) : "Any member of the Samsad other than the *ex-officio* members, members elected from outside Bengal and members nominated by the Acharya (President), shall cease to be a member of the Samsad if he fails to attend 4 consecutive meetings of the Samsad unless special exemption is granted by the Samsad."

Statute 15. In clause (iv) add : "The Samsad shall have power within 3 months to veto any appointment carrying a remuneration of not less than one hundred rupees per month."

Clause (ix) & (xi) : *Substitute* "Artha-samiti (Board of Trustees" *for* "Nyasika Sabha".

Clause (xii) : *Delete* : "provided that the previous sanction of the Parishat shall be necessary where any expenditure exceeding Rs. 10,000 is involved."

Statute 16A. Substitute : "General Committee of the Samsad" *for* "Executive Committee".

Delete : "for the administrative control and co-ordination of the affairs of Visva-bharati as a whole".

Delete : "Ordinary members of the Karma-samiti............during his absence".

Statute 16B. Delete : "to make suitable appropriations......of the Visva-bharati".

Statute 21. Clause (ii) : *Add in the beginning*: "Subject to Statute 15".

Delete "provided that in case of dismissal there shall be a right of appeal to the Samsad".

Statutes 23 & 24. Delete both the Statutes.

Statute 29 Clause (iii) : *Substitute* "members of the Sriniketan Karmi-sangha (Workers' Association which shall consist of such members of the staff at Sriniketan as may be prescribed in the Rules)" *for* "members of the Surul staff."

Statute 29A. Clause (ii) : *Insert at the beginning*: "Subject to Statute 15".

Delete : "provided that in case of dismissal there shall be a right to appeal to the Samsad".

Statute 30. Modify as follows: "There shall be a local Secretary at Sriniketan called the Sriniketan Sachiva who shall be the Chief Executive Officer at Sriniketan, shall act as Secretary to the Sriniketan Samiti and shall exercise such of its powers and functions as may be delegated to him by the Sriniketan Samiti from time to time. The Sriniketan Sachiva shall be appointed by the Samsad and shall hold office for one year but shall remain eligible for re-election".

New Statute 30A. Clause (i): "There shall be a Samiti (Executive Committee or Board) for the management of each Institution through which the Visva-bharati out of its funds carries out its objects or executes its powers and which is empowered by the Samsad to elect representatives to the Samsad".

Clause (ii): "The Samsad shall define by Regulation the constitution and powers of such Samities provided that such constitution and powers shall be on the same line as those of the Santiniketan Samiti and the Sriniketan Samiti with such modifications as may be considered necessary by the Samsad provided however that such constitution and powers shall be included in the Statutes if the Parishat so decides by a 3/5ths majority of members voting".

Statute 31. Substitute "consisting of themselves and persons who are not members of Visva-bharati" *for* "from amongst their own number".

Statute 32. Modify as follows: "Members of Visva-bharati belonging to any Sthanika Sabha (recognised for this purpose by the Samsad) shall have the right to elect one representative (or more if the Samsad so empowers by Regulation) to be a member of the Samsad. Such representatives shall retire (being re-eligible) at the end of each year and the vacancies shall be filled by election by the members of Visva-bharati of the respective Sthanika Sabhas in manner prescribed in the Regulations".

Statute 33. Add: "(not being a decision by Referendum)" *after* "He shall have the right to postpone effect being given to any resolution of the Parishat".

Statute 35. Modify as follows: "All cheques shall be signed by him and during his absence by one of the members of the Artha-Samiti (Board of Trustees authorised to do so by the Artha-sachiva (Treasurer)".

Substitute "Artha-samiti" *for* "Nyasika Sabha."

Statute 36. Modify the sentence: "He shall be responsible for etc." *as follows*:

"He shall be responsible for the proper co-ordination of the Institution of Visva-bharata and shall have the right of superintendence over all Institutions of Visva-bharati".

Statute 40. Modify as follows: "The term Karmadhyakshas (Local Officers) shall apply to the Santiniketan Sachiva, the Sriniketan Sachiva and such other officers as may be so designated by the Samsad by Regulation".

Statute 49. Modify as follows: "Proposed changes in Statutes shall be notified to all members of Visva-bharati not less than 4 months before the date of the Parishat at which they will be considered and shall be adopted upon being passed by a 3/4ths majority of members voting and upon being confirmed at a subsequent Parishat held not earlier than one month after the first mentioned Parishat by a majority of members voting"

Statute 50. Modify as follows: "Changes in Regulations shall be notified to all members of the Samsad not less than one month before the date of the meeting of the Samsad at which they will be considered and shall be adopted upon being passed by a 3/5ths majority of members voting.

Changes in statutes.

3. Rathindranath Tagore, Karma-sachiva, formally placed before the meeting the above recommendations of the Statute Revision Sub-Com-

mittee submitted by Surendranath Tagore, Indubhusan Sen and Prasantachandra Mahalanobis and forwarded to the Parishat by the Karma-samiti.

The Chairman asked Indubhusan Sen to explain the proposed changes which he did in general terms.

On the suggestion of the Chairman it was decided by the sense of the meeting to take into consideration each statute separately.

The following resolutions were moved and the following modifications in the recommendations of the Statute Revision Committee were made by the Parishat.

Statute 8. Substitute "Members of not less than six months standing" for "members of not less than one year's standing".

Proposed by—KARUNABINDU BISWAS.
Seconded by—CHARUCHANDRA BHATTACHARYA. } carried by three-fifths majority.

Statute 12, Clause (ii).

(*a*) Substitute "the Parishat may by a two-thirds majority etc." for "The Parishat may by a majority of members voting direct the Karma-sachiva etc."

Proposed by—CHARUCHANDRA BHATTACHARYA.
Seconded by—SNEHAMAY DATTA. } Lost.

(*b*) Substitute "The Parishat may be a three-fifths najority" voting direct the Karma-sachiva to ascertain for "Parishat may be a majority of members."

Proposed by—DEVANDRAMOHAN BOSE
Seconded by—AMAL HOME. } Carried.

Statute 12-A, Clause (vi) (Sumantra Sabha).
Omit : "being members of not less than three years standing".

Proposed by—ANATHNATH BOSE.
Seconded by—PRABHAT KUMAR MUKERJI. } Carried

Statute 12-B, Clause (ii).

Substitute "three-fourths majority" for "three-fifths majority".

Proposed by—INDUBHUSAN SEN.
Seconded by—NEPALCHANDRA RAY. } Carried.

Statute 12-D : Omit new clause "In consultation with the Samsad to appoint an Assistant Treasurer".

Proposed by—RATHINDRANATH TAGORE.
Seconded by—KARUNABINDU BISWAS. } Carried.

Statute 13, Clauses (ii) and (iii) : Modify as follows—
"Unless it comprises not less than six members of the Visva-bharati".

Proposed by—SANTOSHCHANDRA MAJUMDAR.
Seconded by—NEPAL CHANDRA RAY. } Carried.

Statute 15, Clause (iv): Omit "The Samsad shall have power within 3 months to veto any appointment, etc."

Proposed by—C. F. ANDREWS.
Seconded by—NEPAL CHANDRA RAY. } Carried.

Statute 30: Substitute "Such period as may be determined by the Samsad" for "one year but shall remain eligible for re-election".

Proposed by—P. C. LAL.
Seconded by—SANTOSH CHANDRA MAJUMDAR. } Carried.

Statute 31: Substitute "and/or" in the place "and" in "consisting of themselves and persons who are not".

Proposed by—INDUBHUSAN SEN.
Seconded by—B. K. GHOSH. } Carried.

Statute 36: Substitute "inspection" for "superintendence".

Proposed by—C. F. ANDREWS.
Seconded by—GOURGOPAL GHOSH. } Carried.

Statute 50: Add "and all such changes shall be placed before a subsequent Samsad and subsequent Parishat for confirmation."

Proposed by—DEVENDRAMOHAN BOSE.
Seconded by—NEPALCHANDRA RAY. } Carried.

(*i*) **Resolved that** the above amendments to the Statutes (as recommended by the Statute Revision Committee) with the modifications mentioned above be adopted.

Proposed by—INDUBHUSAN SEN
Seconded by—DEVENDRAMOHAN BOSE } *carried nem. con.*

(*ii*) **Resolved further** that a Committee consisting of Indubhusan Sen, Devendramohan Bose, Nepalchandra Ray and the Karma-sachivas be authorised to re-arrange, re-number and make such verbal and formal alterations in the Statutes as may be necessary to give effect to the above amendments and place the amended Statutes for confirmation by the Parishat under Statute 49.

Proposed by—NEPALCHANDRA RAY
Seconded by—SANTOSH CHANDRA MAJUMDAR } *carried nem. con.*

Capital Expenditures for Land Acquisition.

4. Considered the following resolution of the Samsad dated 11th April, 1925.

"Resolved that the Samsad recommends to the Parishat that sanction be given for a Capital Expenditure of not more than Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only) for acquiring land in the neighbourhood of Santiniketan and Sriniketan under the Land Acquisition Act".

Resolved that sanction be given for a Capital Expenditure of not more than Rs. 40,000/- (Rupees Forty thousand only) for purposes of Land Acquisition in the neighbourhood of Santiniketan and Sriniketan.

Proposed by—INDUBHUSAN SEN
Seconded by—ABINASHCHANDRA BANERJI } *carried nem. con.*

Proposal about a Printing Press.

5. Considered the following resolution of the Samsad dated 11th April, 1925.

"Resolved that the Samsad considers it desirable to start a Printing Press in Calcutta and recommends to the Parishat that sanction be given for an investment of not more than Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) for this purpose provided that the necessary capital be available for the above purpose and proper business arrangements can be made."

Resolved that the Parishat approves of the proposal for starting a Printing Press in Calcutta and authorises the Samsad to prepare detailed estimates for consideration by the Parishat.

Proposed by—GOURGOPAL GHOSH
Seconded by—CHARUCHANDRA BHATTACHARYA } *carried nem. con.*

The Parishat was then adjourned to 7-0 p.m. at the same place.

Adjourned sitting of the Parishat.

The adjourned meeting of the Parishat was held at 7-0 p.m. on the 12th April, 1925 at Santiniketan.

C. F. Andrews (in the chair). The same members were present.

Rathindranath Tagore, Karma-sachiva reported that owing to the serious illness of Mr. Ranjit Ray, the Auditor, the audited accounts for the period ended 30th September, 1924 had not been received and could not be placed before the meeting.

The Parishat terminated with a vote of thanks to the chair.

Confirmed.

(Sd.) SURENDRANATH MALLIK
Chairman. 22-7-25.

RATHINDRANATH TAGORE,
Karma-sachiva (General Secretary),
Visva-bharati.

VISVA-BHARATI

SADHARANA PARISHAT

(ORDINARY GENERAL MEETING)

22nd July, 1925.

An Ordinary Parishat (General Meeting) of the Visva-bharati was held at 5-30 p.m. on Wednesday the 22nd July, 1925 at 6, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta.

Surendranath Mullik (in the chair).

Banerji, Pramathanath
Bhattacharya, Charuchandra
Biswas, Karunabindu
Bose, Girija Kumar
,, Phanindranath
,, Santosh Bihari
Chatterji, Suniti Kumar
Chatterji, Gopal Chandra
Chaudhuri, Govindo Chandra
,, Pramatha
Dev, Narendranath
Ghosh, Gourgopal
,, Jatischandra
Ganguli, (Miss) Jyotirmoyee
I. Mohomed
Kar, Surendranath
Lahiri, Sudhirkumar
Majumdar, Santoshchandra
Mitra, Sisirkumar
Mukerji, Jatindranath
,, Prabhat Kumar
Nag, Kalidas
,, Asananda
Ray, Nepalchandra
,, Sureschandra
Sen, Indu Bhusan
,, (Miss) Hembala
,, Jitendramohan
,, (Mrs.) Kiranbala
,, Kshitimohan
,, Madhusudan
Sethi, Gurudutt
Tagore, Gaganendranath
,, Abanindranath
,, Samarendranath
Tagore, (Mrs.) Pratima.
Vakil, J. J.

Rathindranath Tagore and Prasanta Chandra Mahalanobis (Karma-sachivas)

Chairman: Surendra Nath Mullik.

1. The Karma-sachiva (General Secretary) reported that owing to ill-health Rabindranath Tagore would not be able to preside over the Parishat but would like to meet the members informally after the business of the meeting had been transacted. Surendranath Mullik was unanimously elected Chairman of the meeting on the proposal of Nepal Chandra Ray seconded by Santosh Chandra Majumdar.

Notice and Agenda.

2. The Karma-sachiva placed before the meeting the following notice and agenda of the meeting:

GENERAL MEETING.

A Parishat (General Meeting) of the Visva-bharati will be held at 6, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta on Wednesday, the 22nd July, 1925, at 5-30 p.m. All Sadasyas (members) are earnestly requested to attend.

10, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA,
The 20th June, 1925.

P. C. MAHALANOBIS,
Karma-sachiva (Secretary),
Visva-bharati.

AGENDA.

1. Address by the President
2. Amendment of Statutes
3. Audited accounts for the financial year ended 30th September 1924
4. Confirmation of changes in Regulations
5. Miscellaneous.

Parishat Proceedings dated 12th April, 1925.

3. The Karma-sachiva read the proceedings of the Ordinary Parishat held at Santiniketan on Sunday the 12th April, 1925.

Resolved that the proceedings of the Ordinary Parishat dated the 12th April, 1925 be confirmed.

Changes in Statutes.

4. Prasanta Chandra Mahalanobis, Karma-sachiva placed before the meeting the amended Statutes as drawn up by a Committee (consisting of Indu Bhusan Sen, Devendramohan Bose, Nepal Chandra Ray and the Karma-sachivas) appointed by the Parishat of the 12th April, 1925 to give effect to the amendments adopted by the said Parishat.

Sures Chandra Ray wanted that the Statutes should be read and discussed one by one and enquired whether new amendments would be in order.

The Chairman ruled that new amendments would be out of order and, taking the sense of the meeting, decided that the Statutes may be taken as read.

Resolved that Statutes as placed before the meeting be confirmed subject to obvious mistakes in printing and inaccuracies in language.

Proposed by—I. MOHOMED
Seconded by—CHARU CHANDRA BHATTACHARYA } *carried nem. con.*

Audited Accounts for period ended 30th September, 1924.

5. The Karma-sachiva placed before the meeting the Balance Sheet and Auditor's Report for the period ended 30th September, 1924 submitted by Messrs. Ray & Ray, Chartered Accountants and explained that owing to the serious illness of the Auditor the Balance Sheet could not be circulated in advance. The sense of the meeting was that attempts should be made to circulate the Balance Sheet in future in advance. The Karma-sachiva gave an assurance that every effort would be made to do so in future.

Gurudutt Sethi enquired whether any depreciation in value had been entered in the stock of machinery and plant. The Karma-sachiva explained that depreciation in value had not been considered in the present Balance Sheet but promised to draw the attention of the Auditor to this point for future guidance. Sures Chandra Ray enquired whether any regular inventory and stock book was kept for all the properties of the Visva-bharati. The Karma-sachiva explained that for the present a stock book was being maintained for the Publishing Department only but that all Executive Committees had already been instructed to make an inventory and prepare a stock book for all stock and stores under their respective control. Santosh Chandra Majumdar enquired why the Publishing Stock was certified by the Assistant Secretary who was in charge of that particular department and not by some independent authority. The Karma-sachiva explained that this had been done in accordance with the accepted practice ; but agreed in principle to the desirability of independent checking.

Maintenance of Stock books.

(i) On the suggestion of the Chairman it was **resolved nem. con.** that arrangements should be made for the maintenance of regular stock books in all departments of the Visva-bharati by members of the Visva-bharati.

Panel for Checking stock.

The following panel for checking the stock in all the departments of the Visva-bharati was then framed for the year ending 30th September, 1925.

Indu Bhusan Sen, Charu Chandra Bhattacharya, Jitendramohan Sen, Jyotis Chandra Ghosh, Sures Chandra Ray, Madhu Sudan Gupta and Gurudutt Sethi.

The Karma-sachiva was requested to arrange suitable dates in consultation with the gentlemen included in the panel for checking the stock.

Karunabindu Biswas pointed out a printing mistake about a date in the Balance Sheet and it was decided to correct the same.

(*ii*) **Resolved that** the Balance sheet for the period ended 30th September, 1924 and the Auditor's Report submitted by the Auditors, Messrs. Ray & Ray, Chartered Accountants, Calcutta, be adopted, subject to obvious mistakes in printing and be sent to the members of the Visva-bharati.

Proposed by—SISIR KUMAR MITRA
Seconded by—NARENDRANATH DEV } *carried nem. con.*

Changes in Regulations.

6. The Karma-sachiva reported that no change in Regulations had been made by the Samsad since the last sitting of the Parishat.

Committee for Confirmation of Proceedings.

7. **Resolved that** a committee consisting of Surendranath Mullik, Chairman, the Karma-sachivas (*ex-officio*), Indu Bhusan Sen, Jyotis Chandra Ghosh, and Pramathanath Banerji be appointed to confirm the proceedings of the Parishat dated the 22nd July, 1925.

Proposed tour of the President.

8. The Karma-sachiva reported that the Acharya (President) intended to leave for Europe on the 29th July for an extended tour in connection with the work of the Visva-bharati and that he would be accompanied by Rathindranath Tagore and Prasanta Chandra Mahalanobis, Karma-sachivas (General Secretaries) and that the Samsad (Governing Body) had requested Devendramohan Bose to act as Karma-sachiva during their absence.

Resolved that the members of the Visva-bharati in Parishat assembled wish with all reverence God-speed to Rabindranath Tagore and party during their forthcoming tour in Europe and wish them success in their mission.

Vote of thanks to the chair.

9. The Parishat terminated with a vote of thanks to the chair proposed by Nepal Chandra Ray.

After the formal meeting was over Rabindranath Tagore came in and gave an informal address.

Confirmed.
(Sd.) SURENDRANATH MALLIK
Chairman.

(Sd.) RATHINDRANATH TAGORE,
,, P. C. MAHALANOBIS,
Karma-sachivas (General Secretaries), Visva-bharati.

(Sd.) I. B. SEN
,, P. N. BANERJI
JYOTIS CHANDRA GHOSH
Members, Confirmation Committee.

আচার্য্যের অভিভাষণ

বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ, ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী কার্য্যালয়
১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী কার্য্যালয়
প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আচার্য্যের অভিভাষণ

বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের বক্তৃতা।

শান্তিনিকেতন।
৯ই পৌষ, ১৩৩২।

মূল্য—দুই আনা।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস—শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১এ, রামকিষণ দাস লেন। কলিকাতা

আচার্য্যের অভিভাষণ

(বিশ্বভারতী পরিষৎ—৯ পৌষ, ১৩৩২)

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্ব্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ড-কালকে কয়েকটি চিঠি পত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সাম্‌নে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্ন-লিপি যখন প'ড়ে দেখ্‌ছিলুম তখন মনে প'ড়্‌লো, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্ত্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্ব-ভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আস্‌তে পার্‌তো না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম-সূচনাদিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্য্যদের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম, যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন "আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা", বলেছিলেন, "জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেম্‌নি ক'রে সকলে এখানে মিলিত হোক্‌।" তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদ-মন্ত্র আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব ক'র্‌চি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হ'য়ে বিশ্বভারতী রূপে সে বিস্তার লাভ ক'র্‌বে, ভরসা ক'রে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারিনি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাত্‌বে; এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাক্‌বে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে—ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখ্‌তে পাই কিন্তু এখানে

আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জ্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ, সে বিচ্ছিন্ন ব'লেই বন্দী! ভেদ-বিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট ক'রে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্চে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাচ্চে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্য-কুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা অবজ্ঞা আত্মপর ভেদ-বুদ্ধি কেবলি যখন কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জা-বোধ পর্য্যন্ত থাকে না। এম্‌নি ক'রে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পাইনে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হ'য়ে যায়। তার প্রধান কারণ সকালে আমরা সকলকে দেখ্‌তে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হ'য়ে রয়েছে। মুসলমান ব'ল্‌তে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে, আপনার ক'রে অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জান্‌তেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু ব'ল্‌তে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে, আপনার ক'রে, অর্থাৎ দারাশিকো এক-দিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এই রকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে প'ড়ে আস্‌চি পাঞ্জাবে আকালী শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্ত্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেচে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েচে ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্য্যন্ত জাগেনি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি ক'র্‌বো ব'লে কল্পনা ক'র্‌তে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হ'য়ে দেখা দিলো তখন সে সম্বন্ধে

বাংলা দেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হইনি যতটা হ'লে তাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জান্‌বার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্ততঃ বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্ব্বদাই প্রকাশ ক'রে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। একথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানিনে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'র্‌তে পারি কেননা সেটা বাহ্য, তাকে বন্ধু সম্ভাষণ ক'রে অশ্রুপাত ক'র্‌তে পারি কেননা সেটাও বাহ্য, কিন্তু "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ" আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা ক'র্‌তে পারিনে। কারণ যাদের আমরা নিবিড় ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনি তারা মহাজাতি হ'তে পার্‌বে।

সেই জান্‌বার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেল্‌বার শিখরে পৌঁছিবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র কর্‌বার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ শাস্ত্রী মশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষা-ধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'র্‌তে পার্‌লে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদার ভাবে সার্থক হ'তে পারে, তাঁর মুখে এ-কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম এই ঔদার্য্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য এইটিই হ'চ্চে যথার্থ ভারতীয়—সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতিবিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প ব'লে স্বীকার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন্ নাই। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘ'টে থাকে তবে জান্‌তে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানাজাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, এখানে কোনো এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তি-

নিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক্, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ ক'র্‌চে। কিন্তু আমার সাধ্য কী! সাধ্য থাক্‌লেও এ যদি আমার এক্‌লারই সৃষ্টি হয় তাহ'লে এর সার্থকতা কী! যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা ক'রে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেবো এই টুকু-মাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে এ-কে বহন ক'রে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে কর্‌তে আজ আমাদের সাম্‌নে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এলো। আজ আপনারা এই যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্ম্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ ক'র্‌লুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে সকলে এ-কে শ্রদ্ধা ক'রে গ্রহণ ক'র্‌বেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও এ-কে সম্পূর্ণ ভাবেই সকলের কাছে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন এটা একজন লোকের কীর্ত্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত ক'রে জড়িয়ে রেখেচেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত ক'রে পালন ক'রে এসেছি, তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় ক'রে থাকি সে আমার সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা ক'র্‌তে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেম্‌নি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় ক'র্‌বো না কেন? সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হ'য়ে ওঠে একথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখ্‌তে পাচ্চি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেচেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এতো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন কর্‌বার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুল্‌তে অবকাশ পাই নি, কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এতো কাল প্রত্যহ

পীড়িত হ'য়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা এ-কে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা ক'রে পালন কর্‌বার ভার নিয়েছেন,—এ-তে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি, সে জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'র্‌চি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ কর্‌বার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা ব'ল্‌তে পারিনে, শরীরের দুর্ব্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি এই অঙ্গ-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার ক'র্‌বে? সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ কিন্তু চিত্তের বিচরণ-ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহ-ব্যবস্থা অতি-জটিলতার দ্বারা চিত্ত-ব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়া-রূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয় কিন্তু এর চিত্ত-রূপটির প্রসার আমি বিশেষ ক'রেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ ক'রে থাকি। কতবার মনে হয়েছে যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্ত্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা-হলে জান্‌তে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা-হ'লে বিশেষ দেশ-কাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখ্‌তে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ, সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূসীমানার মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি ভারতের এমন কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবী সমস্ত বিশ্বের। জাত্যা-ভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত ক'রে নম্রভাবে সেই দাবী পূরণ কর্‌বার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হ'লো যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য্য ভারতবর্ষের আছে? ভারতের ঐশ্বর্য্য ব'ল্‌তে এই বুঝি যা কিছু তার নিজের

লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ কর্‌বার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ ক'র্‌তে পারে—অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়—তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষ ভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্য সামন্ত অর্থ সামর্থ্যে আর কারো ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমন সকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জ্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায়নি, রেখে যায়নি, তাদের অর্থ যতই থাক্ তাদের ঐশ্বর্য্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ঈজিপ্ট, গ্রীস, রোম, প্যালেষ্টাইন, চীন, প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ, শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছি? আমি আমার সাধ্য মতো কিছু বল্‌বার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গনে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান কর্‌তে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্ত্তি ধ'রে কিন্তু একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিলো ছোটো বিদ্যালয় রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টি ভিক্ষা আহরণ ক'র্‌ছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুল্‌তে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বল্‌চে, আমি এসেচি। তাকে যদি বলি, আমাদের নিজের দায় নিয়ে ব্যস্ত আছি তোমাকে দেবার কথা ভাব্‌তে পারিনে, তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

একথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই যে, বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্ব্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত

শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্ব্বকালীন, সর্ব্বজনীন। যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ ক'রে অক্ষয়ভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। এই হ'চ্চে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হ'তে পার্‌বে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদশালী ক'রে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্ব্বতা, তার বর্ব্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই,—পশুধর্ম্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা, বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে-পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্ব্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি ক'র্‌তে পারে।

পশ্চিম মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর ক'রে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখ্‌তে পাই তা-হ'লে দেখ্‌বো, আত্মম্ভরী পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ,—কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্ব্বভুক্ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি ক'র্‌চে; কেননা পলিটিক্সের শোনিতরক্ত উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো ক'রে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্ত্তিত ক'রে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল ক'র্‌বো যদি মনে করি সীমাবিহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যাভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হ'তে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন, যে রিপুর প্রবর্ত্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের

কি দেবার জিনিষ কিছু নেই ? আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্ব্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য্য নেই ? বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হ'য়ে ফির্‌লে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হ'তে পারে ? দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন ক'র্‌তে হবে না, এমন কথা আমি কখনই বলিনে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আমরা বাঁচতে পার্‌বো ?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন্ না, আমাদের মনে যে-উত্তর এসেছে, বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'তে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং।" যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাত্‌বো। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি, সে কাজ কি এখনি আরম্ভ হয়নি ? অন্যদেশ থেকে যে সকল মনীষী এখানে এসে পৌঁছেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেচেন। আমার সুহৃদ্বর্গ যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে, কিছু পরিবেষণ ক'র্‌চি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই ব'ল্‌চি কাজ আরম্ভ হ'য়েচে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌চে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্চি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্চে কিনা, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান বিভাগে কিছু কাজ হ'চ্চে, এ সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিষ ব'লে না মনে করি। এ সমস্ত আজ আছে কাল না থাক্‌তেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হ'য়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের ক্ষেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখী বাসা বাঁধ্‌তে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখীর বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্য প্রকৃতির যে সত্য পরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্ব্বেই বলেছি ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয়, সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'র্‌বো, এই হ'চ্চে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা ব'ল্‌তে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক গ্রহণ কর্‌বেন না, এমন কি, পরিহাস-রসিকেরা বিদ্রূপও ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়,—আসলে ভাব্‌নার কথাটা হ'চ্চে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধালাভ করে পাচ্ছে সেটাকে কেবলমাত্র অহঙ্কারের সামগ্রী ক'রে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহঙ্কারের বিষয় নয়। যখন অহঙ্কার করি তখন বাইরের লোকদের আরো বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের ব'লে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যে সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর ক'র্‌তে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো-আনা গ্রহণ করেছি কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করিনি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার ক'র্‌তে অক্ষম হ'য়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠি, এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে-পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন ক'রে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয়নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেচেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাক্‌বো, তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ ক'রে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক্‌, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদান প্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূর-প্রসারিত হোক্‌, এই আমার কামনা।

(শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুলিখিত)

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 899.]

[৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

শান্তিনিকেতন পত্র

চৈত্র, ১৩৩২

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা।]

[বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ | চৈত্র, সন ১৩৩২ সাল | ৩য় সংখ্যা

কুমিল্লার অভয়াশ্রমের বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন কর্ম্ম থেকে আমার ছুটি নেওয়া দরকার। কিন্তু ছুট নেওয়ার পূর্ব্বে কর্ম্ম সমাধা করে যাওয়া চাইত। সেই জন্ম আমি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আজ এই পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারে উপস্থিত। আমার বিশ্বাস, দেশের জন্ম যে কর্ম্ম করবার সঙ্কল্প আমার মনে মনে আছে তা বলে যাবার এটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। তার কারণ এই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা নিষ্ঠাবান্, দৃঢ়সঙ্কল্প, সরলচিত্ত। এরা বুদ্ধির অভিমানে বিদ্রূপের দ্বারা বড় কথাকে ছোট করে দেয় না। এই জন্ম পূর্ব্ববঙ্গ দেশের একটি বড় কর্ম্মস্থান বলে আমি বিশ্বাস করি। আজ এই যে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি এখানে কর্ম্মের একটি সত্য রূপ দেখতে পেয়েছি। একটি মহতী আশা এখানে অঙ্কুরিত হয়েছে।

আমাদের এই যে দেহ এর মধ্যে প্রাণশক্তি কতকগুলি ঐক্যের ক্ষেত্র স্থাপিত করেছে। যেমন হৃদয় দেহের একটি মর্ম্মস্থান; এখান থেকে দেহের সমস্ত অংশে প্রাণরস সঞ্চারিত হয়। দেহে এইরূপ মর্ম্মস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে তবে দেহ উৎকর্ষ লাভ করে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠানটি দেশের পক্ষে সেইরূপ একটি মর্ম্মস্থান। এখান থেকে পল্লীতে পল্লীতে প্রাণশক্তি বিস্তৃত হয়ে একটি সমাজদেহ রচনা করবে। এইটিই এর পরিপূর্ণ সার্থকতা। আমাদের প্রাণের স্বরাজ এই দেহ। প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি ঐক্যের জাল, প্রাণের তাপ সঞ্চারিত করে, তাতেই দেহের স্বরাজ রক্ষিত হয়।

তেমনি দেশের স্থানে স্থানে মর্ম্মস্থান সৃষ্ট হয়ে উঠলে, সেখান থেকে প্রাণধারা পল্লীতে পল্লীতে প্রবাহিত হবে, আবার পল্লীর প্রাণ ফিরে আসবে ঐক্য কেন্দ্রে; তা হলেই আমাদের দেশপ্রাণের স্বরাজ দেহবদ্ধ হবে। এখানে তারই একটি সূত্রপাত হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

অনেক কাল পূর্ব্বে একদিন বলেছিলাম আভ্যন্তরিক প্রাণময় চৈতন্যের ঐক্যেই দেশ এক হয়। কোনো বাহিরের প্রক্রিয়ায় নয়, দড়ির বন্ধনে নয়। সেদিন কবির কথাকে কাজের কথা বলে কেউ গ্রহণ করে নি। তারপর নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সেইরূপ কাজের প্রবর্ত্তনাও করেছিলাম। তাই যেখানেই দেখি কর্ম্মীরা প্রাণের ঐক্য দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে— কোনো বাহ্য আচারের প্রচারদ্বারায় নয়,— সেখানেই আনন্দিত হই। দেশের মধ্যে একটা হৃদয় আছে, দেশবাসীরা এটা যদি নানা রূপে অনুভব না করে তবে সমস্ত দেশের একটি অখণ্ড প্রাণময় সত্তার অস্তিত্ব তাদের কাছে বাস্তব হতে পারে না। প্রীতির দ্বারা, সেবা দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মীয়তা প্রসারিত করে তবে সেই হৃদয়কে সত্য করে তুলতে হয়। একদিন ছিল যখন পল্লীতে পল্লীতে সেই হৃদয় স্পন্দিত ছিল, যখন আত্মীয়তার যোগে পল্লী নিজেকে নিবিড়ভাবে এক বলে জানত। আজ সেই হৃদয়ের স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থান বিচ্ছিন্ন হয়েছে; তাই যত দুঃখ, তাই যত দুর্দ্দশা। আজ দেখতে পাচ্ছি এই অভয়াশ্রমে একটি হৃদয়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক জন ত্যাগী সন্ন্যাসী শুভক্ষণে এখানে মিলেছেন, তাঁরা আপন ধ্যানের মধ্যে বড় করে একটি এককে দেখতে পাচ্ছেন এবং আপন কর্ম্মের মধ্যে সত্য করে সেই একের সাধনা করছেন। এই বিরাট এককে অন্তরে ও বাহিরে, ভাবে ও রূপে, সঙ্কল্পে ও কাজে উপলব্ধি করাই আমাদের শাস্ত্রে বলে অমৃতকে লাভ করা। দেশ যখন আপনার মধ্যে সেই বড়কে সেই এককে দেখতে পায় না তখনি সে মৃত্যুকে পায়।

এই আশ্রমে অমৃত উৎসের সন্ধান চলেছে। এখানকার সাধকেরা জানুন যে, কোনো বাহ্য কর্ম্মে দেশের পরিত্রাণ নেই, পরিপূর্ণ জীবনের উদ্বোধনেই বিশ্লিষ্ট যা তা সংশ্লিষ্ট হয়, বিক্ষিপ্ত যা তা দেহবদ্ধ হয়। আমার শেষ কথা এই— আমি বাল্যকাল থেকে মনে সমগ্রতার রূপকে বরাবর পূজা করেছি। সত্যের আদর্শ পরিপূর্ণতার আদর্শ বিজয়ী লোকের স্বার্থ বুদ্ধি আংশিকতাকে বাহ্যিকতাকে আশ্রয় করে। সমগ্রতাকে দেখাই পরমার্থকে দেখা। মানুষের চৈতন্যকে বিরাটের মধ্যে প্রসারিত করাই মুক্তি। সঙ্কীর্ণ আচারে বদ্ধ যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্মই নয়। কারণ সে ধর্ম্মের মত বন্ধন বিভাগবুদ্ধিতেও আনে না।

আমাদের দেশে মানুষের চিত্তকে শতদল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে; সেই চিত্তকমল সে ছোট নয়, কলা-বিরল নয়, বহু কলা তার, অনেক পাপড়ি নিয়ে আন্তরিক প্রাণের প্রভাবে একবৃন্তে সে বিরাজিত। তার সেই বহু অংশকে সঙ্কীর্ণ করতে গেলে তার প্রাণের ঐক্যকেই পীড়িত করা হয়। যে একপ্রাণ আপনাকে স্বতই বহু বিচিত্রে বিকশিত করতে চায় তাকে যেন আমরা প্রণতিপূর্ব্বক

স্বীকার করি। সেই প্রাণশক্তিকে অবজ্ঞা করে' বিশেষ একটি সঙ্কীর্ণ যন্ত্র প্রক্রিয়াকে প্রধান করে তুললে কারখানাজাত পণ্য সামগ্রীর মত বিশেষ একটি পদার্থের প্রভূত আমদানী হতেও পারে। কিন্তু এই জড়ত্বের আর্থিক ফল আপাতত যাই হোক এর মত বন্ধন মানুষের আর কিছুই নেই। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বতোমুখী শক্তিকে উদ্বোধিত করতে হবে। এই আশ্রমে যদি পল্লীসমাজের প্রাণময় হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে এখান থেকে সেই সৃষ্টির তেজ চারদিকে সঞ্চারিত হোক যা নানরূপে বহু বর্ণে আপনাকে নিরন্তর সার্থক করে।

বারংবার এই কথাটি বলব যখন সমস্ত আত্মা জাগে, বিচিত্র শক্তি নিয়ে জাগে, তখনই মানুষ যথার্থ জাগে। "য একঃ", যিনি এক "বহুধাশক্তি যোগাৎ" যিনি বহুধারা প্রবাহিত শক্তি যোগে নানালোকের "নিহিতার্থো দধাতি" অন্তর্নিহিত নানা প্রয়োজন বিধান করেন তাঁকেই দেশের চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যে সব দেশে দেশাত্ম বোধের সাধনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেখানে দেখি জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানের, কর্ম্মতপস্বী কর্ম্মের, ভাবতপস্বী ভাবের রূপতপস্বী রূপের তপস্যা করছে। আমাদের দেশেও তপস্যা বিস্তৃত হউক, বহুধা হউক। সঙ্কীর্ণ সীমায় চৈতন্যকে বদ্ধ করলে সিদ্ধি হবে না। মানব ধর্ম্মের মধ্যে বৈচিত্র, বহুধা শক্তির স্থান আছে। একথা অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বের মূলে আঘাত করা হবে।

অভয়াশ্রম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যে কথা মনে এসেচে তা বল্‌তে হবে কিন্তু পাছে সেটা উপদেশের মত শুনতে হয় মনে সেই আশঙ্কা আছে। বাইরে থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে উপদেশ দিয়ে বিশেষ কিছু ফল হয় বলে আমি মনে করিনে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন যে তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ—তাঁর যে ক্রিয়া জ্ঞানক্রিয়া, বলক্রিয়া, তা স্বাভাবিক। তেমনি বিশুদ্ধ কর্ম্মী যিনি তিনি আপনার প্রকৃতিগত প্রবর্ত্তনা থেকেই কাজ করেন। এইজন্যে নিজের কর্ম্মে তাঁর আনন্দ আছে অহঙ্কার নেই। অহঙ্কারের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেকে নিজে ঘুষ দিই, বাহ্য ফললোভও ঘুষ। যাঁর কাজ স্বাভাবিকী শক্তিরই প্রকাশ, অন্তরে বাহিরে তাঁর কোনো ঘুষের প্রয়োজন নেই। ঘুষের তাগিদে যে কাজ চলে তাতে বিকার ঘটতে বাধ্য। কর্ম্মের পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতাকে যিনি নিজের প্রতিপত্তির চেয়ে বড় বলে জানেন তিনি এই বিকার সহ্য করতে পারেন না। পরের হিত করচি এই কল্পনায় আমরা যখন কাজ করি তখন সেই কাজের মাঝখানে অহং এসে পড়ে, কর্ম্মকে আবিল করে, যা বিষয় কর্ম্ম নয়,

যা বিশ্বকর্ম্ম অহমিকা তার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করে দেয়, সত্যের জায়গায় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রিয় লোক ব্যক্তিগত নিজেকেই বড় করে দেখাতে চায়। তখন সে নিজের কর্ত্তৃত্বের বিরোধীকে সত্যের বিরোধীর মতই দণ্ড দিতে চায়। তখন সে আপন সহায়দের অনুচর করবার চেষ্টা করে এবং যেখানে তার বাধা ঘটে সেখানে সহযোগী-দের সঙ্গে প্রতিযোগীর মত ব্যবহার করে। এমন অবস্থায় ভাল কর্ম্মও সত্যকে পীড়া দেয়। সব চেয়ে গুরুভার এই নিজের ভার। আমরা যখন কর্ম্মকে অহমিকা দ্বারা ভারাক্রান্ত করি তখনই যত বিরোধ যত বাধা।

গাছের প্রাণশক্তি পল্লবে ফুলে ফলে আপনার প্রাচুর্য্যে আপনার আনন্দে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্যে এই সৃষ্টির মধ্যে কেবল সৌন্দর্য্যের নয় কল্যাণেরও আবির্ভাব। ফল ফুলের মধ্যে আত্মত্যাগের দ্বারা বিশ্বের কাছে আত্মনিবেদন। তেমনি আমাদের কর্ম্মেও যেন প্রাণের পূর্ণতা নিজের অহৈতুক আনন্দে প্রকাশিত হয়। সেইপ্রকাশেই বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটে, তখন আমরা সৃষ্টির উৎসাহে কর্ম্ম করি, প্রেমের প্রাচুর্য্যে আত্মপ্রকাশ করি। দয়া করে পরের উপকার করছি কিনা সে কথা তখন ছোট হয়ে যায়, আড়ালে পড়ে। সাধারণতঃ আমরা সিদ্ধিলাভের চেষ্টায়, কর্ম্মের বাহ্যিক বাধা বিপত্তি দূর করবার জন্যেই প্রয়াস পেয়ে থাকি। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর সাধনা নিজের অন্তরের বাধাকে দূর করা, কর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে নিজেকেই আসন পেতে দেবার যে প্রবৃত্তি তাকে ভুলতে পারা। বড় কাজের কর্ম্মী যিনি তিনি আপনার চেয়ে আপন কর্ম্মকেই বড় করেন। আত্মা যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখন সে বিশ্বাত্মাকে প্রকাশ করে; প্রদীপ যেমন বিশ্বের জ্যোতি-কেই প্রকাশ করে, নিজেকে নয়, নিজের তৈল সঞ্চয়কে নয়।

আমরা অনেক সময় যখন ইচ্ছা করি না তখনো অগোচরে আমাদের অহমিকা সকল নৈবেদ্যে নিজের প্রধান ভাগ বসায়, সত্যের নামে নিজের নামটা চালিয়ে দিতে চায়।

ফুলের ভিতরকার কীটের মত এই প্রচ্ছন্ন অহমিকা সকল বড় কাজের প্রাণ ক্ষয়কর। কর্ম্মকে বাহ্যসিদ্ধির উপায় বলে না মনে করে যদি তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ বলে জানি তবেই এই রিপুটাকে দূর করবার জন্যে আমাদের চেষ্টা হয়, নইলে নিজেই এ'কে প্রশ্রয় দিই। আমাদের এই কামনা এই সাধনা হোক্, যে বিশুদ্ধ আনন্দ দ্বারা আমরা আত্মাকে মুক্ত করব। সেই কর্ম্মে স্বভাবতই সকলের কর্ম্ম করা হবে। দেশ যেখানে আত্মাকে প্রকাশ করতে পারছে না সেখানেই সে বন্দী। যাঁরা নিজেদের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছেন তাঁরাই দেশকে মুক্তি দিতে পারেন। বাহিরে সিদ্ধি না পেলেও যিনি অন্তরের মধ্যে মুক্তিকে পেয়েছেন তিনি সেই আনন্দে কর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। তিনি বুঝেন আপাত প্রতীয়মান সিদ্ধি আসল সিদ্ধি নয়। সত্য সাধনার মধ্যেই সিদ্ধি নিহিত আছে। অনেক সময় বাহির থেকে তা দেখা যায় না। অনেক সময় বাহ্যত তা পরাস্ত হতে পারে। বীজ মাটির মধ্যে দীর্ঘ-কাল প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা হয়ত মনে করি তার ধ্বংস হল, কিন্তু বৃষ্টি পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়। আমি পদার্থটি নগদ বিদায় না পেলে

খুসী হয় না। কিন্তু আত্মা আপনার সত্যে আপনি আনন্দিত। সত্যকে উপলব্ধি করেছি, নিজেরই মধ্যে অমৃতকে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এত হাজার লোক আমার দলে আছে, এমন কোন বাহিরের প্রমাণের তার প্রয়োজন নেই। কর্ম্মের মধ্যেও আত্মার সাধনা করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে বলাতে হবে এই নামরূপওয়ালা যে আমি এ সত্য নয়। আপনাকে এর থেকে তফাৎ করে দেখতে হবে—যেমন জগতের সব জিনিষকে বাইরে দেখছি। আমি পদার্থ বহির্ব্যাপারের অঙ্গ, বুদ্‌বুদের মত উৎপন্ন হয়ে আবার লীন হয়। আত্মার মধ্যে চিরজ্যোতিষ্ময় আনন্দরূপকে অত্যন্ত নিকট করে জানতে হবে। তা হলেই আমি আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়—যেমন করে সূর্য্যের আলোকে অন্ধকার যায়। আত্মাকে যাঁরা দেখেছেন সেই ঋষিরা বলেছেন—এষাস্য পরমা গতিঃ—ইনিই ইহার পরমা গতি। ইনি আর এই; আত্মায় পরমাত্মায় এতই কাছাকাছি। পরমাত্মার সঙ্গে এমনতর সম্বন্ধকে অনুভব করলে সব সহজ হয়ে ওঠে। ইনি আর এই—এর সম্বন্ধ তাঁদের ভালো করে বোঝা দরকার যাঁরা বিশ্বকর্ম্ম করবেন। বিষয়কর্ম্মে যাঁরা নিমগ্ন তাঁরা ঐ ইনিকে বাদ দিয়ে বসেন।

বিশ্বকর্ম্মের ব্রতী যাঁরা তাঁদের এই কথা বলতে হবে য আত্মদা বলদা, আত্মদানেই যাঁর সৃষ্টি, যিনি বলদা, আত্মদানেই যাঁর বল, আমার কর্ম্মে তাঁকেই উপলব্ধি করি। এই বলে' আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে জাগ্রত রাখলে কর্ম্ম করা সহজ হবে।

ভারতবর্ষের একটি স্বভাবসিদ্ধ শক্তি আছে যার দ্বারা সমস্ত বড় কাজকে সমাজের সহজ প্রাণক্রিয়ার অঙ্গ করে তুলতে সে পারে। তার শিক্ষাদীক্ষা আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সবই এই রকম সহজ। শান্তিনিকেতন থেকে কিছু দূরে কেঁদুলীতে বছর বছর জয়দেবের মেলা হয়। কবিকে স্মরণ করার এমন সহজ উপায় আর কোনো দেশে নেই। আমরা কোন মহৎ লোক মরলে তাকে কি করে স্মৃতিপথে রাখা যায় এইজন্য বক্তৃতা করি, চাঁদা তুলি। এসব আমরা পশ্চিমের কাছে শিখেছি। আমাদের দেশের যে প্রণালী তাতে প্রেসিডেণ্ট নেই, সেক্রেটারী নেই, ধনভাণ্ডার নেই। বৎসরের পর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এসে তাঁকে স্মরণ করছে, গান করছে, আনন্দ করছে। এই যে বৃহৎ আকারে লোক শিক্ষা এটা সমাজ শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এতে স্কুল নেই, ক্লাস নেই, কল যন্ত্র নেই। এই শিক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকমনকে যেমন উর্ব্বর করেছে, তেমন শিক্ষা আর কোন দেশে নেই। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ। ওদের slaves এর লোক একেবারে পশু প্রকৃতি। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের মধ্যেও একটা শিক্ষার ধারা বর্ষণ হয়েছে; তাতে তাদের চিত্তকে সফল, কোমল, সরস করেছে। আমাদের দেশের চাষারা সারাদিন চাষ করে ঘরে ফিরে এসে রাত ১১টা পর্য্যন্ত আঙিনায় কীর্ত্তন করছে এ আমি দেখেচি। অন্যদেশে এ সময়ে তারা মদের দোকানে যায়, উন্মত্ততার মধ্যে মুক্তিকে খোঁজে। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের উপর যে শিক্ষার ধারা বর্ষণ হয়েছে তাতে সহজেই তারা কর্ম্মের গ্লানি থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। আমাদের দেশে যে নিরক্ষর

সেও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। চাষীকেও যদি তত্ত্বকথা বলি তবে সে ধৈর্য্যের সঙ্গে শোনে। আমি এক জায়গায় দেখেছি চাষীরা রাত্‌দুপুর পর্য্যন্ত যোগিগানের পালা বসে বসে শুনেচে। তার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। মুসলমান চাষী প্রজাও রাত দুপুর পর্য্যন্ত সেই গান শুনলে। এই ধৈর্য্য, ভালো জিনিষ পাবার জন্যে এই রকম মনকে প্রস্তুত করা,—এ সহজ নয়। অন্য দেশে সাধারণ লোকের কাছে এই সব কথা বলতে গেলে লাঠিমেরে তাড়িয়ে দেবে। সমস্ত সমাজের স্বাভাবিক প্রাণক্রিয়া দ্বারা আমাদের দেশে এই শিক্ষা সহজ হয়েছিল।

যেমন সহস্র বৎসর ধরে এই শক্তি স্বাভাবিক প্রাণের ক্রিয়া দ্বারা গ্রামে অন্ন বিদ্যা ধর্ম্ম দিয়েছে তেমনি আজও করুক। সেই পদ্ধতিকে বাধামুক্ত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। আমাদের দেশে যাত্রা গান একটা স্বাভাবিক আনন্দের উপায়। য়ুরোপে সবই গুরুভার; Theatre, stage, piano এসব ভারি জিনিষ, যেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায় না। আমাদের সারেঙ্গী একতারা একেবারে লোকের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এই ভাববিহীন আত্মপ্রকাশকে প্রাণবান্ করে তুলতে হবে, আজকের এই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তার স্বাভাবিক আকারে বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন প্রাণে জাগ্রত করে তুলতে হবে এই কথা বলে আজকে আপনাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি।

অরুন্ধতী

একদিন ছিলে তুমি ধরণীর মেয়ে
সুখে দুঃখে সম্বৃত আমাদেরি মত
আজি স্তব্ধ নীলিমায় নিস্পলক চেয়ে
রহস্য-সুদূর লোকে আছ নিত্রানত।

তেমনি তেমনি তুমি ছিলে একদিন
নিঃশ্বাসদোদুল এই বক্ষের ছায়ায়
আজি তুমি স্বপ্নলোকে রয়েছ নিলীন
জোয়ারের ক্ষুব্ধগীতি পশেনা যেথায়।

শিয়রে প্রদীপ জ্বালি ধ্রুবতারকার
সপ্তর্ষির তপোবনে অয়ি অরুন্ধতি
কোনো কোলাহলে তন্দ্রা ভাঙেনাকো আর
কোনো দুঃখে আজি তব নাহি কোনো ক্ষতি।

এ পারেতে ছিলে তুমি আমারি পথিক
ওপারে তুমিই সখি ধ্যানের মাণিক।

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

২

তারপর একদিন মিঃ পিয়ার্সনের সহিত তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। সেদিন তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রটি আমার কাছে হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেদিনকার কথা আমি কখনও ভুলি নাই। পিয়ার্সন সাহেব তখন মহর্ষিদেবের ব্যাখ্যান হইতে কিয়দংশ ইংরাজি ভাষায় তর্জ্জমা করিতেছিলেন। সংস্কৃত একটি শ্লোক বুঝিতে না পারিয়া পূজনীয় বড়বাবু মহাশয়ের নিকটে তাহার অর্থ করিতে আসেন। ঐ শ্লোকটি ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনং॥" বড়বাবু মহাশয় গুরুগম্ভীর স্বরে যখন শ্লোকটি উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং মাথার চুল সমস্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল যেন উপনিষদের ঋষি আবার নূতন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। সেদিনকার সেই দৃশ্য ভুলিবার নয়। বুঝিলাম যে, সকলেই উপনিষদ্ পড়ে, কিন্তু এই সাধকটির জীবন উপনিষদের অমর বাণী দিয়া গঠিত। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া গেল। পূর্ব্বে কখনও এরূপভাবে উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করিতে শুনি নাই।

পাঠ শেষ হইলে সাহেবকে বলিলেন, "Mr. Pearson, the essence of the sloka, I mean, its spirit will be lost as soon as it is translated. Our rishis used words whose very sound would bring out their proper significance" অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিলে শ্লোকের আসল ভাবটি মারা পড়িবে। ঋষিরা এমন সব শব্দ ব্যবহার করিতেন, যাহাদের অর্থ উচ্চারণ করিবামাত্র স্পষ্ট হইয়া যায়। তারপর ঐ শ্লোকের ইংরাজিতে অনুবাদ ত করিলেন-ই তাহা ছাড়া উহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিতে গিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাহার কতক অংশ যাহা আমার লেখা আছে তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বলিলেন, যে, "সমস্ত উপনিষদের সার কথাটি এই শ্লোকের মধ্যে রহিয়াছে। সমস্তের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, but it is nothing like the christian idea of Pantheism. In Him we live and move, and have our being. We must be satisfied with whatever He gives, for He, like our mother knows our wants. The child does not dictate its mother to give it this or that. It simply cries and mother gives it. Foolish and ignorant people exploit others for their own self-aggrandisement. But you must not think that our Philosophy teaches us in action. For immediately after this sloka, the Rishi exhorts,

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ।' Do thou work, and wish to live hundred years. Our Philosophy is very practical, though it does not teach us to make aeroplanes (which many of our people think it does), but it does teach us to live our lives in doing good to others— সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ।"

এইরূপে সংক্ষেপে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথাটি বলিয়া দিলেন। Lowes Dickinson সেই সময় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সকল লেখকদের ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পিয়ার্সন সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "Our rishis tried to find out the inner spirit of things, and so they did not worry much for exact sciences. But they could find out many truths of Astronomy, such as চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি—the moving earth appears to be motionless—long before the modern astronomers. They concentrated their energy to gain something beyond which nothing more is to be gained—

যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

But I do not find fault with modern scientists. One is only the complement of the other. My objection against Western Science is that it is wrongly applied. The cure is worse than the disease." এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করিয়া তাঁর সরল স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্যে সেই সন্ধ্যাটি মুখরিত করিয়া দিলেন।

আমরা তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেবক মুনীশ্বর এক চিরকুট লইয়া পিয়ার্সন সাহেবের কাছে আসিল।

সেদিন Christian Pantheism সম্বন্ধে বেশ একটু কড়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমরা চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে হইল যে পিয়ার্সন সাহেব খৃষ্টান, তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলা ভাল হয় নাই। সাহেব তাঁহার কাছে নিজে গিয়া যখন বলিলেন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য তখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কখনো কাহাকেও দুঃখ দিতে পারিতেন না। একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, আর অন্য দিকে শিশুর মত সরলতা! কিন্তু যখন তখন তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হইত না। একদিন তিনি আমাকে নিজেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। Justice Woodroffe মহোদয়ের একখানি পত্র আসিয়াছিল—তাহা আমাকে পড়িতে দিলেন। উড্রফ সাহেবের হাতের লেখা একটু অস্পষ্ট তাই নিজেই সমস্ত পড়িতে না পারিয়া আমাকে ডাকিয়াছেন। তাঁহাকে যে জ্ঞানগর্ভ পত্রটি লিখিয়াছিলেন পরে তাহা প্রকাশ করিব।

উর্ব্বশী

৪

পরদিন প্রাতে চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া অনিরুদ্ধ নূতনভাবে বুঝিতে পারিল তাহার কি ক্ষতি হইয়াছে। একখানি চিত্র যে চিত্রকরের অর্দ্ধেক! রাত্রের অমৃত প্রলেপে যে কথাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল—দিনের তীব্র আলোক তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিল। সূর্য্যকিরণের সহস্র অঙ্গুলি ক্রমাগত চিত্রপটের সেই শূন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া যেন নিষ্ঠুরভাবে হাসিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ প্রথমটা আশ্চর্য্য হইল যে কেমন করিয়া সে এতবড় একটা ক্ষতির কথা এতক্ষণ ভুলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মন হইতে নৈশ স্বপ্ন কাটিয়া গিয়া রূঢ় বাস্তবের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রকাশিত হইতে লাগিল।

প্রথমেই মনে পড়িল চিত্রশালার সেই জনারণ্য, সবাই যেখানে তাহার পটের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে; তাহার ছবি যাহাদের ভাল লাগে তাহারা না কত উৎসাহেই আসিয়াছে কিন্তু যখন অনিরুদ্ধের ছবি তাহারা চিত্রাগারের কোথাও খুঁজিয়া না পাইবে—তখন তাহাদের না জানি কেমন অবস্থা হইবে! তাহার ভক্তদের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া অনিরুদ্ধের মন ভিজিয়া উঠিল!

তার পরে মনে পড়িল বিদিশারাজের মন্ত্রী মশায়ের কথা। তিনি বরাবর পুরন্দরকেই শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কারণ পুরন্দরের চিত্রকলা নয় তাহার রাজসম্মান। আজ যখন মন্ত্রীমশায় অনিরুদ্ধের ছবি দেখিতে না পাইয়া স্বভাবসিদ্ধ সন্দিগ্ধতার সহিত রাজচিত্রশালাধ্যক্ষকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন—তখন তাহার গুরু বর্ষীয়ান্ সেই ক্ষীণ শশাঙ্ককে কি উত্তর সে দিবে। ক্ষীণ শশাঙ্ক তাহাকে স্নেহ করেন এবং তাহার প্রতিভার পরিচয় জানেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন যে সে ছবি অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্য সকলে!

রাজচিত্রকর পুরন্দরই কি ভাবিবে। সে বিশেষ কিছু ভাবিবার অবসর পাইবে না—কারণ আর কেহ জানুক আর নাই জানুক অনিরুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ নাই—তাই যখন সে দেখিবে যে তাহার ছবি প্রদর্শনীতে আসে নাই—তখন সে অতি আনন্দে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে অনিরুদ্ধ চিত্রশালার খোলা জানলার কাছে বসিয়া পড়িল। দূরে যমুনার বালুচর—ঝাউঝাড়—ভাঙা পাড়—অস্পষ্ট বনরেখা—বিশ্বকর্ম্মার শিল্পাগারের অর্দ্ধসম্পূর্ণ একখানি জগতের ভগ্নাবশেষের মত লাগিতেছিল। শরত-প্রাতের শেফালি বাস মোদিত শীতলবাতাস আসিয়া তাহার কেশেবেশে মাতামাতি সুরু করিয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল দৃশ্যমান এই পৃথিবীর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই! তাহার মনে যে গভীর দুঃখ অভিমান তরঙ্গায়িত তাহার সহিত আজ প্রভাতের কোন যোগই সে দেখিতে পাইল না। আজ প্রভাতের বাতাস শীতল—শেফালি ফুলের গন্ধ মধুর—আকাশ মিলন-

পিয়াসী বন্ধুর চোখের মত কোমল; ধানের ক্ষেতের যে রং তাহাতে কোথাও কার্পণ্য নাই —যমুনার যে নীলিমা তাহাতো কোথাও ফিকা হয় নাই—দিক্‌রেখার যে কমনীয়তা তাহাতো একটুও কঠিন হয় নাই। তবে তাহার বেদনার অণুমাত্র ভার বহনের জন্য কেহই কি প্রীতিপূর্ণ বাহু প্রসারণ করিয়া দিবে না। এই সুন্দর শরত প্রভাতে হৃদয়ের গুরুভারাক্রান্ত হইয়া তাহাকে কি একলাই পলে পলে মরিতে হইবে। এত বড় জগতের মধ্যে কেহই কি তাহার সাহায্যে আসিবে না! কেহই না! অলকাও না! অলকার প্রসঙ্গ মনে হইতেই তাহার একটা কথা হঠাৎ মনে জাগিল! যদি অলকা আসিয়া দুষ্টুমি করিয়া তাহার ছবিখানি লইয়া গিয়া থাকে! এতক্ষণ দুঃখ পীড়নের পরে এই ছবিটি তাহার কাছে বড় মধুর লাগিল। অমনি দেখিতে দেখিতে বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে তাহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাইল! শরতের প্রভাতটি আগমনীর সহস্র সুরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনিরুদ্ধের মন আজ প্রভাতের আকাশের মতই দেখিতে দেখিতে নির্ম্মল হইয়া গেল! সে অলকার বাড়ী যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল!

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

১

আমি ভালবাসি, সখি শুষ্ক ফেনিলতা
মুক্ত কুন্তলের তব পড়ে যবে ঝরি।
তারো চেয়ে ভালবাসি তন্বী বেণীলতা
ফেনিলতা মহুয়ামদিরা তব গ্রীবাটি আবরি।
আমি ভালবাসি সখি আলস্য-রভসে
ভাবনা-মন্থর তব ভাবুক-চরণ—
তারো চেয়ে ভালবাসি অবকাশ-রসে
অসম্বৃত অঞ্চলের মত্ত বিচরণ।
আমি ভালবাসি সখি স্বপ্ন-লঘুরবে
শুক্তিশুভ্র হাসিটুকু অধরে তোমার
তারো চেয়ে ভালবাসি সেই হাস্য যবে
চকিত কাঠবিড়ালি ভয় পায় আর।
আমি ভালবাসি সখি তোমার ও তনু
তারো চেয়ে ভালবাসি যা তব অতনু।

২

সেই ভালো ছিল সখি—দুজনে যখন
আধেক সংশয়ে ছিনু আধো পরিচয়ে
ভুলেও তো কেহ কারো চাহি নাই মন
খেলা ভেবে দুইজনে ছিনু মত্ত হ'য়ে।
সেই ভালো ছিল সখি দুজনে তখন
দিয়েছি নিয়েছি ফুল কতনা সময়ে—
সে ফুলে কখনো মালা করিব রচন
এ কথা স্মরিয়া কত হেসেছি উভয়ে।
অচ্ছোদ নদীর নীরে উপল সমান
দুজনের মন আজি দুজনের চোখে—
অতি-পরিচয়ে আজি দুইটি পরাণ
বারে বারে কেঁদে ওঠে অতৃপ্তির ঝোঁকে
গোধূলি-গুণ্ঠন তলে প্রথম প্রদোষে
তাহারেই খুঁজি পুন যে আছিল ব'সে।

বৈশ্বানর

কিংশুক কোমল শিখা ওগো বৈশ্বানর
লহ নমস্কার
একাগ্র অঙ্গুলি তুলি তুমি নিরন্তর
কোথায় ইঙ্গিত কর ভাবে চরাচর
যেথায় রহিছ সেথা বহ্নি, মোর
বহু নমস্কার
অনির্ব্বাণজাতবেদা হে চিরভাস্বর
লহ নমস্কার।
তোমার বিমল দীপ্তি ওগো সর্ব্বভুক
লাগুক কপালে
তব দৃপ্ত তুলি হ'তে বাক্যহারা মূক
সুধাসঞ্জীবন রস গড় দুখ সুখ
মোর সর্ব্বদেহে মনে ঝরিয়া পড়ুক
সকালে বিকালে
তব শুভ্র জ্যোতিস্নানে মোর চক্ষু মুখ
নিত্যই রসালে।
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপানে কর খেয়া পার
বিবিধ বর্ণের
অশান্ত ধরণীতল চঞ্চল সংসার,—
প্রশান্ত অম্বরে তবু রাজ্য তারকার
এই নিত্য বাণী তুমি করিছ প্রচার
হে দূত স্বর্গের
তিমির বিদারী তীক্ষ্ণ অঙ্গে তব ধার
শাণিত খড়্গের।

আঁধারের যবনিকা কৌতুকী অঙ্গুলে
করি দিয় ফাঁক
ইন্ধন-আসন-স্তীর্ণ যজ্ঞবেদীমূলে
ক্লান্তি বন নিশীথের স্বপ্ন সুখ ভুলে
হে প্রাত প্রবুদ্ধ তব রক্ত আঁখি তুলে
যেই দাও ডাক
অমনি জাগিয়া উঠি কণ্ঠ দিয়া খুলে
বিশ্ব শতবাক্।
এত তাপ অন্তরেতে পীড়িত যে হিয়া
সবি কি নিষ্ফল ?
বেদনার অগ্নিগিরি মুহূর্ত্তে টুটিয়া
ইন্দ্রধনু সম ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বাসে উঠিয়া
দেবে না কি এই ব্যর্থ শূন্যে রাঙাইয়া
কল্পনার দল
মুক্তা ভ্রমে লইবে না কেহ কি তুলিয়া
মোর অশ্রুজল!
হে পাবক রাখিলাম এ দেহ আমার
যজ্ঞবেদী করি—
তোমার অমর্ত্ত্য শিখা পোড়াইয়া তার
অস্থি মাংস শোণিতের ইন্ধনের ভার
রাখুক স্বর্গের পানে শাশ্বত আকার
দীপশিখা ধরি—
সত্য যাহা ঊর্দ্ধে যাক্ ক্ষুধিত সংসার
নিম্নে থাক্ পড়ি।

ময়মনসিংহ—মন্দির

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের এ দিনে সকলের চেয়ে যে বাণী আকাশ বাতাস পূর্ণ করে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে হচ্ছে মুক্তির বাণী। আমাদের মানুষের ভিতরে মুক্তির যে ইচ্ছা তা চিরকালের, চিরদিনের। বাহিরের আবরণ মোচন করে মানুষ আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। মনের ভিতরে সে একটি একান্ত প্রেরণা অনুভব করে যাতে সে আপনার উপস্থিত অবস্থায় কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এ এক আশ্চর্য্য শক্তি মানুষের মধ্যে আছে, যাতে সে উপস্থিত যে অবস্থা দ্বারা বেষ্টিত তাকে সে বন্ধন বলে জ্ঞান করে। এই বন্ধন ছেদনের জন্যই, সমস্ত দেশের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, মানুষের নিত্য নিয়ত কর্ম্মচেষ্টা। মানবের ইতিহাস মুক্তির ইতিহাস।

বর্ব্বরতার বন্ধনের মধ্যে পূর্ণতার প্রত্যাশা যখন অভিভূত হ'য়ে ছিল, অজ্ঞানতা যখন তাকে বেষ্টন করে' ছিল তখনো মানুষের অন্ধ-সংস্কারের মধ্যে, অপরিণতির মধ্যে, অচৈতন্যের মধ্যে মুক্তির বাণী ছিল, মানুষ বলেছিল—"যা আছে তাই সত্য নয়, আরেকটি যথার্থ সত্য আছে, তাকে পেলেই আমাদের পরিত্রাণ হবে।" বর্ব্বরযুগের মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যার ব্যবহার, এ সমস্তই তখনকার অবস্থার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির প্রয়াস। মানুষের উৎকর্ষের পথ নানাপ্রকার জড় সংস্কার দ্বারা কণ্টকিত, একই চক্রে পুনরাবর্ত্তন ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না, অথচ মানুষের অন্তরাত্মা ভিতর থেকেই চলতে চাচ্ছে দূরের গম্যস্থানের দিকে। সেইখানে পৌঁছাবার চেষ্টা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে মানুষের আবরণ উন্মোচিত হয়, বর্ব্বরতা থেকে মানুষ সভ্যতায় উত্তীর্ণ হয়। এখনো মানুষের সে পথ-যাত্রা শেষ হয়নি, এখনো তার আবরণের সম্পূর্ণ মোচন হয়নি।

মানুষের এই যে একটি অন্তর্নিহিত চির-সংকল্প আছে, যে, সে আপনার বর্ত্তমান অবস্থাকে অতিক্রম করে যাবে, জীবনের গভীর অর্থ ক্রমশ সে উদ্‌ঘাটিত করবে তারই প্রবর্ত্তনায় মানুষ সাহস করে' অজানা পথে ধাবমান হয়, চিরপরিচিত পথকে বারবার সে পরিত্যাগ করে। মানুষের কোনো প্রাপ্তিই তার শেষ প্রাপ্তি নয় একথা কে তাকে বল্লে কে জানে। তাই ভারতবর্ষ বলেছে, ততঃ কিম্? দেশের সমস্ত শত্রু যদি বিনাশ হয়, ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, তাতেও শেষ হলোনা—সেই প্রতাপ, সেই ঐশ্বর্য্যবন্ধনেরও বাইরে মানুষের মুক্তি। এত বড় সাহসের কথা যে মানুষ বলতে পারে সে ধন্য। সে যে বলে, 'ভূমৈব সুখম্'—অসীমের মধ্যেই সুখ, তাই মানুষ ক্রমাগত নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছে। তার আর অন্ত নেই। এই বন্ধন-মোচনের মধ্যেই মানুষের যত রকমের গৌরব। মানুষ কি করে একথা বুঝলে? কি করে সে বুঝলে যে, বর্ত্তমান যে অবস্থা তার মধ্যে মুক্তি নেই, তাতে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না? তার কারণ সংসারের সঙ্কীর্ণ কাজের মধ্যেও

মানুষ ছোট ছোট আকারে মুক্তির পরিচয় পায়। মানুষ যেই আপনার স্বার্থের বাইরে গিয়েছে অমনি দেখেছে সেই ক্ষুদ্র পরিধির বাইরে বৃহৎ আনন্দের ক্ষেত্র।

কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা আসে কামনা থেকে, যেমন ক্ষুধা নিবারণের কামনায় মানুষ আহার খোঁজে, তৃষ্ণার জন্য জল, শীতগ্রীষ্মের জন্য বাসস্থানের আশ্রয়। নানাপ্রকার অন্বেষণের মূলে নানা-রকম বাসনা। অবিশ্রাম কর্ম্মের ধারাই আমাদের জীবন—আর কর্ম্মের চালকশক্তি কামনা। এই কামনার রূপ নিয়েই মানুষের যত তর্ক। কোন্ কামনা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হলে আমাদের কর্ম্ম সত্য হবে? মনুষ্যেতর জন্তুরা শরীর রক্ষার জন্য, শারীরিক প্রাণ বাঁচাবার জন্য নানা ক্ষুধার তাড়নায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই যে দৈহিক প্রাণের ক্ষেত্র, প্রকৃতির ক্ষেত্র, যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব জীবজন্তু, মনুষ্যও সেইখানেই জন্ম নিয়েছে, দেহধারণ করেছে—তার মধ্যে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি নানা রিপু। কিন্তু এই যে প্রকৃতি যা পশুদের চালিত করে তার দ্বারা চালিত হতে হতেই মানুষ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মানুষের সব চেয়ে আশ্চর্য্য আত্ম আবিষ্কার যখন প্রথমে সে বল্‌ল, সকল জীবের সঙ্গে আমাদের যেখানে সমান অধিকার সেখানে আমাদের গৌরব নেই, জীবনের সার্থকতা নেই। মানুষের সেটা খুব বড় দিন যেদিন সে বলেছে, সেই কামনার ভিতর থেকে মুক্তি চাই, পশুদের যে কামনা যা দৈহিক প্রাণের ক্ষেত্র বদ্ধ করে। তার আধ্যাত্মিক জীবন মুক্তি চায় পশুজীবনের আচরণ থেকে। কি করে তা হবে?

যেখানেই আমরা বড়কে পেয়েছি সেই খানেই স্বভাবতই ছোটর অবসান। বিজ্ঞানে যিনি যথার্থ জ্ঞানী, সে লোভ তাঁর নেই যা বিষয়ী লোকদের হাটে ঘাটে ঘুরিয়ে বেড়ায়। জ্ঞানের যিনি তপস্বী, তিনি অর্থের চেয়ে বড় সম্পদ পেয়েছেন বলেই দরিদ্র হয়েও আনন্দে থাকেন। সত্যকে বড় করে পেলেই মানুষের পশুধর্ম্ম পরাস্ত হয়। প্রেম হচ্চে কামনার উপরের জিনিষ, তা' সে জ্ঞানের প্রতিই হোক্, ভাবের প্রতিই হোক্ আর মানবের প্রতিই হোক্। প্রেমিক যখন প্রেমের আনন্দে পূর্ণ অভিষিক্ত হন তখন তাঁর অর্থের কামনা লঘু হয়ে যায়, সঞ্চয়ের মোহ থাকে না। কারণ প্রেমে আমরা অনন্তের স্বাদ পাই, কামনায় পাই খণ্ড পদার্থের। পশুধর্ম্ম বড়কে দেখ্‌তে দেয় না, কাজেই আমরা স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তখন আমাদের সকল টান নিজের দিকে বড়র যে রূপ তা দেখ্‌তে পেলেই ত্যাগ সহজ হয়। যে সমস্ত কামনার সামগ্রী মানুষকে কেবলমাত্র পশুধর্ম্ম পালন করায় তাদের ত্যাগ। এই কথাই বলেছেন উপনিষদ্—"সত্যম্ জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্-সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" সেই অনন্তস্বরূপ জ্ঞানময় সত্যকে যিনি দেখেছেন, আত্মার আকাশে যে জ্ঞানময় সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর সকল কামনা পরিতৃপ্ত হয় ব্রহ্মের সঙ্গে, বৃহতের সঙ্গে যোগে। ছোট সীমার মধ্যে যে কামনা, বড়র মধ্যে সেই কামনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। অনন্তের যোগে যুক্ত অবস্থায় সকল কামনা আধ্যাত্মিক জীবনেরই প্রেরণারূপে কাজ করতে থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রাণের

মূলশক্তি বাসনা, আধ্যাত্মিক প্রাণের মূলশক্তি সেই বাসনার বন্ধনমুক্ত বিশুদ্ধরূপ। ব্রহ্মের মধ্যে সকল কামনার যে পর্য্যাপ্তি তাতেই মুক্তি। উপদেষ্টারা বলেন, একে একে সব বাসনা ছিন্ন কর, শুষ্ক সন্ন্যাস গ্রহণ করে কৃচ্ছ্র সাধনা কর। কিন্তু এই নেতি-মূলক প্রক্রিয়ার আর অন্ত নেই। শিকড় কাটলেও যে আবার শিকড় গজাবে, নতুন পাতা বেরুবে। পূর্ণতার পরিচয় পেলেই সকল বাসনার রূপান্তর ঘটে। তখন আনন্দই সমস্ত কামনাকে আপনার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, বাহিরে থেকে তাদের মারতে হয় না। এরি বিভিন্নরূপ আমরা দেখ্‌তে পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেশের মুক্তির অর্থ কি? আপনার গৃহস্থালীর মধ্যে বদ্ধ না থেকে, নিজের গৃহকে অতিক্রম করে দেশকে যতটুকু আমরা দেখ্‌তে পারি ততটুকুই আমরা ব্রহ্মকে পেলুম। দেশের মধ্যে যদি এই পাওয়াটা সত্য হয় তাহলে আমাদের ত্যাগটাও সত্য না হয়ে থাকতে পারে না। মানুষের মধ্যে যখন অসীমকে আমরা দেখতে পাই তখনই বলি, ছোট 'আমি'কে আর চাইনে। এম্নি করেই মুক্তিকে পাওয়া যায় নানা ভাবে, নানা কর্ম্মে; গুহাগহ্বরে মুক্তি নেই, অরণ্যের নির্জ্জনতায় মুক্তি নেই। যেখানেই কোনো বড় সত্যকে মানুষ যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে সেখানেই তার মুক্তির তপোবন। যেখানে পরের জন্য মানুষ ত্যাগ করে সেখানেই পরের মধ্যে সে আপন গণ্ডীকে ছাড়িয়ে গিয়ে বড় হয়। যখন আমরা ছোটর সীমা পেরিয়ে বড়র বেদীর সামে যাই, সেখানে মানুষ বলে "ছোটকে ধিক্"। এইভাবে কত সত্যে কত কর্ম্মে মানুষের কত কীর্ত্তির প্রকাশ হয়েছে। সব দেশের ইতিহাসই ব্রহ্মের অন্বেষণের ইতিহাস—দেশপ্রেমের মধ্যে, সমস্ত পরম প্রীতির মধ্যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে বৃহতের সন্ধান—এরই ইতিহাস। এইভাবেই মানুষ বড় হয়। জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের তপস্বীরা শুধু ধর্ম্মমন্দিরে নয়, নানা মন্দিরে, নানা বেদীতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। এম্নিভাবে মুক্তির থেকে মুক্তির দিকে মানুষকে এগিয়ে দিয়েছেন।

উপনিষদ্ বলেছেন—সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। মানুষ অন্তরাত্মার মধ্যে এই বাণী শুনেছে। তার প্রথম কামনা ছিল সে খাবে, আর আজ সে বলছে "ভূমৈব সুখং"। এইজন্য দেশকে ডেকে বলি—তুমি যে মনে করছ, ছোট গণ্ডীর মধ্যে কামনা সংহত করে' তুমি সার্থকতা পাবে, তা কখনই নয়। আজকে দিন এসেছে, সমস্ত বিশ্বের রূপ দেখা দিয়েছে; আলো এসেছে, পাখী গান গেয়েছে। এখনই বল্‌তে হবে 'ভূমৈব সুখম্'—সমস্ত মানুষের মধ্যে মানুষের ব্রহ্মকে বৃহৎকে বরণ করে নিতে হবে। নিজের মধ্যে সমস্ত চিত্তকে আবদ্ধ করলে আমরা নিজকেই হারাব।

পৃথিবীতে কত ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্মের নব নব গণ্ডী এঁকেছে। আচার বিচারের শক্ত ছাঁচ তৈরি করে দিয়েছে। ভারতের উপনিষদ ধর্ম্মকে বাঁধেনি। তাই সকল ধর্ম্মই তার মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজে পেতে পারে। বড়র মধ্যে সবাই ঐক্য পায়, ছোটর মধ্যে পদে পদে বিরোধ। জ্ঞানময় অনন্ত সত্য আত্মার পরমাকাশে নিহিত হয়ে আছেন—একথা বলতে কোন সম্প্রদায়ের বাধা নেই, কোন বিধি, অনুষ্ঠান,

মন্দিরের দরকার নেই। ভারতবর্ষ বলেছেন, "সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি অসীম আকাশে তিনি সমস্তকেই অনুভব করেন, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি গভীর আত্মার মধ্যে তিনি সমস্তকে অনুভব করেন।"

চৈতন্যময় অসীম সত্যের এই যে বন্ধনহীন অনুভূতি এ কেবল আমাদের ব্যক্তিগত আত্মার সাধনা নয় এ আমাদের দেশাত্মারও সাধনা। ভেদবুদ্ধির বিরোধবুদ্ধি আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে' আমাদের দেশকে এই সাধনা থেকে, আপন আত্মস্বরূপের সত্য অনুভূতি থেকে বঞ্চিত না করুক। বর্ত্তমান কালের সঙ্গে ভাবীকালের যোগ, সমস্ত দেশের সঙ্গে নিজের দেশের যোগ—এই যোগের মধ্যে নিজের দেশকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার সাধনা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

তিনি এক, সর্ব্বজাতির মধ্যে তিনি এক, তাঁর সত্যের মধ্যে বর্ণভেদ নাই, সকল জাতিরই নিগূঢ় প্রয়োজন সকল তিনি প্রতিনিয়ত বিধান করছেন। সেই দীপ্যমান দেবতা যিনি সকল কালের আদিতে রয়েছেন, অন্তেও রয়েছেন, তিনি সকলের সঙ্গে শুভ বুদ্ধি দ্বারা আমাদের যুক্ত করুন। এই শুভবুদ্ধির প্রার্থনা সেই ঐক্যবুদ্ধির প্রার্থনা যা কোনো আর্থিক প্রয়োজনের উপর আশ্রিত নয় যা পারমার্থিক সত্যের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য্য ফরমিকির বিদায় সভা

গত ৩রা মার্চ আচার্য্য ফরমিকির বিদায় উপলক্ষে উত্তরায়ণে সন্ধ্যার সময় একটা সভা হয়। সভাটী কলাভবনের ছাত্ররা সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হলে শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী ও আয়েঙ্গার একটী বৈদিক শ্লোক পাঠ করেন। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত বক্তৃতায় আচার্য্যকে অভিনন্দিত করেন। তিনি আচার্য্যকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে পাদ্যার্ঘ প্রদান করেন। তাঁর সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ হলে পর পূজনীয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় একটা ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক বকিল যে অভিনন্দনটী লেখেন অধ্যাপক আরিয়াম উইলিয়মস্ সেটী পাঠ করেন। সেই অভিনন্দনটী পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। এর পরে বিদ্যাভবনের ছাত্র শ্রীমান্ গোখলে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পক্ষ হতে আর একটা অভিনন্দন পাঠ করেন। পরিশেষে আচার্য্য ফরমিকি উত্তরে বলেন যে প্রথম যেদিন তিনি এখানে আসেন, সেদিন তিনি অভিনন্দনের উত্তরে সকলকে বন্ধু বলে

সম্ভাষণ করেছিলেন, কিন্তু আজ তিনি সকলকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন। তিনি যখন প্রথম সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন, সে সময় অনেকে তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু এইটাই তাঁর পক্ষে খুব গৌরবের যে তিনি ইটালীতে সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা সুরু করাতে পেরেছেন। আজ তিনি যে সম্মান লাভ করলেন, তিনি জীবনে তা কখনও ভুলবেন না। আজকার দিন তাঁর জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করেন। তাঁর সকলের চেয়ে দুঃখ এই যে তাঁর জীবনের এই সাফল্যের দিনে তাঁর মা জীবিত নেই, তিনি আজ জীবিত থাকলে খুব খুসী হতেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে যদিও তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাচ্ছেন, তবু তাঁর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক টুচি এখানে থাকছেন। অধ্যাপক টুচি সাহেবের থাকাতে তাঁর এখানে থাকা হবে।

এই উৎসব উপলক্ষে যাঁরা গান করেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও সঙ্গীত-ভবনের ছাত্রছাত্রীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাঁওতাল গ্রাম

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল।

১

সকাল-বেলার সূর্য্যালোক। বাঁকা পথ—
রাঙা-মৃত্তিকার দীর্ঘ লীলা-বাহু পাশ
ক্রমে ক্রমে হারাইয়া, পড়ে চিত্রবৎ
চাল-কল-কালিমায়—ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
হাসিমুখে গ্রামালোক সেই পথে ধায়,
ভেজ-বাজি ভোজ যা দেয় কল-অসুর
তারি তরে, ভারে ভারে, রাশি রাশি, হায়,
ধরণীর স্বর্ণ-মুদ্রা করে চুর চুর।
বেলা পড়ে আসে। গ্রামখানি চারিধার
নিস্তব্ধ নির্জ্জন। শুধু শূণ্য আঙিনায়
বুভুক্ষু শৃগাল সম মধ্যাহ্নের বায়
ঘুরিয়া বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে দ্বারে দ্বার।
কোন মাতৃ-হৃদয়ের নীরব ক্রন্দন
অভিষিক্ত করে অর্দ্ধ-মরা এ জীবন॥

১২ই ফাল্গুন, ১৩৩২।

২

অস্ত-যাওয়া রবি নির্জ্জন গ্রামের মাঠে
আসি নামে, যায় ধরণীর বুকে মরি
চাষাদের রাখি তপ্ত মাটির ললাটে
তার চুম্বন আশিষ। সন্ধ্যারাণী পরি
কপোত-ধূসর বাস গোধূলি ধূলির
টানি ঘোমটা তারায় খচিত, সন্তর্পণে
আসে মঙ্গল-চরণা, সুস্মিতা সুধীর,
সুপ্ত গ্রাম দেয় ভরি নবীন জীবনে।
আনে রুদ্ধ দ্বারে শিশু-হাসির রতন
বধূ-মুখ-জ্যোতি সন্ধ্যা-দীপের মতন
কত স্নেহরাশি আনে কত গল্প-গান
আনে আমার প্রিয়ারে শ্রেষ্ঠতম দান—
লোক-প্রীতি-হর্ষ-সুধা, দুরু দুরু বুক
নেহারি এ দিনে-হারা ফিরে-আসা সুখ

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের কথা বল্‌তে হলে আগে সেই সব মনীষীদের কথা বলা দরকার যাদের চেষ্টায় আজ ভারতীয় শিল্পের গৌরবের কথা সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রথমেই মেজর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের কথা বল্‌তে হয়, কারণ তিনিই সকলের আগে ভারতীয় শিল্পের গৌরব স্তম্ভ খুঁজে বার করেন। মধ্যভারতে অনেকদিন থেকে ভরহুত ও সাঁচির স্তূপ পড়ে ছিল, কিন্তু কোন শিল্পরসিকই সে সকলের কোন সন্ধান নেন নি, যতদিন না তিনি সেগুলি আবিষ্কার করলেন। এ ছাড়া তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যে সব নানা মূর্ত্তি ও মন্দির আবিষ্কার করলেন তার কথা আমরা তাঁর রিপোর্টে পাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার মন্দির ও শিল্পকলার কথা এবং বৌদ্ধগয়ার শিল্পের কথা সকলের কাছে জানিয়ে দিলেন। ফাগু´সন সাহেব ও ভারতীয় স্থাপত্যের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় শিল্পকলার অনেক গৌরবের জিনিষ মানুষের অত্যাচারে নষ্ট হচ্ছিল। সেজন্য লর্ড কর্জন পুরাণ মন্দির ও মূর্ত্তির রক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। শেষে যখন অজন্তার গুহা পুনরায় লোক চক্ষুর গোচরে এল এবং সেখানে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া গেল, তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে ভারতেও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রকলা দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভারতীয় শিল্প কত দূর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

কিন্তু তখনও কেহ কল্পনা করেন নি, যে সেই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে আবার বর্ত্তমান ভারতে একটী আন্দোলন চলতে পারে। এতদিন ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার পরিচয় নিতে ব্যস্ত ছিলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনায় সুবিধা হবে বলে। প্রথমে কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন সুরু করলেন। শুধু যে ভারতের শিল্প নিচয় ভারতের সভ্যতার ইতিহাস সংগ্রহ করবে তা নয়, তাদের মধ্যে যে প্রভাব আছে তা আধুনিক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। যখন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন মোগল পদ্ধতি অনুসারে আঁকা কতকগুলি ভারতীয় ছবি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি সেই সব ছবি কলিকাতা আর্ট গ্যালারীতে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন আর তাঁর ছাত্রদের সেই সব ছবি থেকে অনুপ্রেরণা নিতে বললেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রথমে পাশ্চাত্য প্রথামতে ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁর দৃষ্টি অজন্তার ছবি ও তার অঙ্কন পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি ভাবলেন যে আজকালকার ভারতীয় চিত্রকরদের উচিত বিদেশী চিত্রকরদের অনুকরণ না করে প্রাচীন শিল্পীদের প্রথা অনুসরণ করা, কারণ প্রাচীন শিল্পের

মধ্যেই ভারতের নিজস্ব সাধনার জিনিষ রয়েছে। এই সময় থেকেই আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ছবি আঁকতে সুরু করলেন। এই রকমে তিনি এক নতুন দল গঠন করতে লাগ্‌লেন। সেই দলকে এখন ভারতীয় চিত্রের দল বলা হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় অনেক গণ্যমান্য দেশী ও বিদেশী ভদ্রমহোদয় এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা ১৯০৭ অব্দে মার্চ্চ মাসে একটী সমিতি গঠন করলেন, সেটীর নাম— Indian Society of Oriental Art. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি যাতে সাধারণের উৎসাহ জাগে ও যাতে সাধারণে ভারতীয় শিল্পের মূলকথা বুঝতে পারে তারই চেষ্টা করা। এই সমিতির আরও উদ্দেশ্য যে যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করা। সুখের বিষয় যে এই সমিতি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং এর কাজ খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে করছে। বিচারপতি উড্রফ যখন এই সমিতির সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই সমিতি দ্বারা সাধারণের মধ্যে যখন জাতীয়তার ভাব সম্পূর্ণ জাগরিত হবে তখনই ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ আরম্ভ হবে।

যে সকল উপায়ে এই সমিতি ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ভুদয়ের চেষ্টা করছে, তার মধ্যে একটী হচ্ছে প্রতি বৎসর চিত্রপ্রদর্শনী করা। ১৯০৮ অব্দ থেকে প্রায় প্রতি বৎসর সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। সেই সব চিত্র প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের ছবি সাধারণের কাছে প্রদর্শিত হয়। আর এক উপায়ে সমিতি এই আন্দোলনকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন, সেটী হচ্ছে—যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে বিচারপতি উড্রফ ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটী বৃত্তি দেন। তার মধ্যে একটী বৃত্তি দেওয়া হয় প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুকেও অপরটী ৺ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে। এই রকমে ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলন সুরু হয়। সেই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত হলেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এখন অনেকেই সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, নিজের শিল্পকলার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন তিনি বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ। তিনি গুরুর কাছে যে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন, সেই শিক্ষা তাঁর নিজের সাধনাবলে আরও বিস্তৃত করে নিয়তই তাঁর নতুন নতুন ছবিতে নিজের সাধনার পরিচয় দিচ্ছেন। অবনীন্দ্রনাথের অপর ছাত্র শ্রীঅসিতকুমার হালদার এখন লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনিও তাঁর শিল্পপরিচয় তাঁর ছবিতে দিচ্ছেন। এ ছাড়া, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ মজুমদার, চারু রায় সাধারণের কাছে সুপরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের ছবির দ্বারা সাধারণের কাছে ভারত শিল্পের কথা জানাচ্ছেন তা নয়, তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, লেখার দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা এই আন্দোলনের কথা সকলকে জানাচ্ছেন। ভারতশিল্প সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাংলায় তাঁর লেখার কথা অনেকেই জানেন। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাজকে স্বীকার করেন নি। কিন্তু পরলোকগত স্যর আশুতোষের ভারত শিল্প সম্বন্ধে যে গভীর দরদ ছিল, তার পরিচয়

আমরা পেলাম যখন তিনি ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তা অনেককাল শিল্পরসিকদের রস জোগান দেবে। প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই এই বক্তৃতাগুলি পাঠ করা দরকার। কিছুকাল সরকার থেকেও এই সমিতিকে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের চিত্রকলা এদেশে ও বিদেশে সুপরিচিত করবার জন্য শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় অনেক কাজ করেছেন। তিনি তাঁর "রূপম্" নামে কাগজে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রকলা সম্বন্ধে যে সব মনোজ্ঞ বই প্রকাশ করছেন সেগুলিও তাঁর ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহের পরিচয় দেয়। ডাক্তার কুমারস্বামীও আমেরিকায় অনেক কাজ করছেন। তাঁর রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে বই তাঁর প্রকৃত কীর্ত্তিস্তম্ভ। এ প্রসঙ্গে পাটনার ব্যারিষ্টার মাসুক সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় চিত্রের সংগ্রহ তাঁর অপূর্ব্ব। ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সংগ্রহ আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। কলিকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠানটী এই রকমে গড়ে উঠ্‌ল, তার প্রভাব ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে "অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা" একই উদ্দেশ্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে এক নতুন আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়েছে। জয়পুরে কলাভবনের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। ভারতের নানাস্থানে মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর ও অপরাপর সহরে চিত্র প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে। এ সবই ভারতে শিল্পকলার নবজাগরণের চিহ্ন।

আশ্রম সংবাদ

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী আশ্রমের ছাত্রী শ্রীমতী রেবা মহলানবিশের শুভবিবাহ শ্রীমান্ সুশোভনচন্দ্র সরকারের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

গত ১লা মার্চ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার সেনের শুভবিবাহ শ্রীমতী সুরেখা নন্দীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১০ই মার্চ আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অমিতার শুভউদ্বাহ শ্রীমান্ অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৪ঠা মার্চ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ

রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী সুস্মিতার শুভপরিণয় হইয়াছে।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহকারী শ্রীঅনিলকুমার মিত্র মহাশয় সম্প্রতি আশ্রম ত্যাগ করিয়া দিল্লী গিয়াছেন।

এবার আশ্রম হইতে শ্রীমতী রেখা মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষা দিতেছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ছাত্রগণ আশ্রম-সম্মিলনীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহারেন্দ্রনাথ মল্লিক—সম্পাদক।

শ্রীঅরুণকান্তি বসু—সহকারী।

শ্রীদীপ্তকুমার রায়
শ্রীউষারঞ্জন ঘোষ
শ্রীকুমুদনাথ মজুমদার
শ্রীভোগীলাল বৈদ্য
শ্রীসলিলচন্দ্র মজুমদার
শ্রীযশোবন্ত ডুর্দলকর
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
} প্রতিনিধিগণ,

ছেলেদের সাহিত্য সভাগুলি নিয়মিতভাবে ও সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। এই সব সভায় ইহারা মাঝে মাঝে বাংলা, ইংরাজী অভিনয় করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলম্বস নামে ছোট একটি ইংরাজী নাট্য ছেলেরা করিয়াছিল।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের উৎসাহে কলিকাতাস্থ প্রাক্তনবৃন্দ মাঝে মাঝে পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে একত্র মিলিত হইয়া সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন।

আচার্য্য ফর্ম্মিকির শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর ছাত্ররা মুদ্রারাক্ষসের কয়েকটি অঙ্কের অভিনয় করিয়াছিলেন।

আচার্য্য মহাশয়ের বিদায় সভায় পঠিত দুইখানি অভিনন্দন পত্র গতবারের পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। আগামী সংখ্যায় বাকি দুইখানা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় (পণ্ডিতজী) প্রণীত "রাগশ্রেণী" নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। পুস্তকখানি বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত, ইহাতে রাগরাগিণী সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য এবং সহজবোধ্য গৎসমূহ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে পুস্তকখানিতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

পূরবী

নূতন কবিতার বই। "পূরবী", "পথিক" ও "সঞ্চিতা" এই তিন ভাগে মোট ৮৮টি কবিতা আছে। "পথিক" অংশের ৬১টি কবিতা ১৩৩১ সালে কবির বিদেশ ভ্রমণের সময় লেখা।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। উপহার দিবার উপযোগী। ডিমাই ৮ পেজি, ২৫৪ পৃষ্ঠা।

মূল্য—২৲ বাঁধাই—২।৹

এণ্টিক কাগজ—২৸৹ ও ৩।৹

গীতি-চর্চ্চা

সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত নূতন গানের বই। শান্তি-নিকেতন আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে ও অনুষ্ঠানাদিতে যে সকল গান গাওয়া হয়, সেই সব সংগ্রহ করিয়া ২০০ গান দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটি গান এবং বেদগানও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৬০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ৸৹ ও ১৲ টাকা।

সঙ্কলন

কাব্য গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করা "চয়নিকা" অনেক দিন বাহির হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোন বই এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। এইবার গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করা হইল। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। পূর্ব্বে কোন বইতে প্রকাশিত হয় নাই এমন লেখাও আছে।

ডবল ক্রাউন প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ১৸৶৹ ও ২।৹।

মায়ার খেলা

নূতন স্বরলিপির বই। মোট ৬১টি গানের স্বরলিপি আছে।

মূল্য—২৲ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

রাজর্ষি

নূতন বিশ্বভারতী সংস্করণ

"বালক" পত্রিকার প্রথম ছাপা ও পুরাতন সংস্করণগুলি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে, বিস্তারিত পাঠ পরিচয় সহিত প্রকাশিত হইল।

মূল্য—১৲ ; বাঁধাই—১।০

TALKS IN CHINA

A collection of lectures delivered in China, during the Far Eastern Tour of the Poet in April and May, 1924.

Demy 8vo, 157 pages, on Antique paper.

Price—Re 1 8

TALKS IN JAPAN

Will be out shortly.

প্রবাহিনী

নূতন গানের বই। "গীতগান," "প্রত্যাশা," "পূজা," "অবসান," "বিবিধ" ও "ঋতুচক্র" এই ছয় ভাগে বিভক্ত। মোট ২৩৫টি গান আছে।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মনোরম ছাপা। উপহারের বিশেষ উপযোগী। ডিমাই আট পেজি, ১৮০ পৃষ্ঠা।

মূল্য—১॥০ ; বাঁধাই—২৲

মোটা এণ্টিক কাগজে—২৲ ও ২॥০।

গৃহপ্রবেশ

নূতন নাটক। মাসি গল্পটি অবলম্বনে লেখা। মূল্য ॥৵০।

"গীতাঞ্জলি," "কথা ও কাহিনী," ও "শিশু"র নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 899.] [৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

শান্তিনিকেতন পত্র

বৈশাখ, ১৩৩৩

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা।] [বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ | বৈশাখ, সন ১৩৩৩ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

নববর্ষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

হে চির নূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভ'রি দেয় মন
তোমার হাতের দানে॥
এ শুভ লগনে জাগুক গগনে অমৃত বায়ু,
আনুক জীবনে নব জনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু, যাহা আছে ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন,
ধুয়ে যাক্ যত পুরাণো মলিন
নব আলোকের স্নানে॥

২

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনারি আবরণ?
খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন।
মুক্তি আজিকে নাই কোন ধারে,
আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষ নিঃশ্বাসে তাই ভ'রে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ॥
ঠেলে দে আড়াল, ঘুচিবে আঁধার,
আপনারে ফেল দূরে।
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।

শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশী,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি,
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন ॥

৩

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে,
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে ॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভুলে
গোপন শ্যামল প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ॥

৪

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে ;
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে ॥
যাঁহার হাতের বিজয় মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ॥
কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি।
ডাক এলো তার তরঙ্গেরি
বক্ষে বাজে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে ॥

মানব সভ্যতায় হাতের কাজ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

বর্ত্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে এই হাতের কাজের বিস্তার ও ইহার অভাবের পরিণাম কোন্‌দেশে কি ভাবে দাঁড়াইতেছে তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে এই হাতের কাজের ধারা জাতিগতভাবে এতকাল চলিয়া আসিতেছিল। কাঠের কারিকর সূত্রধর, লোহার কারিকর কর্ম্মকার, সোনার কারিকর স্বর্ণকার, রূপার কারিকর রৌপ্যকার, মাটির কারিকর কুম্ভকার এইভাবে প্রত্যেক কাজই জাতিগত। এই পুরুষানুক্রমিক কাজের চর্চ্চার সুফল, কুফল দুই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। সুফলটুকু এই যে—উক্ত জাত সকলের বর্ত্তমানতার সঙ্গে এই সকল কাজের পূর্ব্ব গৌরবময় ইতিহাসের সূক্ষ্ম সূত্র পাওয়া যায়। সার্ব্বজনীনতায় গুণের স্থান নাই। সেজন্য কুফলের পরিণতি ভয়াবহ-রূপে প্রকাশমান। খাঁচার পাখী যদি বলে, আমি খাঁচাতে বেশ আছি, আমাকে আর কষ্ট করিয়া উড়িতে হয় না, পরিশ্রম করিয়া খাবার সংগ্রহ করিতে হয় না তাহা হইলে মুক্ত ও বৃহত্তর পক্ষীসমাজে তাহার স্থানচ্যুতি ঘটে—শুধু স্থানচ্যুতি নহে,—নিজের নিশ্চেষ্টতার

দোষে অপরের হাতে আহার্য্য না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সেইরূপ এই জাতিগতভাবে বদ্ধকাজের প্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল যে মৃত্যু তাহা উক্ত কার্য্যগত জাতিদের কাজের পশ্চাতে সচল ও স্বাভাবিক জ্ঞানের অল্পতা বা অভাবে ঘটিয়াছে। প্রাণের পরিচয় নূতন উদ্ভাবনীতে, যখন যে সমাজে এই উদ্ভাবনীর ক্রিয়া লোপ পায় তখনই বুঝিতে হইবে তাহার প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দনের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কাজকে জাতিগত করায় আমাদের দেশে বিদ্যালয় গড়িয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। সেইজন্য কৃতকার্য্যের চিহ্ন ব্যতীত সেই সকল কাজের সচল নিয়ম পদ্ধতি সর্ব্ব সাধারণের জন্য বিধিবদ্ধ নাই। এই হাতের কাজে কাঠের কাজের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাঠের কাজ সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোন কথার পুনরুল্লেখ করিব—এই (কাঠের) কাজের ক্ষেত্রকে জাতিগতভাবে গণ্ডীবদ্ধ করার কুফল স্বরূপ—অল্পসংখ্যক বড় বড় নগরীর ব্যবসায়ীর কথা ছাড়িয়া দেখিলে দেখা যায় যে—নূতন উদ্ভাবনী এদেশের তথাকথিত ছুতারদের মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য এই কথাটি সকল হাতের কাজের সম্বন্ধেই মোটামুটি বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের চোখ আজকাল হাতের কাজের দিকে যাইতেছে, সেজন্য শিক্ষালয় গড়িয়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছে। কিন্তু শুধু অভাবের তাড়নায়ই এই সকল কাজ গ্রহণ করা হইতেছে—পশ্চাতে অন্তরের সম্মতির সম্পূর্ণ অভাব; সেজন্য এদেশে ইহার ভাবী ফলের সম্বন্ধে আশঙ্কা হয়—কি জানি পশ্চাতে মাথা হাতের কাজের এই অস্বাভাবিক মিলন কুফল বা চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়। আমাদের দেশের এই বিসদৃশ শিক্ষার বর্ণনা বর্ত্তমান জগতের মনিষী কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে দিয়াছেন তার উল্লেখ এখানে বাহুল্য হইবে না—"বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে, এই কথাই খাটি; কিন্তু পুঁথি পড়া মানুষই যে পুরা মানুষ তাহা বলা যায় না। অথচ এসম্বন্ধে আমাদের বিদ্যাবিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল সে আমাদের কাণে এই মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে যে ভদ্রলোককে পুরা মানুষ হইতে হইবে না। ভদ্রলোকের চোখ ভাল করিয়া দেখিতে না শিখুক, কাণ ভাল করিয়া শুনিতে না শিখুক, হাত ভাল করিয়া কাজ করিতে না শিখুক তাহাতে কোন অগৌরব নাই, কেবল যেন সে পড়িতে শেখে। আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, হাত পাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই যতদিন বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল চাকরীধামে, কেরাণীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মত অসহায় প্রাণী জীবলোকে আর নাই। সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল এবার তাহাদের নৌকাডুবির পালা। সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্র লোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে।" এ কথা সত্য যে আজ আমাদের দেশে ও হাতের কাজকে মানবতার পূর্ণতার দিক দিয়া গ্রহণ করিবার দিন

আসিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ ও আধুনিক সভ্যজাতিগণ হাতের কাজকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে—আর সেজন্য তাহারা নিজের চেতনায় কতকটা উদ্বুদ্ধ তাহা তদ্দেশীয় শিক্ষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের পূর্ব্বোল্লিখিত মতের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। অতীতের ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জাতি-দের অভিজ্ঞতার আদর্শ হাতের কাজকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে স্বাভাবিক পথে চালনা করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—বিশ্বমানবতা পূর্ণ-তার দিকে অগ্রসর হইবে—সেকথা বুঝিবার তাগিদ আজ এদেশে ও আসিয়াছে।

[এই প্রবন্ধের সারাংশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ১৭শ অধিঃ সিউড়ী অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। শাঃ সঃ]

মর্ম্মকথা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল

মর্ম্মকথা গোপন ব্যথা মুখফুটে আবার
বল্‌ব আমি? অন্তর্যামী অজ্ঞাত তোমার!
জানছ না মোর গভীর বেদন?
কাতর প্রাণের নীরব রোদন
শুনছ না কি—হৃদয় ভেদি' উঠছে হাহাকার?
কিসে মোরে বিষম কাঁদায়,
কা'র ছলনায় পড়ে' ধাঁধায়,
এ সংসারে বৃথায় ঘুরে মরছি অনিবার।
দারুণ তাপে পুড়িয়ে মারে,
সইতে যে আর পারি না রে,
এমন করে' বাঁচন আমার হ'ল মরার বাড়!
নিত্য নূতন আপদ রোগ,
ভুগ'ছি কতই কর্ম্মভোগ,
বইতে যে আর পারি না এ অসার জীবন-ভার।
বাঁচতে হারি, মরতে নারি,
এ দুর্দ্দশায় বিপদহারী
হে শ্রীহরি কৃপা করি কর গো উদ্ধার।
হয় গো বাঁচাও, না হয় মারো,
সঙ্কটে রেখ না আরও
আমার উপর বিধি তুমি এই কর বিচার।
এ অধমের শেষ মিনতি,
সদয় হয়ে দীনের প্রতি,
আধা-বাঁচা আধা-মরা হ'তে কর পার;
মর্ম্মকথা বুঝলে আমার? কর গো নিস্তার।

পত্র

রবিবার

প্রিয় নন্দলাল!

আজ গোটা কতক কথা মনে এল শিল্পের 'ক' 'খ' জানতে হলে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই :—

(ক) যে ছবিকে লোকে পাথরে কাটলে কাঠে কুন্দলে সূঁচ দিয়ে তুল্লে কিম্বা আঁচড়ে বার করে আনলে তারা এক জিনিষ আর—

(খ) যে ছবি ফুটলো পটে সে আর এক জিনিষ।

কারণ (ক) সে মানুষের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে পারলে না। মানুষ-ছোঁয়া হয়ে রইলো অনেকখানিই, যে তাদের ফোটালে তার বাহাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাকলো—যে ভাবে কাগজের ফুল সেই ভাবের কাজ এরা।

(খ) কিন্তু অন্যভাবে কাজ করতে থাকলো কেননা সে সত্যি ফুটলো পটে কেউ যে তাকে ফুটিয়েছে যত্নে চেষ্টায় এটা লোপ পেয়ে গেল কাজ থেকে।

একমাত্র চিত্রে সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এই ভাবে রস ফোটানো চল্লো- অন্য কিছুতে নয়।

কাযটি ফুটলো চমৎকার কায যে ফোটালে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল পরিষ্কার—এ হল চিত্র বিদ্যার চরম সার্থকতা—সবাই এটা পারে না।

নদী জলে মাছ থাকে কিন্তু আঁস গন্ধ পায় না জল। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে জল পর্য্যন্ত মাছের গন্ধে দূষিত হয়!

(ক) তেমনি একরকম ফুলও আছে যা মালি মালি গন্ধ করে কাযও আছে যা মানুষ মানুষ গন্ধ করে!

(খ) আর এক রকম কাজ আছে যা ফুটন্ত ফুল—ফুল ফুল গন্ধ করে।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উর্ব্বশী

৫

সে অলকার বাড়ী যাইবার সোনা পথটি ছাড়িয়া যমুনা তীরের জটিল একটি পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। গন্তব্য স্থানে পৌছিতে যেখানে তাড়াতাড়ি নাই সোজা পথের সেখানে কি প্রয়োজন!

কাল রাত্রি হইতে অমুকন্ধের মনে যে বিষাদের বনভূমি তরুপল্লব লতা গুল্ম দিকে বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—যাহার জটিল আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার শিল্পীজনসুলভ কল্পনা প্রবণ চিত্ত পলে পলে অভিমানের রসাতলের মুখে

চলিতেছিল—আজ তাহা এক মুহূর্ত্তে ভাবের নির্ম্মল আকাশে পুনরায় পাখা মেলিয়া দিয়াছে। বর্ষাশেষের নদীর ন্যায় তাহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ—এমন কি অভিমানের ছোট একটি ঢেউ পর্য্যন্ত সেই সুগভীর পরিপূর্ণতাকে ক্ষুব্ধ করিল না। শরত প্রভাতের সুন্দর এই বিশ্বটি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত বৃন্তের উপরে একটি অতি শুভ্র সুনির্ম্মল শতদলের মত ফুটিয়া উঠিল। কল্পনা বিলাসী লোকের স্বভাব ইহাই—যেমন সহজে তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠে—আনমিত হইয়া পড়ে আবার তেমি অনায়াসেই। এই বিশ্ব মাহাত্ম্য নির্দ্ধারণের জন্য যেন তাহারা বিধাতার অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের মত তাহার মন তখন অলকার চিন্তায় পরিপূর্ণ। জগতের সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হইয়াই যেন সে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবীর কতখানি নারীর সৃষ্টি—কত বিশাল তাহাদের স্থান! ভস্মীভূত পুরুষ জাতির উদ্ধারের আশা তাহার সঞ্জীবনী স্পর্শে। মহাদেবের জটা জালে দিক্‌ভ্রান্ত সুরধুনী মুক্তির জন্য যেমন কাঁদিয়াছিল; যে সহস্র ভস্মস্তূপকে মুক্তি দিবে তাহার মুক্তির জন্য বৎসরের কঠোর তপস্যা চাই। পুরুষ এবং নারীর মধ্যেকার এই সম্বন্ধটি বিশেষ করিয়া তাহার মনকে নাড়া দিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল আমি যেমন অলকাকে জড়তার জটাজাল হইতে মুক্তি দিয়াছি সে তেমি আমার চিত্তবরণীকে অবারিত স্রোতে ভাসাইয়া সৌন্দর্য্য সাগরের অভিমুখে লইয়া চলিবে। প্রভাত রবিরশ্মি সম্পাতে আকাশ পৃথিবী যেমন চম্পক দামবর্ণা হইয়া উঠে—তেমি অলকার কল্পনায় সমস্ত প্রকৃতি তাহার নিকটে সুধাসিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই যমুনা তীরের শীতস্পর্শ শুভ্র বালুচর—ওই শান্ত সুনীল স্বচ্ছ বারি রাশি—ওপারের ওই দিগন্ত প্রসারী প্রভাত শিশির স্নিগ্ধ কচি ভুট্টার ক্ষেত—দূরে শাদা পাল তুলিয়া দেওয়া নৌকাখানি পায়ের তলের এই পথ—অগণ্য তাহার ধূলিকণা—সব—সমস্তই যেন অলকার স্পর্শে চিত্রবর্ণ। তাহার ললাটের দুঃখ রাত্রির দুঃশ্চিন্তার স্বেদ বিন্দুকে আজিকার এই সুখ রশ্মি সমুজ্জ্বল সুপ্রভাতের বিধাতা যেন মুক্তাভ্রম করিয়া সযত্নে তুলিয়া লইয়া বিশ্বহারের মধ্যমনির পাশে পাশে গাঁথিয়া দিলেন। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল নিজের অগোচরে কতখানি তাহার সাহায্য করিয়াছে। তাহার শিল্প প্রতিভার উৎসই যেন অলকা! তাহার ছবিতে এত যে রঙের খেলা—তুলির এত যে সূক্ষ্ম রেখাপাত—রঙের এত যে বিচিত্র ছায়া-সুষমার অভিনিবেশ—সমস্তই যে অলকার প্রেমের অনুপ্রেরণা। প্রদীপ নিভিয়া গেলে দৃশ্যমান জগত যেমন নাই—অলকা না থাকিলে কোথায় তাহার পৃথিবী! এক এক বার সে অলকার একখানি ছবি আঁকিবে মনে করিয়াছে কিন্তু হায় মানুষ নিজের গভীরতম দরদটুকুর প্রকাশ করিতে কত যে অসমর্থ। অলকার অধরের ওই যে হাসিখানি যাহা অশ্রু আনন্দের এমন সূক্ষ্ম জালবুনানি—যাহার মধ্যে অশ্রু অধিক কি আনন্দ বেশী কেহ বলিতে পারে না। যাহার দিকে তাকাইলে অতি দূর মানস দিক্ চক্র পরপারবর্ত্তী অস্ফুট রহস্যময় নন্দনের আনন্দলোক দেখা যায়—যে হাসির সাগরের তল নাই কূল নাই যাহা দেশকালের দূর আকাশকে অতিক্রম করিয়া কল্পনায় অমরলোকে সৌন্দর্য্যের সিংহা-

সনে চির বিরাজ করিতেছে—তাহাকে কোন্ চিত্রকরের কোন্ তুলি কোন্ রেখাবর্ণবিন্যাসে বাঁধিয়া রাখিবে।

যমুনা তীরে একস্থানে ধূসর ঝাউবনের শাখায় শাখায় আলোকের স্রোত লাগিয়া অবকাশের সুর সহস্র ধারায় বাজিয়া উঠিতেছিল। সেই শব্দে পথিক অনিরুদ্ধের দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে তাকাইয়া দেখিল দূরে পথের প্রান্তে অলকার বাড়ী দেখা গিয়াছে। সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। তাহা ভয়ে বা লজ্জায় নহে! কবির যেমন নিজের কবিতার প্রতি, চিত্রকরের যেমন নিজের পটের প্রতি, একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্কোচ থাকে—অলকার বাড়ীটির প্রতিও তাহার তেমনি একটি ভাব ছিল। সে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল এখন কোন্ কক্ষে কেমন করিয়া বসিয়া অলকা কি করিতেছে—হয়তো তাহার কথাই ভাবিতেছে—কিন্তু হায় জানে না বাঞ্ছিত জন তাহার এত নিকটে—এই বাড়ীটির প্রত্যেক ইটের বিন্যাস পর্যন্ত যেন তাহার মুখস্থ। কোথায় একটু ভাঙিয়া ছে কোথায় ঘাস গজাইয়াছে—ওই যে পেয়ারা গাছটি পল্লব প্রাচুর্য্যে প্রাচীরের কোনটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—অলকা যখন বালিকা ছিল তখন সে এই গাছটির উপরে উঠিয়া পাচীরে আরোহণ করিয়াছে। তখন অবশ্য অনিরুদ্ধ অলকাকে জানিত না কিন্তু তবু তাহার মনে হয় সে যেন বেশী দিনের কথা নহে। ওই যে জবা ফুলের গাছটি যাহার এক কোনে ছোট একটি টুনটুনি পরিবার বাস করে। ওই যে বকুল গাছ যাহার গায়ে অনিরুদ্ধ কতবার নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছে। অনিরুদ্ধ কতদিন গাছের ছালে অ অক্ষরটি লিখিয়া অলকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে কাহার নাম সে লিখিতে যাইতেছে। অলকা বলিয়াছে অনিরুদ্ধ। সে লিখিয়া ফেলিয়াছে অলকা! তাহার পরে একটা মৃদু হাসির স্পন্দন উঠিয়াছে। এই সমস্ত সুখ স্মৃতি আজ এই আশ্বিনের শিশির মসৃণ প্রভাতে অনাঘ্রাত এক পুষ্প সৌরভের মত আকাশের নির্ম্মেঘ নির্ম্মলতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

এমন সময়ে অলকাদের চাকর অনিরুদ্ধকে দেখিয়া ভিতরে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। সে বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল অলকা কোথায়? চাকরটি উত্তর দিল—দিদিমণি সকাল বেলায় কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অনিরুদ্ধের মন সহসা অভিমানে মেঘলা হইয়া উঠিল। তাহার এত বড় একটা সর্ব্বনাশ হইল অথচ তাহাতে অলকার একটুও সহানুভূতি নাই। দূর হোক্‌গে ছাই কাহার জন্য সে এত করিতেছে। আজ চিত্র প্রদর্শনীতে বিজয় মাল্য সে পাইলে—রাত্রে তাহা কাহার কণ্ঠ শোভা করিত! তাহারই যদি এতটুকু সমবেদনা না থাকে তবে কেন সে এত ভূতের ব্যাপার খাটিয়া মরিতেছে। অনিরুদ্ধ সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। এবারে সে সোজাপথ ধরিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল হয়তো অলকা সকালে উঠিয়া তাহারই বাড়ী গিয়াছে—এবং তাহাকে সেখানে অনুপস্থিত দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার মনে হইল সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া কি অন্যায়ই

না করিয়াছে। সে আরো তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল এখানে কেহ কি আসিয়াছিল। উত্তর পাইল না। তবু তাহার আশা ভঙ্গ হইল না—ভাবিল অলকা হয়তো সকলের অগোচরে আসিয়া তাহার চিত্রশালায় বসিয়া আছে। অনিরুদ্ধ তাড়াতাড়ি চিত্রশালাভিমুখে চলিতে লাগিল। আশা আশঙ্কায় বুক তাহার কাঁপিতেছিল। চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অভিমানে ও ক্লান্তিতে সে বসিয়া পড়িল।

তখন শরৎ মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্র মরীচিকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। দূরে বাঁশ বনের পাতায় পাতায় হাসির তরঙ্গ উঠিয়াছে। অদূরে বাঁধের পাড়ে কাশের শুভ্র উপবন—তাহার পাশে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বহুদূর বিস্তৃত কচি ধানের ক্ষেত নীরবে রৌদ্র পোহাইতেছে। আকাশের সূচীভেদ্য নীলিমায় কোথাও মেঘ লেশমাত্র নাই—একটিমাত্র চিল করুণ ক্রন্দনে নিস্তব্ধ প্রায় শরৎ মধ্যাহ্নের সমস্ত বেদনাটুকুকে প্রকাশ করিতেছিল। উত্তপ্ত সেই রৌদ্র মদিরা অনিরুদ্ধের শোণিত স্রোতে প্রবেশ করিয়া তাহার শরীরের সর্ব্বত্র শিরা উপশিরায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যে তরুণ চরণ দু'খানির মুখর নুপূরের তালে তালে বিশ্বময় একটা দোলা লাগিয়া ছিল তাহারই অধীর স্পন্দনে শিল্পীর রক্তস্রোতে ঝিম ঝিম করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অলকা তাহাকে একখানি আচ্ছাদনী তৈরী করিয়া দিয়া ছিল—সেই খানি সে টানিয়া লইয়া মাথার উপরে চাপিয়া ধরিল। ঢাকনি খানির আঙিনা শাদা—চারদিকে কাল পাড় দেওয়া। অলকা যখন ইহা অনিরুদ্ধকে দেয়—সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ইহার পাড় কেন কাল? অলকা তাহার কোন উত্তর দিতে পারে নাই! অনিরুদ্ধ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল! শাদা আঙিনা টুকু প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান আর ওই কাল পাড়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সূচনা করিতেছে! তখন তাহাদের কেহই জানিত না অনিরুদ্ধের এই হঠাৎ ব্যাখ্যার মধ্যে এতখানি ভবিষ্যদ্বানী আছে! এই ঢাকনী খানির স্পর্শে সে যেন অলকার স্পর্শই পাইতে লাগিল! বাস্তবিক নারীর অস্তিত্বের কতখানি তাহার সামান্য সামান্য জিনিষ পত্রের মধ্যেই না থাকে! পুরুষ আপনাকে সংহত করিয়া সামলাইয়া রাখে! মেয়েরা চারিদিকে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াই যেন নিষ্কৃতি পায়! তাই তাহাদের ছোট খাটো জিনিষ গুলি এত প্রিয় মনে হয়! চুল বাঁধিবার ফিতাটি, চিরুনী, আয়নাখানি, ছোট খাট চিঠিগুলি, খুটিনাটি বিলাসের সামগ্রী ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু স্পর্শ তাহাদের আছে! পারিপার্শ্বিক এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিলাইয়াই রমণীর পূর্ণত্ব; নহিলে সে একা নিজের কত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র!

এই সব কথা যে তখন অনিরুদ্ধের মনে হইয়াছিল তাহা নহে—কিন্তু মনে হওয়ার চেয়ে যাহা বেশী—তাহাই তাহাকে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলি এক সুরে বাজিয়া উঠিয়া এমন অননুভূতপূর্ব্ব এক বিশ্বব্যাপিনী রাগিনী ধরিয়া ছিল—যাহা তাহার হৃন্মর্ম্মস্থিত অন্তরাত্মাকে সুখদুঃখাতীত এক অনৈসর্গিক স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিল—যেখানকার ভাব ব্যক্ত করা যায় না—হয় তো বুঝা যায়—চিত্রকর আঁকিতে পারে না

হয় তো কল্পনা করিতে পারে—কবির কথায় তাহার সীমা স্পর্শ করিতে পারে না—ছন্দে হয় তো তাহার আভাস টুকু মাত্র পাওয়া যায়!

কলসীর কাণা

জগাই ও মাধাই

প্রত্যেক মানুষের দুই পা বলিয়া—তিন জন মানুষকে ষট্‌পদী বলা চলে না।

*　　*　　*

যাহা খারাপ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই—কিন্তু কি ভালো তাহাই লইয়া যত মারামারি।

*　　*　　*

সকলেই আদর্শবাদী সকলেই ভালো চাহে—কিন্তু তাহার পন্থাটা লইয়াই যত গোলমাল।

*　　*　　*

অধর্ম্ম জিনিষটা ভালো নহে—কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা কত পীড়াদায়ক হইতে পারে মাঝে মাঝে তাহা প্রকাশ পায়।

*　　*　　*

নাস্তিকরা উল্টা দেশের লোক তাহাদের চোখে ভালোর চেয়ে মন্দ জিনিষটাই আগে পড়ে।

*　　*　　*

সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে অর্দ্ধত্যাগ করিতে রাজি আছি, কিন্তু সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবার আগেই অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়া খুসী হইতে সম্মত নই।

*　　*　　*

ছোট নদী সোজাসুজি সমুদ্রে গিয়া মেশে। বড় নদীর গতি এত কুটিল—এক এক সময়ে মনে হয় বুঝি তাহার দিক্ ভুল হইয়াছে।

*　　*　　*

নদী যতই ভাবুক না সে দুই তীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছে—আসলে সে নানা উপায়ে দুই তীরকে গ্রথিত করে।

*　　*　　*

কোনো সংস্কার না মানাই এক সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়।

*　　*　　*

সমতল জমিতে যেমন ঘর বাঁধা চলে না—একটি উঁচু করিয়া ভিটা তৈরী করিতে হয়—তেমনি সংসারে মানুষ কোনো না কোনো সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া বাঁচে।

*　　*　　*

পৃথিবী গোলাকার বলিয়া যাহারা পরস্পরের বিপরীত চলে তাহারা একজায়গায় আসিয়া মিলিত হয়।

*　　*　　*

ভবিষ্যৎ কাল ভস্মলোচনের মত—তাহার দিকে তাকাইলেই পুড়িয়া মরিতে হইবে। অতীত কালের দর্পণখানা সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

*　　*　　*

শুষ্ক নদীর অপেক্ষা বদ্ধ স্রোত ক্ষতিকর—অভাবের অপেক্ষা বদ্ধধনের স্রোত ভয়াবহ।

*　　*　　*

ভগবানের সৃষ্টি অসীম—মানুষের সৃষ্টি সীমাবদ্ধ। উভয়ের সৃষ্টিতে প্রভেদ এই।

ধন মানুষের সৃষ্টির উপাদান অতএব ধন—আবশ্যকীয়।

শেষ উপহার

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

যবে তুমি গেলে চলে
অন্ধ হল যেন কোন্ রুদ্র মন্ত্র বলে
যত দীপশিখা জ্বলেছিল মোরে ঘিরে,
সারি সারি, মম যৌবন প্রাচীরে।
চারিদিকে ঠিল জাগিয়া পেঁচক-আঁধার
মৃত্যু-কণ্ঠে চাপা হাহাকার।
মনে হল তুমি গেলে নিয়ে,
সব সুখ শান্তি প্রিয়ে,
কিছুই না রাখি,
বাকি।

তখন তোমার নীল আসনের পরে
দিল দেখা
(রেখেছিলে যা আমার তরে)
দীপ্ত এক স্বর্ণ ধূলি রেখা
যেথা তোমার মধু-কান্তি পা
রাজিত রজনী দিবা।
দেবী সেই ত তোমার
শেষ উপহার॥

কলিকাতা

১

হে নগরী তব মত্ত জনতার মাঝে
কর্ম্ম শম্মি-মুখরিত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে
রৌদ্র-দগ্ধ দাসের প্রতি ক্ষুদ্র কাজে
ধূলিদীর্ণ জনাকীর্ণ চতুষ্পথ পাশে

একেবারে লাগে নাকি শরতের সুর!
শেফালী-বিমুগ্ধ শান্ত প্রভাত তরুণ
সুদূর সৌরভ-ক্লান্ত অলস দুপুর
সোণার মাধুরী-ভ্রান্ত সন্ধ্যা সুকরুণ

বলে নাকি কোন বাণী তোমার অন্তরে!
কে বলিল বলে নাই ওইতো নেহারি
কোন্ অমিয়ার ধারা তব বক্ষ পরে
কাজল-নয়ন, মরি—মূর্ত্তি স্নিগ্ধ তারি।

যেজন অমৃতে সিক্ত নহে বারে বারে
সে কি এ সৌন্দর্য্য সুধা জোগাইতে পারে

২

আজি এ নগরী হেরি মোর মনে হয়
শিলীভূতা অহল্যার স্বপ্ন শিলাময়
পাষাণ-পল্লব পুঞ্জে উঠে বিকশিয়া
বঙ্কিম ভঙ্গিমাভরে রুদ্ধ-স্নেহ হিয়া
নির্মেঘ গগন পানে; রাজপথগুলি
প্রচণ্ড আবেগ ভরে উঠিছে আকুলি

স্মৃতির মদিরা পানে দুরন্ত উন্মাদ
দিকে দিকে চূর্ণ করি চেতনার বাঁধ ;
সহস্র শিরায় আর উপশিরা ভরি
অতীতের গীত গাঁথা উঠিছে মর্ম্মরি
রক্ত কৃষ্ণচূড়া কুঞ্জে ; অট্টালিকা রাশি
শুভ্র ফেন পুঞ্জ সম চলিয়াছে ভাসি
মৌন মুখরতা দূর সাগরের পানে
আত্ম-ভোলা নৃত্যে মাতি অন্তহীন গানে।

৩

যদি এই সুখস্বপ্ন যায় তার টুটি
বুকেতে আঁচল টানি বসে যদি উঠি
কবরীর শ্লথ মালা ঘুরায়ে আবার
বেঁধে যদি নেয় কালো কেশ পাশ ভার
তখনি পড়িবে মনে হ'ল কতকাল
লভেছিল স্বপ্নময়ী বনান্ত আড়াল।

তখন নিভাবে কোথা এই নগরীর
কর্ম্মরূঢ় লক্ষ লোক জনতা গভীর।
কিছু পারিবে না শুধু তটিনী চঞ্চল
কলোচ্ছ্বাসে নিয়ে যাবে রুদ্ধ অশ্রুজল
যুগলবন্ধনতট দিবস শর্ব্বরী
অতীতের শত সুখ স্মরণে আবরি।

কোথা সে সোনার কাঠি কোথা সে প্রভাত
লক্ষ তারা বিরাজিত এযে অন্ধরাত।

৪

হে লক্ষ্মি হে সুধাময়ি প্রথম যখন
শুষ্ক নগরীর বুকে মেলিলে নয়ন
জীর্ণ অট্টালিকা শ্রেণী শিহরি তখন
উঠিয়া কি ছিল কোন নিগূঢ় ব্যথায়!
কৃষ্ণচূড়া বীথিকার পাতায় পাতায়
আশার আভাসখানি পড়েনি কি হায়—

সজল মেঘের ঘন ছায়া সম আসি!
শত কর্ম্ম কোলাহলে ব্যস্ত জন রাশি
দিকে দিকে ছুটে যারা চলেছে উদাস

তারা কি একটা বারও পথের পাথরে
শোনে নাই কানপাতি বুকের ভিতরে
কি মহা সঙ্গীত বাজে মানস-মর্ম্মরে!

•

একাদশ বর্ষ পরে বসিয়া একেলা
আমি হেরিতেছি সেই আনন্দের মেলা।

৫

নগরের পথে পথে একেলা পথিক
চলিয়াছি যেথা খুসী যখন যেদিক।
অট্টালিকা অন্তরালে দূর বন পারে
তপন ডুবিয়া গেছে কখন্ আঁধারে।
পথ পাশে জ্বলি উঠে দীপ্ত দীপ মালা
কত ক্লান্ত রজনীর নীরবতা ঢালা।
পণ্যশালা বাতায়ন দর্পণ উপরে
বিলাসের পীত শিখা আলোক ঠিকরে।
হর্ম্ম্য শিখরের কোন্ গুপ্ত গৃহ হ'তে
উচ্ছ্বসিত হাসি গান অনিবার স্রোতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িছে আসি পথের পাষাণে
আনন্দ হিল্লোল তুলি মোর সুপ্ত প্রাণে।
আজি এই সন্ধ্যাটিরে নিবিড় করিয়া
নিষ্পলক আঁখি পাতে তুমি জাগ প্রিয়া।

৬

দূর হ'তে নগরের সৌধচূড়া রাশি
জেগে উঠে ধীরে ধীরে ; অমনি উচ্ছ্বাসি
হৃদয় ছুটিতে চায় দূর পুরী পানে
সতনু স্বপন মোর দেখিতে নয়ানে।
পথ পাশে দুই দিকে সঙ্কীর্ণ আলয়,
রক্তবর্ণ টালি ছাদ চারিদিক ময়,
উচ্চ নীচ আধ ভগ্ন ; জলপাত্র নিয়া
কুয়ার পাশেতে কেহ আছে দাঁড়াইয়া
বাষ্পীয় শকট পানে চাহিয়া অবাক্।
চারিদিকে কত মত চলে হাঁক ডাক
কারখানা গৃহে গৃহে ইস্পাতে লোহায়
ধরার কোমল বক্ষ আচ্ছাদিত হায়!
সব আবর্জ্জনা ভেদি তুমি আছ হেথা
নগরীর শুষ্ক বুকে—আনন্দ দেবতা।

অশ্বযানে চলিয়াছি সবেগে সম্মুখে
আতপ্ত রক্তের বেগ তরঙ্গিত বুকে
তোমার আলয় পানে। প্রভাত কিরণ
লাগিয়াছে সৌধশিরে ; দুই একজন
সিঞ্চিতেছে রাজপথ উচ্ছ্বসিত জলে
পথিকের বস্ত্রসহ। লোক দলে দলে
ছুটিয়াছে কত দিকে ; পথের দুধারে
সাজানো বিপণি শ্রেণী বস্ত্র ফল ভারে
উজ্জ্বল তৈজসে আর ; বিচিত্র শব্দের
বাড়িছে জোয়ার যেন ; শকট মোদের
এখন শিথিল-গতি রাজপথ ছাড়ি
প্রবেশিল গলি মাঝে,—ওই সেই বাড়ী।
এই গলি—ওই বাড়ী—ওই সেই দ্বার
এখানে থামিনু আমি না লিখিব আর।

৮

আজি হেরিতেছি পুরী তোমার পাথরে
জীবনের ইতিহাস লেখা থরে থরে
অক্ষয় লেখনী যোগে। চলন্ত ভাষায়
তুমি লিখিতেছ গাথা আশা নিরাশায়
পথপ্রান্তে দিকে দিকে ; ক্ষুদ্রতম যারা
তাদেরো কাহিনীটুকু হয় নাকো হারা
ধূলি স্তূপে বিমলিন। শতাব্দী উদার
তব হর্ম্ম্য চূড়া হ'তে মেলি আঁখি তার
নিষ্পলক চেয়ে আছে ; পথে চলি হায়
বিস্মৃত স্মৃতির দল মৌন ইসারায়
ইঙ্গিত করিতে থাকে ; বিগত জীবন
প্রশ্নময় আঁখি মেলি বোবার মতন
কাঁদে ক্ষুব্ধ প্রত্যাশায় ; অন্তহীন পাঠ
তোমার পাথরে লেখা—হে পুরি বিরাট

এতখানি সুধা ছিল পাষাণের প্রাণে
কে তাহা জানিত আগে,—হৃদয়ের টানে
হৃদয় উতলা হ'ল বাহু বন্ধ টুটি
চিত্তহীন প্রস্তরের। নদী আসে ছুটি
হিমাদ্রির কারা ভাঙি করুণ আহ্বানে
তৃষ্ণাতপ্ত মরুভূর। চাহি তব পানে
কি ছন্দ উঠিল বাজি শিলায় শিলায়
উচ্ছ্বসিত সৌধশিরে চঞ্চল লীলায়
তরঙ্গিয়া দলে দলে। তোমার নয়নে
দূরান্তের কারা যেন কুসুম চয়নে
এসেছে প্রভাতে আজি। কুঞ্জতল ভরি
বনান্তের ভ্রমরেরা ফিরিছে গুঞ্জরি
উদ্বেল পাথায় মরি ; সেই গন্ধ গান
পাষাণের চিত্তে আজি সঞ্চারিল প্রাণ।

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীঅনিলকুমার মিত্র)

৩

উড্রফ সাহেবকে যে দুই খানি পত্র লেখা হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই দুই খানি পত্র পড়িলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের তন্ত্র সম্বন্ধে মতামত কতকটা বোঝা যাইবে। তাঁহার সাধনা কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক সাধনা ছিল না। সাংখ্য বেদান্ত তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহারই আলোকে তিনি তাঁহার সাধন পথে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। এই দুই খানি পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

Shantiniketan.
26th May 1919.

My dear Mr. Woodroffe.

Thanks to you for your kind letter of the 19th instt. Although I have not had the good fortune to be as yet personally acquainted with you, still what I have heard from my nephew Gogon concerning the interest you take in the welfare of India emboldens me to take liberty of shaking hands with you, a feat worthy of record. I am over joyed to find that you agree with me on the three points which constitute the main body of my article.* To be candid with you, my knowledge about the philosophy and religion of India is chiefly due to my personal experience of the religious people and thinkers (unknown to fame) of India of the present time, which, unfortunately are yearly and daily dwindling away as the so called civilization is advancing or coming to its close—no body knows which ?

The *living present* at this time has approached so near to the brink of kali's sandhya that to work up from this to the wished-for heaven of real civilisation as distinguished from Commercial Devilisation is a feat worthy of a stupendous Giant of Genius, an eighth wonder almost.

It is a wonder to me how, in the midst of your exceedingly busy life and solely by your own individual effort you have obtained mastery over the subject of Tantric and Neo-Vedantic philosophy and literature of India—how you have made a path for yourself within the untrodden mazes of mystic lore of

Tantra and have succeeded in coming out from Shava—Sadhana (শব-সাধনা) safe and sound with senses completly under the control of your reason. Your view on the above mentioned is as accurate and faultless as could be desired. Moreover the conclusion which you have arrived at by the exercise of your own independent Judgment wonderful to say almost concides with that of mine.

Truth to say—I have as yet not seen any other European scholar who has come to so close a rapport with geniune Indian thought and culture except a very few great scholars like Deussen etc.

I would have written you a much longer letter giving you my views on the bond of connection between Vedanta and Sankhya in full, if time and strength permitted me. Under my present circumstances I can do no more then simply to give you a bare hint (which I am sure is nothing new to you) regarding the subject under consideration. Thus :—

(1) Vivarta vada versus Parinam vada ;

(2) Whether Prakriti is an independent entity, or wholly depends upon Atma for its phenomenal or Mayic existence.

These are roughly speaking, the only two points in respect of which Sankhya differs from Vedanta.

I have nothing more to add for the present.

With hearty good wishes I remain, Yours Sincerely

Dwijendranath Tagore.

Shantiniketan,

4th June, 1919.

Dear Mr. Woodroffe,

With many, many thanks I acknowledge the receipt of the six pamphlets you are good enough to send me. Just now I have no leisure to go through all the pamphlets. I have only read with the greatest pleasure and interest your paper on *OM*.

Since I have no leisure just now as I told you, I can but hastily put down a few words which came uppermost in my mind in course of reading your paper on *OM*. What

---

*Prof. A. B. Keith and the Sankhya System by Dwijendranath Tagore, published in Modern Review May 1919.

you are at present trying to do, is to join as it were in wedlock the Eastern philosophy and Western Science—which is Consummation devoutly to be wished for.

The supreme mantra *O.M.*, was held so sacred by our forefathers that they deemed it a sacrilege of the worst kind, not only to be pronounced but to be heard by the profane. I therefore as one of your sincere well wisher advise you to gird up your loins well to meet the return rush of the wave which is sure to follow when pearls are thrown before the swine.

Your paper on *O.M.*, carried me on its back like the fable Garuda (গরুড়) of Vishnu to the primaeval times when the whole Akasha was re-sounding with the music of প্রথম নাদ (the First Sound) and চিচ্ছক্তি, ইচ্ছাশক্তি and ক্রিয়াশক্তি, the power of Thought, the powar of Desire, and the power of Action (Wisdom, Love, Will, in more conventional and less significant terms of the Western School) was getting Concentrated in one Om = Womb = Amba (which means mother). What an utterly inexpressible, unthinkable,and incomprehensible Mystery ! Who dares to rend this Veil of Isis with unwashed hands ? Only those who prepared themselves for this sole purpose by all sorts of preliminary discipline could venture to have a peep into it—and what little they found they kept for their own seven times tried disciples whom they are sure of as being incapable of abusing their trust. But during the Vedic Period there arose a kind of anomalous class of men known by the name of Vratya (ব্রাত্য) who threw off all the shackles of Vedic observances. They were a sort of outlaws, and whether they adopted the Shakti cult or not is a problem yet to be solved. These men were not necessarily other than respectable but on the contrary in some passages of Atharva Veda they were highly spoken of as men of Superior type.

At present I have a task in hand which takes my mental power to the uttermost, otherwise I would have been glad to carry on with you regular correspondence on these subjects which are of greatest interest to me.

I quite agree with you as regards your opinion of Dr. Deusson.

In fact, I did not at all relish his proclivity towards Schopenhaur and others, which vitiated to a certain degree his judgment about our Indian Philosophy.

With prayers for success for your undertakings, I remain,

Yours Sincerely,

Dwijendranath Tagore.

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয় তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ,সাংখ্য বেদান্ত ও কাণ্টীয় দর্শনশাস্ত্র লইয়া মস্‌গুল্‌ ছিলেন। ঐ সময়কার "প্রবাসী পত্রে তাঁহার বিচিত্র গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

১

তোমারে বেসেছে ভালো কতই না লোকে।
বাসনা-বিশাল কত আঁখির তুলিকা
সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরি তব লিখিয়াছে লিখা।
তৃপ্তিহীন কামনার অক্ষয় আলোকে।
আমি বেসেছিনু ভালো অন্তরে তোমার
যুগল ভুরুর কালো খিলানের তলে
আত্মার রহস্য-দীপ বহিয়া যে চলে
সেই তীর্থ-পথিকারে চির-যাত্রা যার।
যদি কোনো দিন সখি কালের অঙ্গুলি
ক্ষুন্ন করে রূপ তব মনুষ্য-মন্দির
অনির্ব্বান আলোকেতে সেই শিখাটির
তোমারে চিনিয়া লব—যাবো নাকো ভুলি।
দিগন্তের বাহুপাশ কাটাইয়া ক্রমে
চির ছায়াপথে যাত্রা কর প্রিয়তমে।

২

আর কোনোদিন সখি রক্তরুচি বাসে
আসিবে না বীথিপথে—মোর জীবনের
প্রথম উষার মত পূবের আকাশে—
এই খেদ রয়ে গেল ক্ষুধিত মনের।
আর কোনোদিন সখি অলকে তোমার
পরিবেনা করবীর শঙ্কিত মঞ্জরী!
আর কোনোদিন সখি স্বপ্নরস সার
আনিবে কি অকথিত দুটি নেত্র ভরি?
স্মরণের মধুচক্র ভাঙিয়া সহসা
মুখর হয়েছে মত্ত মধুপের দল
নিঃশেষ করিয়া মধু এখন কি দশা
আপনার বিষে তারা আপনি চঞ্চল!
বিস্মৃতির কালো জলে সোণার প্রতিমা
ডুবাইয়া পাবো নাকি এ দুঃখের সীমা!

শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগের প্রতিবেদন

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দেশ-বাসীকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন আমাদের দেশ প্রধানত পল্লী-বাসী। পল্লীর সমস্যাই দেশের প্রধান সমস্যা; বড় বড় নগরী রাজধানীর মোহ তখন আমাদের চিত্তকে পল্লী অঙ্গনের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই কবির বাণী তখন আমাদের হৃদয়ে সাড়া দেয় নাই।

কবি যখন তাঁহার দেশবাসীকে পল্লীর দিকে মুখ ফিরাইতে আহ্বান করিবার সময় ইহাও বলিয়াছেন "আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকো, বিদ্যা ও অর্জ্জনের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালী জাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে বাঙালীর সমগ্র শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা যেন একেবারে উল্‌ট পাল্‌ট্‌ হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে।" কিন্তু ঠিক্ বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বেনে সভ্যতার মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা—

"ঘর কৈনু বাহির।
বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন
আপন কৈনু পর।"

প্রাচীন ভারতে যখন বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তখনও পল্লীর সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হইত।

"In Chandra Gupta's time we find a special department to provide for pasturls & grazing grounds, for proper supply of fodder and for the welfare of live stock in general. There were not less than six chief officers for running this department, the most important of whom are the Superintandants not only of cows, buffaloes, sheep, goats and asses but also of pigs, mues & dogs." (Economic History of Ancient India. P. 134.)

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে যেই গৃহপালিত পশুর উপর পল্লীর গার্হস্থ্য জীবন নির্ভর করে; তাহার রক্ষা করার দায়ীত্ব প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য শাসকগণ—

প্রজার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। নিজেরা তাহার পুরাপুরী দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে কৃষির উন্নতির জন্য দেশময় জল সেচনের বিপুল ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের শাসন সময়ে ইরিগেশনের ভার গভর্ণমেন্টের হাতে ছিল এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশময় বৎসরে দুই ফসল উৎপন্ন হইত।

বর্ত্তমান সময়ে কাঁচা মাল রপ্তানী ও বিদেশী মাল আম্‌দানীর সুবিধার জন্য রেলের রাস্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু যে জল ধারার অমৃত সিঞ্চনে বাঙলার স্নিগ্ধ অঙ্গন অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত নির্ম্মম ভাবে তাহার গতিরোধ করিয়া সহুরে বণিক সম্প্রদায় এবং তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সরকার বাহাদুর কৃষক সম্প্রদায়ের যথাবশ্যকীয় সমস্যা গুলি সম্বন্ধে যে বিপুল উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন তাহার ফলে কাঁচা মাল উৎপন্নের পথে ও ভাটি পড়িয়াছে।

মুমূর্ষু পল্লীবাসী, ক্রয় বিক্রয়ের অবস্থা অতিক্রম করিয়া, ধ্বংশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হংসরাজ বাঁচিলে ত স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করিবে?

সেই জন্যেই আজ সরকার বাহাদুর ও চিরাভ্যস্ত উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের পরিমাপ করিবার জন্য Agricultural Royal Commission বসাইতেছেন।

আমাদের দেশে অভিজাত সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ, যাহাদিগকে শোষণ করিয়া পরগাছার মত বাড়িয়া উঠিতে-ছিলেন—এতদিন পর দেখিতে পাইয়াছেন যে সেই আসল বৃক্ষের মূলেই রসের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ও আর অন্ন জুটিতেছে না। তাই আজ মরণের তীরে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রাণে মিলনের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের Co-operation জনিত মিলনের দ্বারাই আমরা Destruction হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"পল্লীই আমাদের দেশের প্রাণ-নিকেতন। যদিও আমরা রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এত-দিন ধরে অনেক বক্তৃতা করে এসেছি, কিন্তু আমারা দেশের যথার্থ এই প্রাণনিকেতন হ'তে দূরেই ছিলুম। দেশকে উন্নত করতে হ'লে এই পল্লীর প্রাণ-নিকেতনেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।"

যাহারা আমাদের দেশের যথার্থ শক্তির ভিত্তি, আমরা তাহাদিগকে ভেদ বুদ্ধির দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছি। বিপদে যাহারা আমাদের রক্ষক, অন্ন উৎপাদন দ্বারা যাহারা আমাদের পালক, তাহাদের আত্মসম্মানকে আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত করিতে হইবে।

বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া পল্লীর এই প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করাই পল্লীসেবা সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়া কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আংশিক খণ্ডতাকে মানুষ যখন একান্ত করিয়া দেখে তখন তাহার মধ্যে দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সংঘাত জাগিয়া ওঠে।

সত্যের পরিপূর্ণতার আদর্শের মধ্যে সকল

মানুষের সর্ব্বতোমুখী শক্তিকে সহজেই ব্যবহার করা চলে।

পল্লী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র স্বার্থ দ্বন্দ্বকে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য পন্থা অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধকে জাগ্রত করিবার দিকে যেন আমরা ঝুঁকিয়া না পড়ি। প্রাচীন পল্লী-সমাজে ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন শিল্পীসঙ্ঘ ছিল। কিন্তু সমগ্র সমাজের পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল।

পরস্পরের প্রীতি-পূর্ণ সহযোগীতার দ্বারাই আপাত বিরোধী স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে মিলন শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। এই আদর্শ দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়াই পল্লীসেবা সঙ্ঘ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথমে আমরা যখন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি তখন দেখিতে পাই যে প্রত্যেক গ্রামে ৩।৪টী করিয়া দল রহিয়াছে। ইহারা পরস্পরের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ত। একদল কোন কল্যাণ কর্ম্মের চেষ্টা করিলে, অপরদল প্রাণপণে সেই সকল কর্ম্মে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে। দলাদলি ভুলিয়া পল্লীর সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণজনক কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় শিক্ষার অভাব তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হইত, পল্লীর জনসাধারণ ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বাহিরে সম্মান করিলেও অন্তরের সহিত ভয় ও অবিশ্বাস করিত। আত্মসম্মান বোধও আত্মনির্ভরশীলতার ভাব তাহাদের মধ্যে অল্পই ছিল।

এই কয়েক বৎসর চেষ্টার পর বর্ত্তমানে আমরা কয়েকটী গ্রামে আত্মনির্ভরশীলতার ভাব জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিভিন্ন পল্লীর সম্পাদকগণের লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করিলে তাহা অনুমিত হইবে।

বিশ্বভারতী সংবাদ

রাইপুর ব্রতী বালকদলের প্রথম বর্ষের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী।

গত জুলাই মাসে অনারেবল অরুণচন্দ্র সিংহ মহোদয় যখন শান্তিনিকেতন যান সেই সময় তথায় বিশ্বভারতীর শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তিনি বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালী মোহন ঘোষ মহাশয় ও কৃষি বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে, তাঁহার পিতা লর্ড সিংহ মহোদয় প্রতিষ্ঠিত রাইপুর সিতিকণ্ঠ মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ মামুলী প্রথায় ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্কের উন্নতি হইলেও তাহারা প্রকৃত কাজের লোক হইতে পারে না এবং তজ্জন্য তাহারা সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। অতএব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষার প্রচলন করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন করিতে হইলে বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষককে উক্ত কার্য্যকারী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আনা বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষ বি, এস, সি মহাশয়কে প্রায় এক মাস কাল শ্রীনিকেতনে রাখিয়া তাঁহাকে কৃষি, বয়নশিল্প, রঞ্জনশিল্প, ব্রতীবালকদল পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াইয়া আনিয়া তাহারই পরিচালনাধীনে এবং বিশ্বভারতীর অনুকরণে এখানে বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ও ব্রতীবালকদল গঠনের ব্যবস্থা করেন।

তদনুসারে প্রধান শিক্ষক মহাশয় শিক্ষা সমাপনের পর শ্রীনিকেতন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে ও বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রকে লইয়া একটী ব্রতীবালকদল গঠন করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যকরী শিক্ষাবিভাগের ভার প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপর অর্পিত থাকিলেও— বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণ এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহে ৪ দিন মাত্র বয়ন ও রঞ্জন শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২ দিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজে শিক্ষা দেন, অবশিষ্ট ২ দিন শ্রীনিকেতনের জনৈক কর্ম্মী আসিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ব্রতীবালকদলের পরিচালনার ভার প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপর অর্পিত থাকিলেও বিশ্বভারতীর ব্রতীবালকদলের পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু ধীরানন্দ রায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ব্রতীবালকদলের কার্য্য পরিদর্শন করেন ও তাহাদিগকে নূতন নূতন খেলা শিক্ষা দিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আসন বুনিবার তাঁত দুইখানি চলিতেছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত চারি শ্রেণীর বালকেরাই বয়ন ও রঞ্জন শিল্প শিক্ষা করিয়া থাকে। ইতিমধ্যেই বালকেরা আসন, কার্পেট ও ফিতা সুন্দর ভাবে বুনিতে ও সূতা রং করিতে শিখিয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদের বেশ উৎসাহ ও দেখা যাইতেছে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে উহাদের মধ্যে দুইজন বালক (গৌরীপদ রায় ও গৌরাঙ্গসুন্দর পাল) আপন বাটীতে তাঁত বসাইয়া পরিবারের মধ্যে উহা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে তাহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে অন্যান্য বালকেরাও তাহাদের নিজ বাটিতে তাঁত বসাইয়া পরিবারের মধ্যে কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে।

রাইপুর গ্রাম খানি বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে একখানি ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্রমাগত ভুগিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। গ্রামের লোক সংখ্যার ও পূর্ব্বা-

পেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া নিবারণই গ্রামবাসীগণের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করা, অপরিষ্কৃত খানা ডোবা ভরাট করিয়া দেওয়া, জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা, ম্যালেরিয়া আক্রমণের পূর্ব্ব হইতে প্লীহা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে নিয়মিত ভাবে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন সেবন করান ইত্যাদিই ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। তজ্জন্য ব্রতীবালকগণ তাহাদের দল গঠনের পর হইতে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও তাহারা কয়েকটী জঙ্গল পরিষ্কার করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে এবং সাধারণ গ্রামবাসীগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিদ্যালয়ের স্থানীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দাস সরকার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু রাকেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ সিংহ প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহাদের সহিত স্বহস্তে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া গ্রামবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ আপন আপন গৃহ ও তৎসংলগ্ন স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের তুলনায় এবৎসর এখানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অধিকতর প্রচণ্ড হইয়াছিল। তজ্জন্য অনারেবল্ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহোদয় গত ম্যালেরিয়ার সময় তাঁহার পিতৃ—প্রতিষ্ঠিত রাইপুর মনোমোহিনী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রভূত পরিমাণে কুইনাইন পাঠাইয়া তাহা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ মধ্যে সাধারণ গ্রামবাসিগণের অপেক্ষ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ মৃদুতর হইয়াছিল। তাহার কারণ গ্রামের সাধারণ অধিবাসিগণ অপেক্ষা ছাত্রগণ অধিকতর নিয়মিতভাবে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিয়াছিল; বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে কুইনাইন বিতরণের ভার ও ব্রতীবালকগণই গ্রহণ করিয়াছিল।

গ্রামের সাধারণ অধিবাসিগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে উদাসীন। সুতরাং তাহাদিগকে এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে সজাগ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্য অনারেবল্ অরুণচন্দ্র সিংহ মহোদয় গত জুলাই মাসে যখন এখানে শুভাগমন করেন তখন তাঁহার সহযাত্রী বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর প্রচারক শ্রীযুক্ত নিশীকান্ত বসু মহাশয়ের দ্বারা গ্রামবাসীগণকে আলোক চিত্রের সাহায্যে ঐ বিষয়ে উপদেশ দেওয়াইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংস্কার বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া গ্রামবাসীগণকে স্বাস্থ্য রক্ষণ বিষয়ে মৌখিক উপদেশ দেন ও আলোক চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ মত গ্রামের সাধারণ অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ জল ফুটাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বাস্থ্যের নিয়মপালন বিষয়ে অপেক্ষা কৃত যত্নবান হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় ৩ বিঘা জমি লইবার একটি কৃষিক্ষেত্র করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি কূপ খনন করা হইতেছে। কূপ খননের কাজ শেষ হইলেই কৃষিশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইবে। এইরূপে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও পল্লীসেবার কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে লর্ড সিংহ মহোদয় এখানে শুভাগমন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে পল্লী-সংগঠন কার্য্যেও মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আগমনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাঁহার উপদেশে এবং ব্রতীবালকগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে আপন আপন বাটী ও তৎসংলগ্ন স্থান পরিষ্কার করাইয়াছেন ও অনেকে এখনও পরিষ্কার করিতেছেন—ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। এইরূপে ক্রমশঃ গ্রামের যাবতীয় লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালন বিষয়ে সজাগ হইলে, ও সকলে আন্তরিকতার সহিত সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও তজ্জন্য গ্রামের প্রভূত মঙ্গল হইবে এরূপ আশা করা যায়।

সম্প্রতি শ্রীনিকেতন পল্লী সেবা বিভাগের চেষ্টায় রাইপুর গ্রামে একটি সমবায় পল্লী (স্বাস্থ্য) সমিতি গঠিত হইয়াছে।

লর্ড সিংহ বাহাদুর এই গ্রামের শিক্ষা-সংস্কার ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য বিশ্বভারতীর হস্তে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

Extract from the Report on Public Instruction in Bengal, 1924-25.

Unrecognised Institutions.

"At Santiniketan, Bolpur, Dt. Birbhum, the founder (Dr. Rabindranath Tagore) is attempting to combine the oldest Indian traditions with the best features of modern education. Santiniketan devotes considerable attention to the inculcation of religious and moral principles, manual and farm work, art, music, social service and self-help generally. The institution, which bears on every aspect of its work the impress of the culture, the spirituality and the idealism of its founder, values its independence of control as essential to its wotk. Without in any way surrendering that independence it has recently made arrangements to present such of its pupils as desire it at the examination of the University of Calcutta. A special feature of its work is the co-education of boys and girls, and its system of open air class work under trees. The visitor has something to criticise

and much to praise, but he will agree with wholehearted assent that its library is a scholar's joy, its spirit of unity an oasis of peace in a desert of jarring disharmonies, and that whatever the future may hold in store for it, Santiniketan has already achieved in three main directions, viz., its department of advanced oriental research, in which foreign savants have co-operated, its art school, under the direction of Mr. Nandalal Bose, and its village industrial and social service work, in which it has had the skilled assistance of Mr. Elmhirst.

(Supplement to the Calcutta Gazette, 24th December, 1925).

বিগত ১লা বৈশাখ শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রাহক পাঠক প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে বর্ষারম্ভের প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি। উক্ত দিবস প্রাতে পূজনীয় আচার্য্যদেব মন্দিরে উপাসনা করেন। তৎসঙ্গে যে চারিটি গান হইয়াছিল তাহা এবারকার সংখ্যায় প্রথমে স্থান পাইয়াছে।

বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে ও ৩০শে চৈত্র সন্ধ্যায় তিনি মন্দিরে উপাসনা করেন।

* * *

১লা বৈশাখ সন্ধ্যায় পূজনীয় আচার্য্যদেব আশ্রমের শিশুদের দ্বারা তৈরী একটি খড়ের ঘরের নাম করণ করেন। ঘরখানির নাম মুকুট। নামকরণ অনুষ্ঠানের পরে শিক্ষা সত্র ও শিশু বিভাগের ছেলেরা আচার্য্যদেবের মুকুট নামক অভিনয়টি করে। এই মুকুট নাটকটির ভাব লইয়া ঘর খানির নাম রাখা হয়।

নাটকটির ভিতরের কথা—যাহা জয় করিয়া পাওয়া যায় তাহাই মুকুট; এই ঘরটি তৈরী করিতে গিয়া ছেলেরা নিজেদের শক্তিকে লাভ করিয়াছে—তাহারা বলবান্ হইয়াছে তাহারা জয়ী।

* * *

আশ্রমের ছেলেদের উৎসব আদি উপলক্ষ্যে পরিবার জন্য একটি নূতন সজ্জা তৈরী হইয়াছে। ছেলেরা বিশেষ পার্ব্বনে ইহা ব্যবহার করে।

* * *

নববর্ষ উপলক্ষ্যে আশ্রমে কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্র লোক আসিয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাস নির্ম্মানের জন্য দশহাজার টাকা দিয়াছেন। ছাত্রাবাসটি নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়কে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

* * *

বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুর সম্প্রতি তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তক্ষশিলা নামে একখানি বাংলাতে। এই জাতীয় দুইখানি পুস্তক তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন নালন্দা ও বিক্রমশিলা।

তক্ষশিক্ষা, বিক্রমশিলা ও নালন্দা প্রাচীন ভারতের তিনটি বিখ্যাত বিশ্ব বিদ্যালয়। বর্ত্তমানে তাহার ধূলি লুপ্ত ভগ্নাবশেষের দুর্গম-

তার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কেবল প্রবেশ করিতে পারেন। সাধারণের প্রবেশ নাই। কিন্তু ভারতের প্রাচীন এই গৌরব-পীঠগুলি সকলেরই অবশ্য গন্তব্য। ফণীন্দ্রবাবু এই দুরূহ পথ তাঁহার পাণ্ডিত্যের বজ্রদ্বারা সুগম করিয়া স্খলিত চরণ শিশুদের জন্যও পথ করিয়া দিয়াছেন। বাল্যকালেই ছেলেদের উৎসাহকে ভারতের আদর্শের দিকে টানিয়া লইয়া লেখক দেশের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ভাষা স্বাতন্ত্র্যের দিনেও ফণীবাবুর লিখন রীতির (style) একটি বিশেষত্ব আছে—ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত সাহিত্য রসানুবোধ যোগ করিয়াছে। বাকি দুই খানি বই ইংরাজিতে নাম—Indian Colony in China ও Silpa Shastra, এই বই দুইখানি বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের Indian Teachers in China নামক বইখানি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এর পাঠ্য নিযুক্ত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় ধীরে ধীরে ভারতেও ভারতের বাহিরে যশ অর্জ্জন করিতেছেন।

*   *   *

গত ৭ই বৈশাখ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রচিত কর্ণমর্দ্দন যাত্রিকা নামে একটি গীতাভিনয় আশ্রমের অধিবাসীদের দ্বারা অভিনীত হয়। রচনা নীচুদরের হইলেও অভিনেতাগণ অভিনয় কৌশল দ্বারা যথাসাধ্য চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী রায়, শ্রীমনোমোহন দে, শ্রীবসন্তকুমার রায়, শ্রীসত্যজীবন-পাল, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী, শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

*   *   *

আগামী ২৬শে বৈশাখ হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত আশ্রম গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ থাকিবে।

*   *   *

আগামী ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপদ আচার্য্যদেব পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ করিয়া ছেষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিবেন। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে উৎসবাদি হইবে।

*   *   *

এই জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন পত্রিকার বিশেষ এক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ইহা বর্দ্ধিতায়নে আশ্রমের ও বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ বহন করিয়া ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হইবে।

*   *   *

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

পূরবী

নূতন কবিতার বই। "পূরবী", "পথিক" ও "সঞ্চিতা" এই তিন ভাগে মোট ৮৮টি কবিতা আছে। "পথিক" অংশের ৬১টি কবিতা ১৩৩১ সালে কবির বিদেশ ভ্রমণের সময় লেখা।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। উপহার দিবার উপযোগী। ডিমাই ৮ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা।

মূল্য—২৲ বাঁধাই—২৷৷৹

এণ্টিক কাগজ—২৸৹ ও ৩৷৹

গীতি-চর্চ্চা

সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত নূতন গানের বই। শান্তি-নিকেতন আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে ও অনুষ্ঠানাদিতে যে সকল গান গাওয়া হয়, সেই সব সংগ্রহ করিয়া ২০০ গান দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটি গান এবং বেদগানও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৬০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ৸৹ ও ১৲ টাকা।

সঙ্কলন

কাব্য গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করা "চয়নিকা" অনেক দিন বাহির হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোন বই এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। এইবার গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করা হইল। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। পূর্ব্বে কোন বইতে প্রকাশিত হয় নাই এমন লেখাও আছে।

ডবল ক্রাউন প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ১৸৵৹ ও ২।৹।

মায়ার খেলা

নূতন স্বরলিপির বই। মোট ৬১টি গানের স্বরলিপি আছে।

মূল্য—২৲ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

রাজর্ষি

নূতন বিশ্বভারতী সংস্করণ

"বালক" পত্রিকার প্রথম ছাপা ও পুরাতন সংস্করণগুলি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে, বিস্তারিত পাঠ পরিচয় সহিত প্রকাশিত হইল।

মূল্য—১৲ ; বাঁধাই—১।০

TALKS IN CHINA

A collection of lectures delivered in China, during the Far Eastern Tour of the Poet in April and May, 1924.

Demy 8vo, 157 pages, on Antique paper.

Price—Re 1 8

TALKS IN JAPAN

Will be out shortly.

প্রবাহিনী

নূতন গানের বই। "গীতগান," "প্রত্যাশা," "পূজা," "অবসান," "বিবিধ" ও "ঋতুচক্র" এই ছয় ভাগে বিভক্ত। মোট ২৩৫টি গান আছে।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মনোরম ছাপা। উপহারের বিশেষ উপযোগী। ডিমাই আট পেজি, ১৮০ পৃষ্ঠা।

মূল্য—১॥০, বাঁধাই—২৲

মোটা এণ্টিক কাগজে—২৲ ও ২॥০।

শবেপ্রগৃহ

নূতন নাটক। মাসি গল্পটি অবলম্বনে লেখা। মূল্য ॥৵০।

"গীতাঞ্জলি," "কথা ও কাহিনী," ও "শিশু"র নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 899.]

[৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

জন্মোৎসব সংখ্যা

শান্তিনিকেতন পত্র

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

উত্তরায়ণ

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই সংখ্যা আট আনা।]

[বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৩৩ সাল | ৫ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

প্রাণ যেমন দেহ দ্বারা ভাবও তেমনি রূপের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে। ভাব ভিতরের, রূপ বাহিরের। ভিতর ছাড়িলে বাহির থাকে না, আবার বাহির না থাকিলে ভিতরও কিছু নহে। তাই ভাব চায় রূপকে, এবং রূপও চায় ভাবকে। ভাব-হীন রূপ জড়, সেখানে স্পন্দন নাই, যেখানে স্পন্দন নাই সেখানে জীবনও নাই। ভাব হইতেছে প্রাণ বা আত্মা, আর রূপ হইতেছে দেহ। অনেকের দৃষ্টি কেবল দেহেই, রূপেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অতিক্রম করিয়া প্রাণকে, আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনেকের চক্ষু চিত্রের রেখাপাতটাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকে, তাহা ভেদ করিয়া ভাবের মহিমায় পৌঁছিতে পারে না। যাঁহারা এরূপ নহেন, যাঁহাদের দৃষ্টি দেহের ভিতর দিয়া, রেখাপাতের ভিতর দিয়া আত্মাকে, ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে তাঁহাদেরই উপলব্ধি উপলব্ধি। দেহকে দেখিতে পায় সকলেই আত্মাকে দেখিতে পায় অল্প লোকেই। চিত্রের রূপ দেখে অনেকে, ভাব বুঝে কয় জনে? যতক্ষণ আত্মার বা ভাবের অনুভূতি না হয় ততক্ষণ জ্ঞান অসম্পূর্ণ। দেহ বা রূপরেখা সৌন্দর্য্যসম্পদে চক্ষুর তেমন আকর্ষক না হইতেও পারে, কিন্তু আত্মা বা ভাব যে অতিমহান্ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও এই কথা। বিশ্ব-

ভারতী একটি ভাব। অবশ্য ইহার একটি রূপও আছে। কিন্তু রূপের সহিত ভাবকে অভিন্ন করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হইবে না। এখন ইহার যে রূপ দেখা যাইতেছে তাহা ক্ষুদ্র, কিন্তু রূপ ক্ষুদ্র হইলে ভাবকেও যে ক্ষুদ্র হইতে হইবে তাহার নিয়ম নাই। বস্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইবার উপর ভাব বা শক্তির ক্ষুদ্রত্ব বা মহত্ত্ব নির্ভর করে না। আজ ইহার যেরূপ আছে কাল তাহা না থাকিতে পারে। রূপের পরিবর্ত্তনেও ভাব অব্যাহত থাকিতে পারে। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর বদলাইয়া যায়, আত্মা থাকে একই। তাই ইহার রূপেরই দিকে আবদ্ধ থাকিলে হয়তো ইহার আধারটা শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে।

দেহের বন্ধন কষ্টকর, কিন্তু আত্মার বন্ধন যে আরো অনেক কষ্টকর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। দেহের বন্ধনে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় না। আত্মার বন্ধনে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দেহের বন্ধন যে উপেক্ষণীয় তাহা নহে, কিন্তু আত্মার যে বন্ধন, যাহাতে মানুষ পশু হইতে বসে, তাহা যে ছেদন করিতেই হইবে তাহাতে যেন ভুল না হয়।

রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানের তপস্যায় নিমগ্ন হওয়ায় যখন আমাদের বন্ধনের ছেদন না হইয়া ক্রমশই নূতন-নূতন বন্ধনের সৃষ্টিই হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ; বন্ধনে-বন্ধনে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিশেষ-বিশেষ গণ্ডীর প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমাদের দেশ যখন মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিবার শক্তিপর্য্যন্তও হারাইতেছিল ; বিশ্বের জন্য ভারতের যে ভারতী—যে বাণী একদিন অমৃতবর্ষণ করিয়াছিল, নিজের বলিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমান থাকিলেও রাগ, দ্বেষ ও মোহে জর্জ্জরিত হৃদয় লইয়া দেশের যখন তাহার দিকে কর্ণপাতও করিবার অবসর হইতেছিল না ; সেই দুর্দ্দিনে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধীরে-ধীরে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ভারতের পূর্ব্বঋষিরা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাহাই ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিল—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"। আত্মীয়তার এমন একটি নির্ম্মল আসন পাতিতে হইবে যাহাতে সমগ্র একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে ; মানুষ যেখানে মানুষের সহিত অবাধে আনন্দে মিলিতে-মিশিতে পারিবে ; যেখানে মিলনের মধ্যে দেশ, কাল, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, মত, বিশ্বাস, সম্প্রদায়-প্রভৃতির উপাধিগুলি কোনোরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না ; যেখানে বিশ্বের দান বলিয়া দিবার ও লইবার উভয়েরই পথ সুগম হইবে ; যেখানে চিন্তা বিশ্বের সহিত ভারতের যোগেই, বিয়োগে নহে ; কার্য্য যেখানে বিশ্বকে গ্রহণ, বর্জ্জন নহে ; এবং যেখানকার কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণ, মৈত্রী বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি বিশ্বের শান্তি।

ইহাই বিশ্বভারতীর ভাবমূর্ত্তি। ইহা পরম মধুর, পরম সুন্দর, পরম কল্যাণ। ইহা প্রত্যেকেরই সাধ্য, সিদ্ধ করিয়া কেহ কাহাকেও ইহা দিতে পারে না। ইহা নিজ-নিজ অনুভবের বিষয়, দেখাইবার বিষয় নহে।

রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া এই আশ্রমেই ইহার স্ফুরণ। কিন্তু ইহার সীমা নাই, অন্ত নাই, ইহা কোথাও আবদ্ধ নহে, তা

শান্তিনিকেতনেই হউক বা অন্যত্রই হউক। ইহা বাঁধা যায় না, বাঁধিতে গেলে বিকার আসিবে। আত্মার বন্ধন হইলে তার স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। এই ভাবমূর্ত্তিময়ী বিশ্বভারতী প্রত্যেক ভাবুকের হৃদয়ে, দেশে, দেশান্তরে, দূরে, দূরতরে।

বিশ্বভারতীর রূপমূর্ত্তি শান্তিনিকেতনে, ভবিষ্যতে স্থানান্তরেও হইতে পারে, (তাহাও হউক!) এবং তাহা ভিন্ন রকমেরও হইতে পারে। এই রূপমূর্ত্তি স্বভাবতই তাহার ভাবমূর্ত্তির ও ভারতের অনুরূপ। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন তাহার একদিক্, অপরদিক্ হইতেছে ভারতের বাহিরের বিদ্যাগুলির যথাসম্ভব অনুশীলন। যাহা বিদ্যা—কল্যাপ্রসূ, বিদ্যা বলিয়াই তাহা শ্রদ্ধেয় ও অনুশীলনীয়, তা তাহার উদ্ভব ভারতের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক। একথা বিশ্বভারতীর রূপমূর্ত্তির সম্মুখেই উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। অতীতে ভারতের বহির্ভাগে বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইলেও কালবশে যে সমস্ত বিদ্যা অস্পষ্ট বা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, বিশ্বভারতীর রূপমূর্ত্তি সেই সকলকেও উপেক্ষা করে নাই। রূপ বাহ্য উপকরণ অপেক্ষা করে, এবং সেইজন্যই তাহা পরায়ত্ত। তজ্জন্য আজ যাহা সম্ভব না হওয়ায় রূপের বিকলতা আছে, আশা করা যায়, ক্রমশ তাহা সম্ভব হইবে এবং তাহা দ্বারা সেই বিকলতা অপনীত হইবে।

সন ১৩২৫ সাল, ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিন বিশ্বভারতীর প্রথম সূচনা, এবং পর বৎসর ১৩২৬ সাল, ১৮ই আষাঢ় তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যারম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ আরম্ভোৎসবের ব্যাখ্যানে সর্ব্বশেষে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান বর্ষবৃদ্ধি উৎসব উপলক্ষ্যে তাহাই উল্লেখ করিয়া এই লেখাটি শেষ করি—

"বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব। কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েচে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়র আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে। অতএব অনন্দ করা যাক্, মঙ্গল বাজনা বাজিয়া উঠুক। একান্ত মনে এই আশা করা যাক্ যে, এই শিশু বিধাতার অমৃত বহন করে এনেচে, সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।"*

কাল কি ইহার কিছুই সাক্ষ্য দেয় নাই?

---

* শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ, পৃঃ ৩।

রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নিজে যে-সব মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটীই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও নাই। এই-জন্য কোন কোনটির সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইতেছে তাহাই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

আমার লেখাটা রবীন্দ্রনাথকে সার্টিফিকেট দেওয়ার মত হইয়াছে। লেখাটার অন্য কোন গুণ না থাকিলেও উহার এই হাস্যকরতা উপভোগ্য হইবে।

তাঁহার "বালক" দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যে, উহা তিনি যে-সব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণে উহা "ভারতীর" সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাণ্ডার", "সাধনা" এবং "বঙ্গদর্শনের" ও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং উহা কিরূপ কাগজ ছিল, সে বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জ্ঞান থাকিলেও, আমার নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক্ কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা গুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজ খানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গীর ছাপ অনুভূত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত।

ইহার একটা কারণ, এই, যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজ খানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা-

করি তাহা ঠিক্ শুনিয়াছি ও ঠিক্ মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব সুধরাইয়া দিতেন; তাহাতে হয় ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে "সাধনা"য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিম বাবু ও রবি বাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন, যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া "মানুষ" করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতা-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজ গুলির সম্পাদক-রূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দেশ ত কার্য্যতঃ করিয়াইছেন, অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লেখকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল "প্রবাসী"র "সংকলন" বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সার সংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদ গুলি তাঁহার হাতে পৌছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ ত খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সংকলন কার্য্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই, যে, কোনো কাজকেই ড্রাজারী (Drudgery) বা গাধার খাটুনী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

আমার এই লেখাটা "গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ" 'উল্লেখযোগ্য" "মৌলিক প্রবন্ধ" নহে; সুতরাং দু একটা বাজে কথা ও এখানে বলা চলিতে পারে। সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইবার জন্য আমি কিছু কিছু বিলাতী কাগজ কিনিতাম বটে, কিন্তু অনেক কাগজ পাইতাম আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রয়াগনিবাসী বামনদাস বসু মহাশয়ের নিকট হইতে। পুরাতন খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র কিনিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা তাঁহার একটি বাতিক ছিল। তিনি পাঠানদের দেশে থাকিতে একবার দশমণ পুরাতন খবরের কাগজ কিনিয়া তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ কাটিয়া খাতা বোঝাই করেন। এই কর্ত্তিত প্রবন্ধগুলির ওজন হইয়াছিল আড়াই মণ। বদ্‌লী হইবার সময় তিনি এই আড়াই মণ জিনিষও ভাড়া দিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তৎসমুদয় তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ রচনার কাজে লাগিয়াছে। এলাহাবাদের চৌকের নিকটবর্ত্তী গুধড়ী বাজারে সকল রকম পুরাতন জিনিষ পাওয়া যায়। সেখান হইতে বসু মহাশয় বিস্তর পুরাতন বহি ও ইংরেজী মাসিক কাগজ কাগজ কিনিতেন। মাসিক কাগজ গুলি বাক্সবন্দী হইয়া "প্রবাসী"র জন্য আসিত। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলন বিভাগের

ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটা কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিন্‌গুলির ক্রমাধোগতি—তাহাতে আর আগেকার মত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিকপত্র সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিম্বা তাঁহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্ত্তি করিয়া বাহির করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানা রকম প্রবন্ধ গল্প কবিতা সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাঁহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এই জন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিয়মিত রূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এরূপ সঙ্কল্প তিনি কখনও করিয়াছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু করিলে তাহা ব্যর্থ বা বিন্দুমাত্রও অশোভন হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত ম্যাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাল্কা রকমের দুএকটা কথা বলি। যখন "সাধনায়" "ক্ষুধিত-পাষাণে"র গল্পটি পড়িয়াছিলাম, তখন সেই মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তাহার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে কি যে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি যাহার মুখ দিয়া গল্পটি বলাইতেছিলেন, সেই লোকটি কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়ায় অনতিক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। সে রাত্রে ঘুম হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। বিনি পয়সার ভোজ যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়ি, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়াটোলার লেনের একটি বাড়ীতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অতিমাত্রায় হাস্যরসোন্মত্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্ত্রীদিগের দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা-সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তখন উহার আফিস ছিল ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ভবনে। ঐ আফিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনও আছে।

নিজের মাসিক পত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অন্য যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এবিষয়ে তিনি খুব মুক্তহস্ত। মাসিক পত্রের লেখক রূপে

তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিস্তির জন্য কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা কিম্বা ২রা তাঁহার লেখা ডাকে আসিয়া পৌঁছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য্য, সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা বড় এলোমেলো ও খামখেয়ালী বলিয়া তাঁহাদের একটা বদনাম আছে। কিন্তু রবিবাবু কবি কিনা সে বিষয়ে কোন কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর গবেষকের সন্দেহ থাকিলেও, মাসিক পত্রের খোরাক জোগান সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিন্দা করা চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহার সময়নিষ্ঠা অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার আর একটি কারণ এই, যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্য-রস থাকে। যাহা হউক, সুখের বিষয় সম্পাদকের কাজ তিনি কখন কখন করিয়া অন্যের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক বরাবর নিজের শক্তি ক্ষয় করেন নাই। কারণ সম্পাদকের কাজ প্রতিভাশালী মনীষীদের কাজ নহে, শ্রমপটু সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দ্বারাই উহা চলিতে পারে। ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩।

রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা নামে যে প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনের' গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন সেটা পড়ে দুচার জায়গায় আমার ঠেকলো।

ফণীবাবু বলছেন—প্রথমে কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন সুরু করিলেন। হ্যাভেল সাহেবকে আমি গুরুতুল্য মনে করি কিন্তু ব্যাপারটার আন্দোলন তিনি সুরু করেন না বলতে আমি একটুও ইতঃস্তত করবোনা কেননা আমি জানি কোথা থেকে কি হল।

হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলে আসার পূর্ব্বের কথা হচ্ছে তিনি মান্দ্রাজের আর্ট স্কুলটাকে দেশী শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত করে তুলেছেন। কলিকাতার সে সময়ের কথা রবিকাকা মহাশয়ের 'বালক' বলে পত্র 'সাধনা' বলে পত্র এবং চিত্রাঙ্গদা বলে কাব্য তিনি চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলার কল্পনা করে আমাকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের আর্ট স্কুল ও আর্ট ষ্টুডিও দুই স্থান থেকেই ইঙ্গবঙ্গ ছবি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেতোনা। আর্ট গ্যেলারীতে বিলাতী ছবিই দেখা যায় দেশীয় ছবি একটি নেই। সেই সময়ে স্বপ্নপ্রয়ানের ছবি ঈশ্বরী প্রসাদ বলে এক হিন্দুস্থানি কারিগরেব দ্বারায় লিথোগ্রাম করে সাধনাতে দেওয়া হল। এবং রবিকাকার উপদেশ মতো বৈষ্ণব কবিতা সমস্ত পড়ে আমি দেশীয়ভাবে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা সুরু করে দিলেম। সেই সময় রবিবর্ম্মার একসেট্ ছবি সব প্রথম রবিকাকার কাছে দেখি এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে আমার হাতে বিলাত থেকে ওদের সাবেক প্রথায় আঁকা একটা আল্‌বম এবং দেশী শিল্পীদের আঁকা আর একটা ঐরূপ আল্‌বম আমার হাতে পড়ে। এই শেষোক্ত দেশীয় চিত্র সংগ্রহ দেখে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর চিত্রশালা একটি প্রবন্ধ লেখেন ও রবিকাকা সেটি সাধনাতে প্রকাশ করেন, সাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় সূত্রপাত এইভাবে হ'ল। তোমরা শুনে অবাক্ হবে কৃষ্ণলীলার কুড়িখানা ছবি শেষ করতে তখন আমার পুরো এক বৎসর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যার সময় রবিকাকার খামখেয়ালী মজলীসে সংগীত সাহিত্য কাব্য ও নাটক এরি চর্চ্চা, এই যখন চলেছে নিয়মিতভাবে বলতে পারো অনিয়মিত ভাবে তখন এলেন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতায়। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্টস্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয় আমি কোনো কালেই আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইনি আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় আমার কৃষ্ণলীলার ছবি নিয়ে এবং সেই সূত্রে মোগল শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ করে তাঁরি সাহায্যে আমার ঘটলো সেইজন্যই আমি তাঁকে বলি আমার

গুরু কিন্তু হ্যাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন collaborator বলেই স্নেহ করে কখন বা বলতেন chela। বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন বাংলার আর্টিষ্ট সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কতদিন—তারপর ভারতশিল্পের নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী কুমার স্বামি, উডরফ সাহেব হ্যাভেল সাহেব এবং Indian Society of Oriental Art দেখা দিলেন পরে পরে। হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হয়ে চলে যাবার পরে যখন একা আমি ছাত্রদের এবং আমার জনকতক ইংরাজ বন্ধুদের নিয়ে আমাদের আর্টের সঙ্গে আর্টিষ্টদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় ফিরছি এবং গর্ভমেন্টের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আর্ট স্কুলের বাহিরে এসে পড়েছি সে সময়ে শান্তিনিকেতন এতটুকু একটি টোল বা পাঠশাল মাত্র। আমি একদিকে চলেছি রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে। Oriental Art Societyকে সম্বল করে চলতে চলতে একটা দিন এমন এল যে দেখলেম আমি যে ভয়ে আর্ট স্কুল ছেড়ে বা'র হলেম সেই ভয়ই গর্ভমেন্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন Art Society আর্টিষ্ট পাখি পোষার একটা খাঁচারূপে পরিণত করে দিয়ে গেল।

ঠিক এই অবস্থায় পৌছবার পূর্ব্বে রবিকাকার অভয় এল আর্টিষ্টদের জন্য 'বিচিত্রা' ভবন সৃষ্টি হ'ল কলিকাতায়। তার পরের কথা শান্তিনিকেতনের আলো আর বাতাসে ঘেরা আর্টিষ্টদের জন্যে দেশের বুকে ছোট্টবাসা বাসা—রবীন্দ্রনাথের দান ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের জন্য! তাঁহার পঞ্চষষ্টিতম বৎসরের উৎসব শুধুতো ছবি নিয়ে নয়—কবিতা নাটক আর্টের যে আর তিনটে দিক সঙ্গীত তাও নিয়ে—এটা ফণীবাবু কেমন করে ভুলে বসলেন তাতো বুঝলেম না। *

---

* ফণীন্দ্রবাবুর উল্লিখিত প্রবন্ধটি এই উপলক্ষ্যে লিখিত নয়।

সম্পাদক।

ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সব যুগে আর সব জাতের মধ্যে দেখা যে নিছক ব্যাকরণিয়াদের সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের যে ধারণা বিদ্যমান সেটা একটা বিশেষ মিশ্রবস্তু, তাতে শ্রদ্ধা বা প্রীতির চেয়ে অবজ্ঞা, করুণা আর প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ভয়ের ভাগই বেশী থাকে ব'লে মনে হয়। অবজ্ঞা এইজন্য যে কিছু সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করা তাদের সাধ্যের অতীত; করুণা, কারণ ব্যাকরণিয়া ভাষার ছোবড়া নিয়েই ব্যস্ত তারা সাহিত্যের রসের উপভোক্তা হবার শক্তি

রাখে না,—তাদের কাছে সাহিত্যের মূল্য কেবল এই জন্যেই যে ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের উদাহরণ যোগায় ব'লে 'সাহিত্য'কে এই দুই শাস্ত্রের 'সহিত' পড়া চলে ; আর ভয় এইজন্যে যে ব্যাকরণিয়ারা ভাষার নাড়ী-নক্ষত্র আর তার আইন-কানুন সব জানে, তারা অনায়াসেই লেখার দোষ দেখিয়ে দিতে পারে আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তিতে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারি না। ব্যাকরণিয়া যেন সাহিত্যনগরীর পাহারাওয়ালা। এই নগরে চলা-ফেলা ক'র্‌তে হলে কি তার বড়ো-সড়কে আর কি তার গলি-ঘুঁজিতে যাতায়াতের নিয়ম মেনে চলা চাই—এই পাহারাওয়ালা সারাক্ষণ পাশে র'য়েছেন তালিম দিতে, তা মিষ্টি গলায়ই হোক্, আর হুম্‌কি দিয়েই হোক্। সাহিত্যের নগরের সহজ নাগরিক যারা নয়, যারা সাহিত্য বিষয়ে জানপদ, যারা অজ্ঞানতার জন্য এই নগরীর বিধি-নিয়ম ভাঙতে খুবই পটু সেই রকম 'গাঁওয়ার' লেখক বা সাহিত্যিক-মন্যেরা এই পাহারাওয়ালাদের জন্য বড়ই অস্বস্তি বোধ করে। আর অন্য সাধারণ লোক যারা সাহিত্যের হাটে খালি মজা দেখ্‌তে চায়, তারাও অনেক সময়ে এই পাহারা-ওয়ালাদের টিক্‌টিক্ করাটা পছন্দ করে না। অনেক জায়গায় আবার ব্যাকরণিয়া অনাবশ্যক বড়ো বেশী চীৎকার করে। তার আইন-কানুন যে মাঝে-মাঝে বদলানোর দরকার সে খেয়াল তার থাকে না, আর কতদূর পর্য্যন্ত তার এলাকা সেটাও সে নিজে ভালো রকম জানে না।

আগেকার যুগের ব্যাকরণিয়রা যে বিদ্যাটুকু নিয়ে আসর জমিয়ে এসেছে, দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক কালে জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণিয়দের আর খালি সে বিদ্যাটুকুতে আঁটুছে না। দুপাত সংস্কৃত ব্যাকরণ প'ড়ে—তাও আবার অত্যন্ত আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাবে—বাঙলা-ভাষার দরবারে মোড়লী করা আর সম্ভব হ'চ্ছে না। যেমন খালি লাটিনের আর গ্রীকের ওস্তাদ হ'য়ে ইংরিজি ভাষায় আজকাল আর অপ্রতিহত-ভাবে রাজ্য-শাসন করা চলে না। বৈয়াকরণকে এখন ভাষাতাত্ত্বিক হ'তে হ'চ্ছে ; খালি পুরাতন ভাষার বা আর্ষ ব্যাকরণের নজীর দেখিয়ে তার বাড়ী নিয়ে আস্ফালন কেউ মান্‌তে চায় না। আধুনিক ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে যাঁরা কিছু ব'ল্‌তে চান, তাদের গুরু-মশাই-গিরী ছেড়ে এখন আধুনিক জীয়ন্ত ভাষার রীতি নীতি নিয়ে অনুশীলন করতে হবে,—এর গতি এর নিয়ম সব বা'র ক'র্‌তে হবে। তাঁদের এখন নিজের ভাষার সব তল্লাটের খবর রাখ্‌তে হবে, কেবল ভাষা-সরস্বতীর উদ্দণ্ড চৌকিদার হ'য়ে সাহিত্যিক আর পাঠকের মনে ব্যাকরণ-বিভীষিকা জাগিয়ে তুল্‌লে চলবে না। সমগ্র সাহিত্য-নগরীর বা ভাষা-বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিজে জেনে, সাধারণ অব্যবসায়ীদের মুখ্য কথা-গুলি সহজবোধ্য সুখবোধ্য ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তাদের নিজের ভাষা আর তার গতি, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার সাহিত্যের বিশিষ্টতা আর বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আর এই নবীন রীতির ব্যাকরণিয়াদের দ্বারা তাদের চোখের সামনে ধ'রে দেওয়া ভাষার নিয়ম বা

সূত্রগুলির সার্থকতা উপলব্ধি ক'রে চ'লতে পারে।

বাঙলা-ভাষা এখনও সাবেক কালের এই সব চৌকীদার ব্যাকরণিয়াদের হাত থেকে পূরোপুরি নিষ্কৃতি পায় নি। এঁরা এখনও 'পৃষ্ঠ' না লিখে 'পৃষ্ঠা' লিখলে আপত্তি করেন—'পরিষৎ-মন্দির,' 'পাশ্চাত্য' 'সৃজন,' 'সহায়ক,' 'অন্তর্যামী,' 'নিস্তেজ,' 'রজকিনী,' 'বিবরণী,' 'স্বর্গীয়,' প্রভৃতি বাঙ্‌লার পদ দেখ্‌তে পেলে এঁরা এখনও বাঙ্‌লা ভাষার দুরবস্থার কথা ভেবে আকুল হন, আর কেউ কেউ বা আবেগের ভরে কবিতাও লিখে ফেলেন। এই সব ব্যাকরণিয়াদের হাতে বাঙালী শিক্ষিত লোকে ইস্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ আর ছেলেদের শাসনের ভারটা অর্পণ ক'রে দিয়ে, ভাষা-বিষয়ে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছে, আর নিশ্চিন্ত মনে এত দিন ধ'রে যেমন শব্দ বা ভাষা সাধারণ জীবনে সে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত সেই রকম ভাষা বা শব্দ সাহিত্যেও ব্যবহার করে আসছে—সংস্কৃত অভিধানের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার তার ফুরসৎও নেই. ইচ্ছাও নেই। চৌকীদার ব্যাকরণিয়া মাঝে মাঝে 'বে-আইনী হ'লো!' ব'লে চেঁচালেও সে-কথা কেউ মান্‌ছে না—ইস্কুল-কলেজের 'পা শা র্থী' পড়োদের কেউ কেউ ছাড়া।

বাঙ্‌লা-ভাষার রাজ্যে এখন বহু বিষয়ে অরাজকতা চলছে। এখানে শৃঙ্খলা আনা চাই। কিন্তু এ বড়ো কঠিন কাজ। প্রথমেই তো দেখা যায়, বাঙ্‌লার বানান-সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নেই। 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ যেগুলি ভাষায় আমদানী করা হয়েছে আর যেগুলি নিজেদের মূল সংস্কৃত রূপ অনেকটা অক্ষুণ্ণ রেখেছে (তা উচ্চারণেই হোক আর কেবল বানানেই হোক্‌,) সেগুলি নিয়ে কোনও গোল নেই। সেগুলি বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত বানানই বজায় রাখ্‌বে। 'অর্দ্ধ তৎসম' অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে বার করে নেওয়া আর তার পর বাঙালীর মুখে বিকৃত হয়ে যাওয়া শব্দ নিয়েও তেমন ঝঞ্ঝট নেই; এগুলিকে আমরা প্রায়ই উচ্চারণ অনুসারে বানান করি: যেমন 'কেষ্ট, নেমন্তন্ন, চন্নামের্ত্ত, চক্কত্তী, ভট্‌চাজ, শীগ্‌গির, মোচ্ছব, ইত্যাদি। কিন্তু যত গোল হয় 'তদ্ভব' অর্থাৎ প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পাওয়া, অর্থাৎ কিনা খাঁটী বাঙলার শব্দে আর রূপে। বিদেশী শব্দের সম্বন্ধেও আমাদের কোনও শৃঙ্খলা নেই। যাঁরা 'কাজ' শব্দকে অন্তস্থ 'য' দিয়ে, বা 'সোনা' শব্দকে মূর্দ্ধন্য 'ণ' না দিয়ে লিখ্‌লে ভাষার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হলো মনে করেন, তাঁরা অম্লানবদনে—আর অকম্পিত করে—দন্ত্য 'স' দিয়ে 'সাধ সরম সহর,' লেখেন, তালব্য 'শ' দিয়ে 'শোওয়া' লেখেন, আর মূর্দ্ধন্য 'ষ' দিয়ে 'জিনিষ' লেখেন। সংস্কৃত ব্যাকরণিয়াদের হাতে প'ড়ে বাঙ্‌লার প্রাকৃতজ তদ্ভব শব্দগুলি তাদের বানানের ইতিহাসকে ভুলে গিয়েছে; এ-সব বিষয়ের সমাধান করতে গেলে, ব্যাকরণের খুঁটী-নাটী আলোচনা করে যাঁরা আনন্দ পান এমন বাঙালীর বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাস আর তার আধুনিক কালের হালচালের সম্বন্ধে ঠিক খবর জানবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ভাষার ঠিক স্বরূপটা নির্ণয়

হ'লে তবে তার সম্বন্ধে নিয়মাবলী করতে পারা যাবে।

বাঙলা-ভাষার ব্যাকরণ অনেক লেখা হ'য়েছে, কিন্তু তার সবগুলিই হচ্ছে সংস্কৃতের আওতায় বেড়ে ওঠা আধুনিক সাহিত্যের 'সাধুভাষা'র ব্যাকরণ। বাঙলার ভাষা-তত্ত্বের আলোচনায় যেটুকু কাজ হ'য়েছে তাও নগণ্য। বিদেশীরা যা কিছু একটু এ বিষয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রবার কালে ক'রেছেন। বাঙ্লা-ভাষীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে বাঙ্লাব্যাকরণ প্রকাশ করেন ('গৌড়ীয় সাধুভাষার ব্যাকরণ') এই বইয়ে রামমোহন তাঁর অনন্য সাধারণ সহজ সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। বাঙ্লা ভাষার শব্দ-সাধন বল্‌লে বাঙালী ব্যাকরণিয়ারা বুঝ্‌তেন ভাষা-গত সংস্কৃত শব্দের সাধন,—খাঁটী বাঙ্লা, তদ্ভব শব্দ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চাই-তেন না—বাঙ্লার ঠিক রূপটী কি সে বিষয়ে সাধারণতঃ কোনও ধারণা তাঁদের না থাকায়। ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর বাঙ্লাব্যাকরণে এই বিষয়ে আলোচনা করেন, আর খাঁটী বাঙ্লার শব্দ আর প্রত্যয় নিয়ে 'ঐতিহাসিক আলোচনা' করেন, তাদের উৎপত্তি আর বিকাশের সূত্র বার করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু আধুনিক কালের কথিত বাঙ্লা-ভাষার আলোচনায় কতকগুলি মৌলিক প্রসঙ্গ বাঙালীর কাছে প্রথম উত্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্তব্যগুলি ১২৯৮ সাল থেকে বা'র হ'তে থাকে, সেগুলিকে 'শব্দতত্ত্ব' নাম দিয়ে আলাদা বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হ'য়েছে; পরে দু-একটী লেখা—যেমন বাঙলা তির্য্যক্ রূপের উপর—'প্রবাসী' পত্রিকায় আর অন্যত্র বেরিয়েছে। কোন্ পথ ধ'রে বাঙ্লা-ভাষার চর্চ্চা করতে হবে তা এমন করে তাঁর আগে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। আধু-নিক মতে ব্যাকরণের তিন অঙ্গ—১। উচ্চারণ-বানান-ছন্দ, ২। সুপ-তিঙ্-কৃৎ-তদ্ধিত শব্দসাধন আর ৩। বাক্যরীতি। এর মধ্যে উচ্চারণটাই এক হিসাবে সব চেয়ে বেশী দরকারী জিনিস—উচ্চারণের পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষায় বিভক্তি ও প্রত্যয়ও বদলায়, ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙলার উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি সাধারণ কথা—এত সাধারণ কথা যে সেগুলি আমরা আগে লক্ষ্যই করি নি—রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেন। বাঙ্লার উচ্চারণের আর বাঙলার ধ্বনি সমষ্টির ইতিহাসের সব চেয়ে বিশিষ্ট কতকগুলি সূত্র বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন (তাঁর 'বাংলা উচ্চারণ,' 'টা টো টে,' 'স্বর-বর্ণ অ' 'স্বরবর্ণ এ,'—১২৯৮ আর ১২৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে)। কি কোল, কি দ্রাবিড়, কি আর্য্য,—আধুনিক কালের সমস্ত ভারতীয় ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৩০০ সালে প্রকাশিত 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে বাঙলা ভাষায় ব্যব-হৃত এইরূপ শব্দের একটী পূর্ণ সংগ্রহ দিয়ে-ছেন,—আর এইরূপ শব্দ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটুকু তাঁর কবি-

মনের কাছে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা তিনি ব্যক্ত করেছেন। ভারতের আর কোনও ভাষায় এই রকম শব্দের এর চেয়ে ভালো আলেচনা আছে কিনা জানি না। পরে ১৩১৪ সালে স্বর্গীয় আচায্য রামেন্দ্র-স্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'ধ্বনি-বিচার' নামে এক উপাদেয় আর বহু বিচার পূর্ণ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও খুঁটিয়ে আলোচনা করেন। তেম্‌নি রবীন্দ্র-নাথের 'বাংলা শব্দ-দ্বৈত' (১৩০৭ সাল) 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮) 'সম্বন্ধে কার' (১৩০৫) আর 'বাংলা বহুবচন' (১৩০৫) প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য আলোচনা আছে। বীম্‌সের বাঙলাব্যাকরণ সমালোচনা উপলক্ষ্যে (১৩০৫ সালে লেখা) বাঙলার উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মূল্যবান্ মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রেছেন; আর তার 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে বাঙলার কতকগুলি সাধারণ-কর্ত্তৃক অলক্ষিত বিশেষত্ব পরিষ্কার ক'রে দেখানো হ'য়েছে।

বাঙলা-ভাষার চর্চ্চায়, বাঙলার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ লেখক, আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তা-নেতা যে পথ দেখিয়েছেন—যে কথিত ভাষার পূর্ণ আলোচনা বিনা কোনও ভাষার ব্যাকরণ বা ইতিহাস লেখা হ'তে পারে না—সেইটেই বাঙলার ব্যাক-রণ আর ইতিহাস আলোচকের পক্ষে এক-মাত্র পথ। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা কেবল উপলব্ধি দ্বারা হয় না, একে প্রতিপদে বাঙ্ময় বস্তুকে উচ্চারিত শব্দকে আশ্রয় করে চ'ল্‌তে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর অধ্যয়নের আর চিন্তার বহু প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। এই বিদ্যার আলো-চনায় যে পরিশ্রম আবশ্যক তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবেই তো তিনি তাঁর সহজ-বুদ্ধি-প্রসূত ভাষার স্বরূপবোধকে বিজ্ঞানের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত ক'রে দেখাতে পেরেছেন। তিনি স্পষ্ট ক'রে বাঙালীকে ব'লেছেন যে 'প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটা স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে, এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যোগ্য লোকের উৎসাহ হওয়া উচিত।' স্থতরাং ভবিষ্যৎ বাঙালী ব্যাকরণিয়া, যারা গুরু-মশাইগিরী ত্যাগ ক'রে 'শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত' এ পথে চ'ল্‌বেন, তাঁদের সকলকেই রবীন্দ্রনাথ একজন 'পথিকৃৎ' আর 'পূর্ব্যঃ ঋষিঃ' ব'লে মেনে নিতে হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা ভাষাতত্ত্বকে উপজীব্য বিদ্যা করে নিয়েছি, যারা এর অন্ধি-সন্ধি গলি-ঘুঁজিতে ঘোরা-ঘুরি ক'রছি, আর তার মধ্যকার ধস্‌না আর ঢিবি খুঁড়ে দেখবার চেষ্টা ক'রছি আমাদের এই স্থপ্রাচীন ভাষানগরী এই স্থবিরাট্‌ সাহিত্যপুরী আগে কি অবস্থায় ছিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে এই নগরীর কাব্য-দর্শন-ইতিহাস-রূপকর্ম্ম প্রভৃতির নোতুন নোতুন সব বড়ো সড়কের সঙ্গে পরিচয় রাখবারও চেষ্টা ক'রছি,—জীবনের আর সাহিত্যের রসের দিক্‌টাকে বর্জ্জন করে একেবারে নিছক্‌ ব্যাকরণিয়া ব'নে যাবার প্রবৃত্তিও আমাদের যাদের নেই—আমরা যদি এ

বিষয়ে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করি যে, যিনি বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা তিনিই এ-বিষয়ে আমাদের অগ্রণী, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়া, তা হ'লে আশা করি আমাদের সেই আত্মপ্রসাদটুকু সকলেই ক্ষমা করবেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় ও তাহার বিশেষত্ব

শ্রীসত্যজীবন পাল

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম বঙ্গের এক নির্জ্জন কোণে ৺মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের একটী বীজ বপন করেছিলেন। তারও অনেক আগেই কবির মনে শিক্ষার একটী রূপ গড়ে উঠেছিল ("শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধ—১২৯৯এ লিখিত।) এই যে প্রতিষ্ঠানটীর জন্ম হলো তার রকমটী চারিপাশের শিক্ষা প্রণালী হতে ভিন্ন। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে যে ব্যবধান শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক তা'কে ঘুচিয়ে দিয়ে বৃক্ষছায়াতলে গুরুশিষ্যের মধ্যে জ্ঞানের মিলন সূত্রস্থাপনের প্রচেষ্টা সুরু হলো, অধ্যাপক এখানে শিষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তিকে বেতের আঘাতে ফুটিয়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন ক'রে, পরস্পরকে জানার হৃদয়কে স্পর্শ করে মিলন ঘটিতেছিল। এটা হয়েছিল কি উপায় সেইটি আজ বোঝা দরকার।

আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে সব বিষয়েই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চল্‌ছে। শিক্ষা বিজ্ঞানেও সেইরূপ নানা পরীক্ষা চলেছে। শান্তিনিকেতনের পরিসীমার মধ্যে কবি শিক্ষকরূপে নানা পরীক্ষা চালাচ্ছেন। নিজে বা অন্য অধ্যাপকদের দ্বারা তিনি বহু চেষ্টা করেছেন ও করাচ্ছেন। এই সব এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের মধ্য দিয়ে চল্‌ছে বলে এখানে শিক্ষাপ্রণালী মৃত যন্ত্রে পরিণত হয় নাই—প্রাণময় হয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলায় প্রায় নয়শ' উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাযন্ত্রের চাপে যে ছাঁচে মানুষ তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে এখানে তাহ'তে মুক্ত হয়ে শিশু নানা দিক্ দিয়ে জীবনকে বিকশিত কর্ব্বার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার আনন্দ এখানে মুক্তির মধ্য দিয়ে সহজ প্রাপ্য বলে সংযমের বন্ধন এখানে তাদের পীড়িত কচ্ছে না। নিয়মের সীমার মধ্যে খেলা করে তারা সবল হয়ে উঠ্‌ছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়ছে বলে বোধ করে না ; তা ব'লে অন্যদের চেয়ে এরা কিছু কম শেখে না। যাতে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মিলন এখানে ঘট্‌তে পারে সেজন্য কবির চেষ্টা প্রথম হতেই কবির কথায় "শিক্ষাকে জীবন যাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ে গড়া কৃত্রিম সামগ্রী

করে তুলতে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়।" আরও বলেছেন "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অর্থাৎ প্রাণ প্রকৃতির ও মন প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় অঙ্গরূপে যেন গ্রহণ করতে পারে।" (শান্তিনিকেতন—শ্রাবণ ১৩৩২)

খোলা হাওয়ায় ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এখানে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি অনেক আশ্রমেই এখন এইরূপ ব্যবস্থা হয়েছে। দিনে ছয় সাত ঘণ্টা ঘরের ভিতরে পাঠাভ্যাসে শিশুর দেহ মন নিপীড়িত হচ্ছিল। এখানে সহরের বায়ুর ও সমাজের মলিনতা হ'তে দূরে থাকাতে শিশুর দেহ ও মনের বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হচ্ছে। প্রকৃতির মধ্যে খেলা করে শিশু সবল ও সুস্থ হয়ে উঠছে। যারা রোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তারাও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আশ্রমে প্রথম থেকেই কবি বিশেষ ক'রে চেষ্টা করেছিলেন যে ছাত্রেরা যেন কতকগুলি খবরের বোঝা মাথায় করে নিয়ে ক্লিষ্ট না হয় বাইরে যাকে বলে ক্লাস সে বস্তুটা এখানে অজ্ঞাত ছিল। গুরুর কথা শোনবার জন্য ছেলেমেয়েদের ঝুঁকে পড়তো। বুদ্ধির দিক দিয়ে জানা তাদের সমান না হলেও অনুভূতির মধ্য দিয়ে বোঝা তাদের ভাব রাজ্যের সম্পদের দ্বার খুলে গিয়ে শিক্ষা যথার্থ হয়ে উঠতো। এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। প্রতিদিনের জীবন যাত্রার মধ্যে তারা যে ভাবের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলছে তা প্রকাশ পায় তাদের সাহিত্য সভায়, হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকায় ও নাট্যআবৃত্তি প্রভৃতিতে। ইস্কুলের তিনটা বিভাগ শিশু, মধ্য ও আদ্য। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য সভাব বৈঠক হয়। সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে ফুলমালা দিয়ে শোভা বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে সভাপতি বা সভানেত্রী বানিয়ে তারা প্রবন্ধ, কবিতা গল্প প্রভৃতি লিখে পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি, গান ইত্যাদি করে নিজেদের বিভাগের ছেলেমেয়েদের বা প্রতিবেশীদের আনন্দ দান করে। প্রতি সন্ধ্যা এই সব নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাতে মাঝে মাঝে পূর্ণিমাতে গান বাজনা হয়। প্রত্যেক বর্গের ছেলেমেয়েরা মাসিক পত্রিকা নিজেরাই সম্পাদন করে বের করে। তাতে ছবিও থাকে। এর দু'চারিটী বাস্তবিকই সুন্দর হয়। এসব কাজে এদের এত উৎসাহ যে এর জন্য অনেক বই পড়ে। সেজন্য পুস্তকালয় প্রায় সর্ব্বদাই খোলা। শ্রীযুত নন্দলাল বসু মহাশয়ের মত শিল্পীও ছোটদের নিজে হাতে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেন।

বাংলা নাট্যের মধ্য দিয়ে এরা আত্মপ্রকাশের সুন্দর সুবিধা পায়। নাট্য ও আবৃত্তির জন্য সাজ পোষাক সংগ্রহে ও সাজবার জন্য তারা কলাভবনের সাহায্য পায় বটে কিন্তু এর মধ্য দিয়া অনেক জিনিষ তাদের জানা হয়ে যায়। দুই একটী ইংরাজী নাট্য করেও তারা ইংরাজী সাহিত্যের রস গ্রহণের চেষ্টা করে।

পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য কবি ছেলেদের নিয়ে কত খেলাই না করে-

ছেন। তার ভিতরে নানা প্রকার পরীক্ষায় তিনি প্রত্যেকের মনটাকে চিন্‌তেন আর পেতেনও। কারণ সত্যিকার চেনা হচ্ছে পাওয়া। খেলা ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যে পরিচয় ঘটে তা অপূর্ব্ব। এসব বনভোজন, তাঁবুতে বাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বালকের সঙ্গে বহিঃ প্রকৃতির যোগ স্থাপিত হয়। মনের শক্তি তার প্রাণশক্তির সহিত তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চল্‌বার সুযোগ পায়। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের স্পন্দনকে মিলিয়ে দেবার সুযোগ ঘটিয়েছে এই স্থানের প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্যের বিশালতা। গাছতলায় ও মাঠের খেলার হর্ষ তাদের জীবনকে মধুময় করে তুলেছে।

এই ছেলেমেয়েদের শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। বাগান করা (ফুলের ও তরকারীর) মিস্ত্রীর কাজ, ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ প্রভৃতি ছেলেরা করে। মেয়েরা সেলাই, রন্ধন করে আশ্রমের সকলকে খাওয়ান, নাট্যের জন্য সাজ পোষাক তৈরী প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকেন। বাহির হ'তে দেখ্‌লে তারা লেখাপড়ার সময় পায় না মনে হয়। কিন্তু যেমন করেই হোক তারা পড়াশুনায় পেছনে প'ড়ে থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রে তাদের জানা কিছু কম হয় না কারণ সত্যিকার জানা হচ্ছে কিছু করতে পারা ;—আর এ ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু কর্‌তে পারে।

আশ্রমের ছেলেরা ব্রতী কার্য্যের দ্বারা সেবার সুযোগ পাচ্ছে। নানাপ্রকার সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বালকদিগের বিকাশের সহায়তা করাই ব্রতীবালক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। শরীর ও মনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে প্রস্তুত করা হচ্ছে। "বয় স্কাউট" দলে সেবার চেয়ে সামরিক ভাবের আদর্শ বড় হয়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা। কিন্তু বিশ্বভারতী ব্রতী বালকেরা পল্লীসেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষালাভ কর্‌ছে। অন্যের সাহায্যের নিমিত্ত শরীরকে কর্ম্মক্ষম কর্‌বার জন্য ধাবন, উল্লম্ফন প্রভৃতি ক্রীড়া, রোগী শুশ্রূষা, অগ্নিনির্ব্বাপন, জলমগ্নের উদ্ধার ও জীবনদানের চেষ্টা প্রভৃতিতে এরা অভ্যস্ত হচ্ছে। প্রতি বৎসর বড়দিনের ছুটীতে দূরে গিয়ে তাঁবুতে বাস করে' কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলির (প্রায় ২৪ মাইল দূরে) মেলায় সেবকের কাজ করে' তারা শক্তি সঞ্চয় করে। জঙ্গল ও ডোবা পরিষ্কার, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার, মশক ধ্বংস প্রভৃতি অনেক কাজ গ্রামের ব্রতী-বালকেরা কর্‌ছে। একদিনের মধ্যে বার তের বয়স্ক ব্রতীবালকরাও বত্রিশ মাইল পথ হেঁটেছে। এতে বোঝা যায় এদের শক্তির কিরূপ বিকাশ হয়েছে। লোকালয়ের সঙ্গে এই সম্পর্ক ক্রমে আরও গভীর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা। দুই বৎসর যাবৎ ব্রতীকার্য্যের প্রতিযোগিতায় আশ্রমের ছেলেরাই বিজয় পতাকা লাভ করেছে।

ছেলে মেয়েদের চালনা ও শাসনশক্তি বিকশিত কর্‌বার জন্য আশ্রমের নিয়ম পালন, বিচার, শাসন, ক্রীড়া, আহার্য্য অতিথি-সেবা, দরিদ্রভাণ্ডার, নৈশ-বিদ্যালয় চালনা প্রভৃতি ব্যবস্থার ভার তাদের উপরই দেওয়া হয়েছে। নারী ও শিশু বিভাগের আহার্য্যের ব্যবস্থা মেয়েরা করেন বড় ছেলেদের আহার্য্য ব্যবস্থা ছেলেরা করে থাকে। খাদ্যদ্রব্যগুলি যাতে ঠিক

ভাবে রান্না হয়, কোন জিনিষের অপচয় না ঘটে, সকলকে যথাযথ ভাবে পরিবেশন করা হয় সেজন্য তাদের মধ্য হতে প্রতিনিধি ও কর্ম্মী নিযুক্ত হয়। এরা অতিথিদের সমস্ত আশ্রম দেখায় ও বুঝিয়ে দেয়।

দোষের জন্য এরা বিচার সভা ডাকে। ছেলেদের নির্ব্বাচিত বিচারকেরা বিচার করে শাস্তি দেয়। দোষী যাতে হৃদয়ে ব্যথা পেয়ে, লজ্জিত হয়ে শোধরাবার সুবিধা পায় সেটাই শাস্তির লক্ষ্য। সুতরাং শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা নাই বললেও চলে। অধ্যাপক ও সঙ্গীদের নিকট প্রশংসা ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য দোষ ক্ষালনের জন্য তারা প্রয়াস পায়। ক্রীড়া বিভাগও তাহাদের নির্ব্বাচিত অধিনায়কেরাই পরিচালন করে। দেশী বিদেশী খেলা ও শারীরিক ব্যায়াম তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। নিয়ম পালনের জন্য অধ্যাপকদের বেশী কিছু দৃষ্টি দিতে হয় না। এই লক্ষ্যের জন্য তাদের নির্ব্বাচিত অধিনায়ক নিজের বিভাগ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহন করে।

মাসে একবার "আশ্রম-সম্মিলনীর" (ব্যবস্থা সভার) অধিবেশন হয়। তাতে আশ্রমের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী একত্র হয়ে আশ্রম কি ভাবে চলছে কোন কোন দোষ দূর করা প্রয়োজন এসব আলোচনা করে নতুন নতুন ব্যবস্থা করে; যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহার উত্তর দেয়। ইহা প্রতিনিধি সভা দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত বিভাগের প্রতিনিধি ও অধিনায়কগণ ইহার সভ্য। ছাত্র পরিচালকগণ (অধ্যাপক হইতে নির্ব্বাচিত) অনেক সময় প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকেন। এইরূপে আশ্রমের পরিচালন কার্য্যে ছেলেদের স্বরাজ দেওয়া হয়েছে। এতে কেউ কখনও ক্ষমতার বিশেষ অপব্যবহার করেছে বলে শোনা যায় না। এইরূপে তাহাদের সমষ্টিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার অভ্যাস তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

আশ্রমের সহিত আমার যোগ অল্প দিনের। কাজেই বাহিরের জগতের সহিত এর পার্থক্যটা আমার চোখে বিশেষ করে পড়েছে। বাংলার অন্য ছেলে মেয়েদের চেয়ে এরা বেশী লাভ কচ্ছে, এতে এদের জীবন সব দিক দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠছে!

সব চেয়ে বড় লাভ এই যে এখানকার সবাই প্রায় সুস্থ সবল ও আনন্দ পূর্ণ। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার যে বাঙ্গালী ছেলের নিরানন্দের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এখানকার আবেষ্টন থেকে দূরে রয়েছে।

শান্তিনিকেতনের ছেলেরা একটু ডেঁপো বলে পরিচিত। তার কারণ হচ্ছে জীবনের স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ না করার চেষ্টা এদের মধ্যে নেই। এরা বাইরে গিয়েও ভয়কে চেনে না, গুরুজনকে এরা ভয় করতে জানে না কিন্তু শ্রদ্ধা করে।

নারী বিভাগটী আচম্‌কা এখানে গজিয়ে উঠে নাই। অধ্যাপকদের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই অধ্যাপকের কাছে পড়তে সুরু করেছিল। সতের আঠার বছর আগে ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে পাঠ সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন পিতা মাতার দু চারটী মেয়ে এসে জুটলো। তখন থেকেই নারী বিভাগের সূত্রপাত। প্রায় পাঁচ বছর আগে

এই বিভাগটী নতুন করে গঠিত হয়েছে। বাড়ীতে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে থাকে। এখানে ছেলেদিগকে মেয়েদের জগত হতে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখলে তাদের জীবন নারীর প্রভাব থেকে দূরে থেকে একপেশে হয়ে পড়তো।

ছাত্র-জীবনের পর বাস্তব জীবনে নারীর সম্মুখীন হ'লে সে উপযুক্ত ব্যবহার কর্‌তে ও পারতো না, নিতেও জান্‌তো না। মেয়ে ও সেরূপ পুরুষের সম্মুখে সর্ব্বদা আড়ষ্ট থেকে জীবনী শক্তিকে হ্রাস করে ফেল্‌ছিলো। একসঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জান্‌বার ও বুঝবার সুবিধা হয়েছে। এতে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জীবন সংযত হবার সুবিধা পাচ্ছে। নারী বিভাগটী ছেলেদের বিভাগগুলি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে ছেলেদের অযথা প্রবেশ অধিকার নেই। অথচ জ্ঞানের ও উন্নতির সমস্ত দিকেই তাদের পরস্পরের সাহচর্য্য চল্‌ছে।

আর একটী বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। ছন্দের মধ্য দিয়ে মানবের ভাবরাজিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে কবিতা ও গান মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে তাকে সজাগ করে তোলে। এই শিক্ষা জগতে মানুষ এখন মেনে নিচ্ছে। কবি এই জিনিষটী প্রথম হতেই অনুভব করেছিলেন তাঁর জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে। ছন্দের মধ্যে মানুষ আত্মাকে প্রকাশ করেছে। সভ্যতার ইতিহাস এরই দ্বারা উন্নতির অবস্থা বোঝা যেতে পারে।

ভারতের অতীত গরিমার অনেক বস্তুই এখানে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হচ্ছে। গীত বাদ্যের পর নৃত্যও আরম্ভ হয়েছে। এতে ছন্দের পূর্ণতাকে আমরা ফিরে পাব। নৃত্যকলার প্রয়োজনীয়তাকে জাতীয় জীবনের অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ কোন ক্ষেত্রেই অপূর্ণতাকে রেখে ব্যক্তির বা সমষ্টির জীবনে মঙ্গল লাভ করা যায় না।

একজন বৈদেশিক কলাবিদের মুখে শুনতে হয়েছে "ভারতীয় ছেলেমেয়েদের সুর তালের বোধ নেই।" বোধ হয় কথাটা এই হবে যে তাদের এই বোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা হয় নাই। এখানকার ছেলে মেয়েরা নাচ, গান বা বাজনা সুন্দর রূপেই শিক্ষা কর্‌তে পার্‌ছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে তিনি এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যা কিছু করেছেন তাহা সম্পূর্ণ পুথির উপর নির্ভর করে করেন নি। বিজ্ঞানের দোহাই তাঁর কাজের মধ্যে নেই। শিক্ষা দানকেও তার জীবনের জিনিষ করে 'আর্ট' এ পরিণত করেছেন।

দেখে অবাক হতে হয় যে কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা ক্ষেত্র যে সব নতুন এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ হয়েছে কবি অনেক পূর্ব্বে সে সব নিজ হাতে পরখ করে দেখেছেন।

আবার সেখানকার অনেক জিনিষ প্রয়োজন মত গ্রহণ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

আমাদের শিক্ষার যথার্থ রূপটী তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ধারাটী তাঁর জীবনের বিকাশের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। মাতৃ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা, অট্টালিকার

অচলায়তন হতে শিশুকে বাইরে নিয়ে প্রকৃতি মায়ের বুকে ছেড়ে দেওয়া—এইসব আয়োজন শিশুকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে, শিক্ষাকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে। সুতরাং মনে হয় ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেছিলেন আজ তাহা ফুলে ফলে আপনাকে ধন্য করে তুলছে। এর স্বাদ গ্রহন করবার জন্য দেশ বিদেশ হতে সুধিগণ এসে মিলিত হচ্ছেন। সমস্ত পৃথিবী যে শিক্ষার এই রূপটী গ্রহণ করে ভারতের সাধনা বিশ্বে জয়যুক্ত করবে তার আর বেশী দেরী নেই।

কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালাচাঁদ দালাল

বঙ্গের কবি-সম্রাট্ রবি তুমি যে ঠাকুর যথার্থই,
ভক্তিভরে যুক্তকরে তোমার চরণে প্রণত হই।
সাধু যশস্বী ঋষি তপস্বী মানবের হিতে সতত রত,
ঘাত প্রতিঘাতে বাধা উৎপাতে অটল পালিতে জীবন-ব্রত।
বিশ্বে তোমার বিশ্বভারতী অতুল কীর্ত্তি করে প্রচার,
লুপ্ত ভারত-শিল্প-কলার তুমিই করিলে সমুদ্ধার।
কল্পনাতে নহ ত তুষ্ট হৃষ্ট সাধিয়া প্রকৃত কাজ,
উচ্চ উদার হৃদয়ে তোমার মহৎ লক্ষ্য করে বিরাজ।
জ্ঞান-কর্ম্মের ক্ষেত্ররূপে গড়িলে শান্তিনিকেতন,
প্রেমের প্রথায় মিলালে সেথায় দেশ-বিদেশের মনীষিগণ।
যশ অপযশ চাহ না ত তুমি স্তব বন্দনে উদাসীন,
তুচ্ছ করেছ উচ্চতম পদ—পদবীতে আস্থাহীন।
রূপে গুণে জ্ঞানে কবিতা ও গানে কোনোদিকে তুমি নহত কম,
যত কিছু বলি ব্যর্থ সকলি তুমি অকথিত ওগো অনুপম!
ভাষা-মহিমায় কবি প্রতিভায় করিলে ধরাকে চমৎকার,
ধন্য ধন্য কবি তোমার প্রভাব দেশে দেশে আজি সুবিস্তার

মহাকবি

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

বঙ্গের গগনে তুমি সহসা কেমনে
সম্রাটের সমারোহে উদিলে হে কবি,
ছিল নাকো যবে ভারতের কুঞ্জবনে
একটিও ক্ষুদ্র খী বরিবারে রবি।
কে পারে বলিতে মোরে কেমনে এ বঙ্গে
শক্তিহীন নির্জ্জীবতা চারিধারে যবে,
ছিঁড়িয়া নিশার বক্ষ মেঘ মন্দ্র রবে
সমুদ্রের বন্যা-বেগে, তরঙ্গে তবঙ্গে

হে কবি-সম্রাট, ভাসাইয়া দিলে গানে,
ছড়াইঁয়া দিলে তুমি আকাশে আকাশে,
দেশ দেশান্তরে রয়েছিল যত প্রাণে
হৃদয়ের কথা যত, অব্যক্তে আভাসে।

জানি শুধু জাগি উঠে প্রেম-জয়ধ্বনি
যেথায় গানের তব ছোঁয় স্পর্শমণি।

To Gurudev
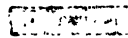
G. Tucci

I feel very troubled to day because I realize that I cannot express what I have in my heart. Nature has been really cruel towards me; while she has granted me the possibility of listening with the ear of my soul to the most sublime and sweet harmonies, she has not granted me the power of expressing this lyrical world though the magic of art.

To have the soul of a poet and yet to lack the gift of poetry it is really a tragic destiny.

Nobody perhaps is more unhappy than those who could give but cannot give.

What is the use of this ineffable music which is dancing to the rhythm of heavenly tunes, in the secrecy of my heart, when my lute is obstinately dumb ?

To-day, Gurudev, I would be a poet like yourself, in order to

express to you what I feel. But I myself do not know what I experience in my heart towards you, no word can say it better than: *Bhakti*; it has in fact the ineffable expressiveness of the undefined.

To day my voice ought to be a heavenly voice, as yours is. But it is only a human voice, a poor voice. It is not poetry but humble prose, not song, but mere words.

I am a scholar, Gurudev, and sometimes scholarship is a hindrance to poetry.

Yet only one thing is of some comfort to me; and it is this that if man does not always understand the language of Gods, Gods always understand that of men, and beyond the words they discover what is hidden in the heart's core.

Do read in my heart, Gurudev and you will find there what is not in my words.

What I must say is not the common wishes that habit teaches us and convention imposes on us.

I am not the right man for this; I am a real rebel against any convention and never am I so happy as when I can do what is contrary to common belief.

I must confess that since my childhood I have always been very angry when I receive, on my birthday letters containing the good wishes of my relations or of my friends and I am proud of never having sent such a letter to anybody. Moreover how is it possible to offer you the common good wishes that everybody expresses to everybody else?

What is general does not befit you, Gurudev.

Let the small men send their good wishes to small men.

But to you!

And what can we wish to you?

Nothing. Because the wings of your poetry and the message of love that you have sung to the world have carried you beyond the boundaries of time.

Poetry and music are beyond time; because they are the voice of the eternal Truth. The Poet transcends the limits of the finite in time and space, eternally living in the eternal Beauty and in the eternal Truths which have revealed themselves through the rapture of his art.

Wish presuppposes a limita-

tion, but no wish where there is perfection

No wishes therefore; but rather thanksgiving and prayer; thanks giving for what you have already given to us, prayer for what you must still give us.

Gurudev's Birthday.

V. V. Gokhale

The pure joy of music is more fully and sweetly received, when the melody is heard from a distance rather than when it is sung or played before our eyes. I have often felt perplexed over whether the innocence of childhood is to be preferred to the wisdom of old age, whether the weird joy of unconscious play should be more enjoyable than the consciousness of self-delight. Be that as it may, there is no mistaking the law of intoxication which irresistably sets the wayfarer on, to seek out the master-musician playing on his flute in the insecure distance, even at the risk of getting strayed and of having to resign too, the charm of the unknown that quivers around a distant melody. Even so has the innocence of childhood to speed through the wild hunt of youth to meet the player of its own beloved tune, face to face and to find in him when it can, its "life's comfort, mind's delight, soul's rest." The child comes, as the Upanishad would say "crossing over the boundary of death," and it purposes to attain immortality through the wisdom" of old age. If childhood comes like a flower, waving the banner of its conquest over non-birth, it still seeks to grow into its fruit, which offers itself to be, not like the flower, only smelt from a distance and nursed tenderly, but to be tasted and restored to the 'Joy that created it,' because it has grown within itself the seed of

immortal life and passed beyond the danger of death and unfulfilment.

To-day on the eve of Gurudev's sixty-sixth birthday, what may I speak about him? I feel him to be so near and yet so far away. And I also feel so small and ashamed of myself to write something about him, because nearness may dazzle and distance grow sightless. You might as well stand very close to the very tallest tree in the S'al grove and try to do a picture of its whole stature. The greater part of it rising above your head will be more and more missed till the top-most boughs which are of its newest growth remain in their blameless obscurity, beyond your ken. And yet those high extremities represent what it has through the toil and garnering of years sought to attain, what it has through wind and storm conspired to live for, the fulfilment of its life's Sadhana. They alone have deserved the honour of being crowned with the golden rays of both sunrise and sunset, and alone see the glow of the rising east and the fiery west heading towards the darkness of night. I do not pretend to have seen them, although one may speak and speak and delude oneself into a pretender. And I have a notion that for understanding, not to speak of judging, those whom we call great, you require men equally great, if not greater, for the very simple reason that one cannot mount upon one's own shoulders and that, in terms of mathematics, the part cannot be equal to, still less greater than, the whole. Nevertheless, the sense of pursuit which, in man, expresses itself in idolatry, helps him to reveal his personal idealism and art, although it may not be true representation of the universal and transcendent reality, in asmuch as the image reflected in a mirror answers to the planeness or the crookedness of its surface.

* * *

"I have always fought and shall again fight as often as it may be required, against superstition and unreason": I have often heard Gurudev saying this with much feeling and self-confidence. And it implies a message never more truly needed than now. The time-spirit demands that we surrender and surrender quickly to pure reason and to "the

supreme light of the Sun that guides our knowledge." Even our next door, things are happening that must shake the sturdiest optimist. Who does not feel the dagger of dispair piercing one's heart, as one hears the din of mad revolt raised by the brute in man all the world over, against his good sense and self-control? What has he been so long labouring to build up and where to is he now heading? When will the savage and the stupid in man cease to dominate him; when will man be truly the '*manasvin*' the thinker? One does not love to think of the terrible reality of death that awaits him if he cannot stop the play of a diseased mind. Like an ostrich one would hide the head in the smooth sands of abstract idealism in the fond hope of not being seen by that which it does not see. But who can hope, standing and living among weeds of clumsy dogmatism, binding the feet of all adventure, and poisonous plants of prejudice and narrow sentiment, to brave the dangers seeking to swallow mankind in one great gulp and to justify and assert the law of truth that is its boast of having represented and preserved ever since its coming to birth Humanity is still like a firefly, because it carries its lamp behind the back, which not only fails to light its path of progress but throws instead, a long shadow of its own grossness on the track. The fire is still behind; it will not, as in our funeral custom, march in the front and guide, till the gross in him dies and is borne to be consumed to the flames of the sandal-pyre. If "knowledge, truth and delight of the Infinite" be the eternal reality, to think of it, to speak of it and to realise it in action, is the sole debt mankind owes to it; and I do not know of a man, who, in our days has expressed himself more deeply and more sincerely than beautifully, more Gurudev. There can be no compromise with ignorance; and the impervious growths of silly faiths and irrational beliefs have to be uprooted with a bold hand yet not violent, with a thoroughness that does not hurt the tender root of a new birth, with a fineness not sacrificed to finery, with love, not blind. Among such as are gifted with the power

of doing this, Gurudev comes first to my mind.

He calls himself a mere poet. And those who "uncovered the face of truth, concealed behind the golden plate" when it first dawned on humanity, were poets too. Poetry does not flow till 'wine' is first poured up-to the brink and then overflows the cup of sense and emotion. Poets, it is truly said, are the "lords of word-creation"; because poetry is the final word which conquers the inexpressible. So long as speech bears the value of standard coin on the exchange of the human mind, men shall have enough need of poets to teach them and lay bare the *Satya-dharma* the law of truth, which is each time newly-found. And Gurudev has always been the precursor of new thought, and the bard of creative idealism.

How shall we receive him on this day that embraces both the destroyer and the creator in him ? The sun which to our eyes is bending towards the western horizon, is yet waking up into the eastern dawn of hope, the hearts beyond; and the waning moon yet waxes for the airy realms behind her. May this birthday be the day of birth in 'the airy realms' within us, of the morning glory, blest by the hand of *Rudra* who "leads from the unreal to the real, from darkness to light, from death to immortality"

Gurudev's Birthday

Lim Ngo Chiang

The approach of the sixty-sixth birth-day of the Poet, which the whole ashram is keenly anticipating, not only fills me with joy, but it also brings to me the ever-recurring memory of the Poet's visit to China in the spring of 1924.

The 8th of May 1924 will always be remembered in the history of Modern China as distinctly mark-

ing a revival of Indo-chinese cultural union, when the leading Chinese people in Peking celebrated Gurudev's sixty-fourth birth-day and christened him with a chinese name.

The Chinese name "Chu Chentan" as proposed by Prof-Liang Ch'i-Ch'a fully expressed what the chinese thought of the significance of the Poet's mission to China. In these three words. brief as they are, the whole story of Indo-chinese relationships from the earliest time to the Poet's visit, are very tersely and vividly summed up. For "Chu" was the name applied to India by Chinese in ancient time, which was also frequently used as first-name by the early Indian Buddhist who visited China. This word being correspondent to the word "tu" as it appears in one of the oldest books, means sincerity and wormth. A more appropriate name it would be difficult to find for naming a country which, despite the obstacles of mountain and desert, delivered to China a message of love and truth. As for "Chen tan" a name used by the early Indians for China, which originally might be "Chin-szu-tan" (stan or sthan, a place), the land of Chin, has become "Chen-tan", indicating where the sun rises as well as the thundering morning. What ever it was it was a complimantary term the Indians gave to China. Just as the people of Japan could not have found a better name for their own country than "nippon" (jih-pen), the origin of the sun or Land of the Rising Sun.

In the presence of Dr. Tagore, his personality, his achievement and the message he was delivering to them, the Chinese saw the unity of the best wishes of both countries. The memory of the good old days, when a peaceful and beneficial intercourse was actively carried on between India and China, was for the time restored through the personal touch of the poet-philospher. They celebrated his birth-day, and wished that he might live long. For his birth is a blessing to humanity. In his great love for his own country and for China lies the hope of a better day for both of these countries. In the Poe'ts Chinese name is written the story of the glorious past and the fervent hope of the

future of two of the greatest nations in Asia.

Mencius said that in five hundred years there would appear a "Wang-Che" or Kingly man. This "wang-che" or King among men, may be one who actually wears a crown, studded wlth precious stones, and wields a sceptre wrought in gold. Or, he may he a great man, like Confucius, whose regal throne is established in the hearts of his fellow beings and the laurel on whose brow is won by service and love, and not by right divine or otherwise.

In the estimation of Mencius great men do not appear too often. And this is truly said. From Kings Yao and Shun to King Tang there was an interval of over five-hundred years, during which the country was not blessed with a "Wang-che", from King Tang to King Wen there was another period of over five hundred years; and from King Wen down to the birth of Confucius intervened similarly five-hundred years and more. Rabindranath Tagore was received by the Chinese as nothing less than a "Wang-che" or kingly man. For does he not teach, even as Confucius taught his disciples in "letters, ethics, devotion soul and truthfulness (Lun-yu, Confucian Analects)"? Has Dr. Tagore not travelled from one country to another preaching as he went, even as Confucius travelled throughout the ancient states of China, offering them his panacea, that men might be restored to their original goodness?

How many of the poets of China, even in the glorious Tang dynasty, with its nests of singers, can be compared with Tagore; who combines in himself the qualities of a sage, a seer and a singer? To the three claims upon our affection and regard, is added a fourth—he hails from the Land of the Buddhas.

Chinese Admirers of Rabindranath.

The Oversea Chinese Association of Calcutta are going to present a purse to Rabindranath on the occasion of the 66th anniversary of his birth-day in token of their love and admiration for the Poet Philosopher of India.

ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী

আমি অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছিলাম পূজনীয় গুরুদেবের গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এই উৎসবের অবসরে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সকলেই জানেন আমাদের মধ্যে সঙ্গীত ও গীত এই দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে। এই দুইটি শব্দকে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে অর্থ ভেদ বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। যেখানে স্বরই প্রধান ভাবে থাকে তাহাকে বলে সঙ্গীত, আর যেখানে ভাবের প্রাধান্য থাকে স্বর কেবল ভাবেরই অনুসরণ করে তাহাকে বলে গীত।

তর্ক শাস্ত্রের মত সঙ্গীত শাস্ত্রেও লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য মানে শুধু গান অর্থাৎ কথা। লক্ষণ মানে রাগ ও তাহার নিয়মাদি অর্থাৎ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে কলার উন্নতি হইতে পারে না। এস্থলে সন্ধি প্রকাশ রাগের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ধরুন পূরবী, ইহাতে কোন স্বরের প্রাধান্য রাখিতে হয়, কোমল ঋ ও কড়ী মধ্যম কি পরিমানে ব্যবহার করিতে হয়। বাদী ভেদে রাগ ভেদ কি প্রকারে করা যাইতে পারে এইরূপ সমস্ত নিয়মগুলি কলাবিৎ না জানিয়া, সহস্র রকমের তান দিন না কেন ও যত প্রকারে হউক হাহাকার করুন না কেন তিনি কিছুতেই ভাল শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত।

রাগের নিয়ম একত্র করিয়া গ্রন্থন করাকেই গ্রন্থ সঙ্গীত বলে। চৌসট্টি কলার মধ্যে লোকের মনোরঞ্জন করিতে সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু রঞ্জকতায় রুচি ভেদ অনুসারে সঙ্গীতেরও নানা ভেদ হইয়াছে। নানা রুচি অনুসারে তাহাকে আসরে নামিতে হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন সঙ্গীত আজ প্রায় নাম-শেষ অবস্থায় উপনীত, আর সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদগণও হেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। যেমন এখন আর শব্দকল্পদ্রুম ও বাচষ্পত্য অভিধানে চলে না, অজস্র শব্দ, ভাষায় নূতন নূতন প্রবেশ করিতেছে বলিয়া নূতন অভিধানেরও দরকার। তেমনি সেই প্রাচীন মান্ধাতার আমলের রাগরাগিণীই স্থির ভাবে টিকিতে পারেনা নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিবেই। লোকের রুচি যেমন যেমন বদলাইতেছে সঙ্গীত ও সেই রুচির অনুগামী বলিয়া বদলাইতে থাকিবে। এই বদলের কর্ত্তা কাল। তবে এক কথা যে এই পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্গীতজ্ঞগণকে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। আকবরের দরবারে

তানসেন যে সব রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ সব বিষয়ে কোন গ্রন্থ বা স্বরলিপি না থাকায় বর্ত্তমানে অশিক্ষিত ওস্তাদের মধ্যে মতভেদ থাকা মারাত্মক নহে।

তারপর মুসলমান্ আমল হইতে সঙ্গীতে এক মস্ত ভূল থাকিয়া গেল যে ভাবে ও সুরে মিল হইল না। তাহার প্রধান কারণ মনে হয়—আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল না বলিয়া তাঁহারা গানে ভাব দিতে পারেন নাই। ভাব ও সুর সূর্য্য ও রৌদ্রের মত পরস্পর অবিযুক্ত ভাবে থাকিবে।

আজকাল কলাবিদ্গণ সবদিক সামলাইয়া চলিতে পারেন না। শ্রোতারা হয় তো দেখিতে চান ভাব ও সুর এক সঙ্গে মিলিল কিনা আর ওস্তাদ চলিলেন ঠিক তাহার উল্টা পথে, সে জন্য আমাদের প্রায় ওস্তাদের গানে রাগের ও ভাবেতে মিল নাই। ধরুন আশাবরী করুণ রস প্রধান রাগিনী, কিন্তু তাহাতে আদি রসের অনেক গান আছে। পরজের সুরটি কেহ যেন ডাকিতেছে এই ভাব সূচিত করে কিন্তু ঐ রাগে "কারী কারী কমরিয়া" অর্থাৎ হে গুরু আমার কালো রঙের কম্বল দাও প্রভৃতি এই ভাবের প্রাচীন ওস্তাদী গান রহিয়াছে। ইহাতে রাগ ও ভাবের মিল নাই। কিন্তু উপর্য্যুক্ত ঐ দুই রাগে পূজনীয় গুরুদেবের আশাবরীতে "নিশিদিন মোর পরাণে" আর পরজে "ডাকো এ নিশীথে" এই গান দুইটির তুলনা করুন, এখানে রাগে ও ভাবের মিলন অপূর্ব্ব। এরূপ শত শত গানে তাঁহার ভাব ও রাগের ঐক্য বিরাজমান।

ভাবুক সঙ্গীত গায়ক বৈষ্ণবরা ভাব দিতে পারেন কিন্তু সুর দিতে পারেন না কারণ তাঁহারা সুরের বৈচিত্র্য শিক্ষা করেন নাই। আমি যত প্রকার কীর্ত্তনাদি এদেশে শুনিয়াছি তাহাতে ধানশ্রী কানাড়া জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগের গান শুনা যায়।

পূজনীয় গুরুদেবের প্রাচীন ব্রহ্ম-সঙ্গীতে বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীর অনেক গান আছে আবার নূতন গান গুলিতে নূতন নূতন সুর অনেক আছে। যাহা ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত। কর্ণাটক অঞ্চলে মুসলমানের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই সেখানে যাহা শুনা যায় তাহা দেব দেবতার স্তুতি, অন্য ভাবের বা রসের গান নাই কাজেই তাহাও অসম্পূর্ণ। আর কেবল (ওস্তাদের) সুরের গান অসম্পূর্ণ। অতএব ভাব রস সুর তাল প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ গান যদি কাহারো থাকে তাহা পূজনীয় গুরুদেবের। আজ না হউক দুদিন পরে আমাদের এই গান সকলেরই অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে। কাজেই পূজনীয় গুরুদেব শুধু যে সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্ত্তক তাহা নহে তিনি সঙ্গীতেরও নবযুগ প্রবর্ত্তক। সাহিত্য ও সঙ্গীত দুইটি এক জিনিস হইলেও কদাচিৎ ইহাদিগকে একত্র দেখা যায় কিন্তু ঐ দুইটি পূজনীয় গুরুদেবে বর্ত্তমান্। তাহার নিদর্শন উল্লেখ করা বাহুল্য।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-সম্বন্ধে দু'একটি কথা

শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ

যিনি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন বাল্যকালের শিক্ষার প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। Jesuit শিক্ষকগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন বালকের শিক্ষার ভার তাহাদের হাতে দেওয়া হইলে তাহারা সেই বালকের জীবন এমন ভাবে গঠন করিতে পারেন যে পরে তাহার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। কথাটা অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই কিন্তু মিথ্যা নহে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রণালীর মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমে দরকার রবীন্দ্রনাথের বাল্য জীবনের শিক্ষা দীক্ষা কি ছিল তাহা জানা।

রবীন্দ্রনাথ এক দিকে তাঁহার সময়ের স্কুলের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা কোন উপকার পান নাই; অপর দিকে তিনি যে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন অল্প লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া থাকে। পর পর তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ে যোগ দেন; কিন্তু তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় কেহই তাঁহাকে বোঝেন নাই। সেখানকার শিক্ষা তাঁহার হৃদয়-স্পর্শ করিত না; অথচ সেই বয়সেই সাহিত্য তাঁহার বিহার ক্ষেত্র ছিল। যে বই পাইতেন পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই পড়িতেন। কিন্তু স্কুলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। পরে যিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন স্কুলে থাকিতে তিনি কোন দিন কোন প্রাইজ পান নাই। একবার বাংলা পরীক্ষায় তিনি অকস্মাৎ খুব বেশী নম্বর পাওয়াতে তাঁহার শিক্ষকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; এবং তাহাকে কড়া পাহারায় দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিতে হইল। সেই বারেও তিনি অনেক নম্বর পাইলেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বাংলার শিক্ষকের চোখ যে ফুটিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। মোট কথা স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের কোনই যোগ ছিল না। শৈশবে দাস রাজতন্ত্রের আমলে খড়ি-আঁকা গণ্ডির ন্যায় প্রচলিত বিদ্যালয়ের গণ্ডিও তাঁহার নিকট নিতান্ত নিরানন্দময় ছিল। ভৃত্যেরা ছিল তাঁহার বেতনভোগী রক্ষক; বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়গণ ছিলেন তাঁহার পুথি পড়াইবার শিক্ষক। দুইয়ের কাহারও সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই যত দুঃখ যত নিরানন্দ। এই দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা—করাই ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য। গুরু শিষ্যের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিশুদের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হউক,' এখানকার সকল চেষ্টার মূলে ছিল এই কামনা।

স্কুলের শিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ পাবার মতন কিছু পাইলেন না; কিন্তু পিতার কাছে যাহা পাইলেন তাহার তুলনা নাই। মহর্ষির সঙ্গে হিমালয় ভ্রমনে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনে

এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সে যেন বন্দীর মুক্তি লাভ। মহর্ষি তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। শিশু রবীন্দ্রনাথ রোজ পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়াইতেন; দূরে গেলেও বিপদের আশঙ্কা করিয়া মহর্ষি কখনও উদ্বিগ্ন হইতেন না; কিম্বা তাঁহার যথেচ্ছা ভ্রমণে বাধা দিতেন না। তাঁহার দায়ীত্ব বোধ জন্মাইবার জন্য মহর্ষি নিজের মূল্যবান সোনার ঘড়িটিতে চাবি দিবার ভার তাঁহাকে দিলেন। ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিতেন, এবং দুই চার দিনেই তাঁহাকে ক্ষতি সহ্য করিতেও হইল তবু মহর্ষি তাঁহার পুত্রের চরিত্র গঠনের জন্য ঐ ভার তাঁহাকে দেওয়া দরকার মনে করিলেন। দায়ীত্ব না দিলে, ভুল করিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বাধীনতা না দিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, এই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কাছে পাইয়াছিলেন। নিজের ছেলের জীবন ও রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই গঠন করেন। পদ্মা নদীতে চলন্ত ষ্টিমারের সম্মুখে অল্প বয়স ছেলের পক্ষে নৌকা নিয়া যাওয়া কম বিপজ্জনক নহে জানিয়াও কোন দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেকে সেই কাজ হইতে বিরত করেন নাই। এই আশ্রমেও তিনি সাহস করিয়া ছাত্রদের যে সব কাজের ভার দিয়াছেন তাহাতে অনেকে অনেক রকম আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যে তাঁহার আবাল্য সংস্কার; এর বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেন কি করিয়া?

এই স্বাধীনতার, দায়ীত্বভার অর্পণের যে আর একটি দিক আছে তাহাও তিনি মহর্ষির কাছে শিখিয়াছিলেন। মহর্ষি যেখানে স্বাধীনতা দিতেন সেখানে সম্পূর্ণ ভাবেই দিতেন; আবার প্রত্যেকের কর্ত্তব্যও তিনি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এই আশ্রমেও দেখিতে পাই এক দিকে রবীন্দ্রনাথ অনেক জিনিষই ছেলেদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন; তাহারা চিন্তা করুক যাহা ভাল তাহাকে ভাল বলে জানিয়াই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করুক; কাহারও অনুরোধে যেন গ্রহন না করে। অপর দিকে ছেলেদের পালনীয় বিস্তর ছোট খাটো নিয়ম নিজেই স্থির করিয়া দিয়াছেন। ক্লাসে যাইয়া ছেলেরা কিরূপ ভাবে বসিবে ক্লাসে বা বাহিরে শিক্ষকের সম্মুখে তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে; শোবার ঠিক আগে তাহারা কি করিবে; ঘুম হইতে উঠিয়া তাহাদের কি কি করিতে হইবে, ইত্যাদি খুটিনাটি নিয়ম তিনিই করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদের সাহায্যে ইংরাজি শিখাইবার জন্য তিনি যে সব পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে কোন পদের পর কোন পদ ছেলেদের অনুবাদ করিতে হবে, তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। অথচ তিনি কখনও চাহেন না তাঁহার শিক্ষকেরা অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া দম-দেওয়া কলের মতন কোনো ভুল না করিয়া নিতান্ত প্রানহীনভাবে নিজেদের কাজ শেষ করেন। একদিকে স্বাধীনতা অপর দিকে নিয়মের বন্ধন যে যে পরস্পরকে খর্ব্ব না করিয়া পূর্ণই করে, এই কথা ভোলা খুব সহজ।

পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথ আর একটি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সেটি পোষাক পরিচ্ছদে আলাপ ব্যবহারে ভদ্ররীতি রক্ষা করিয়া চলার অভ্যাস। এ বিষয়ে মহর্ষির কড়া দৃষ্টি ছিল। পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমনে বাহির

হইবার ঠিক পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। যখন তাঁহারা হিমালয় যাত্রা করেন তখন রবীন্দ্রনাথের মাথা নেড়া। নেড়া মাথায় মখমলের টুপি পরিতে তাঁহার যথেষ্ট আপত্তি ছিল; কিন্তু ট্রেনে যখনই তিনি টুপি খুলিতেন তখনই পিতার আদেশে তাঁহাকে আবার টুপি পরিতে হইত। মহর্ষির পরিবারের কেহ কখনও পোষাক পরিচ্ছদে সংযত না হইয়া তাঁহার কাছে যাইতেন না। রবীন্দ্রনাথ যতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ততদিন মহর্ষি জ্যেষ্ঠ পুত্রদের কাছ হইতে যে সব চিঠি পত্র পাইতেন তাহা রবীন্দ্রনাথকে পড়িতে দিতেন; উদ্দেশ্য সেই সব চিঠি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ শিখিবেন কি করিয়া গুরুজনকে চিঠি লিখিতে হয়। আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের চরিত্রে অধীরতা অসংযম ও শীলতার অভাব দেখিলে রবীন্দ্রনাথ যে কত ব্যথা পান, যাহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানেন তাহারাই কেবল তাহা অবগত আছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আঘাত দিয়া সুপ্ত চিত্তকে জাগ্রত করা, ভাল করিয়া পুঁথির ব্যাখ্যা করা বা অন্য কিছু নহে। শিশু রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহার স্কুলের শিক্ষকদের ছিল না। সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য না পাইয়াও নিজে নিজে সাহিত্যের ভিতর রস পাইতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরের প্রকৃতিই প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সোনার কাঠি—যাহার স্পর্শে তাঁহার চিত্ত জাগ্রত হয়। শৈশবে ভৃত্য যখন খড়ি দিয়া মাটিতে গণ্ডি আঁকিয়া তাহার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে শাসাইয়া নিজ কাজে মন দিত তখন শিশুর মন পুকুর পাড়ের বুড়া বটের মূলে আলো ছায়া মিলিয়া যে কল্পলোক রচনা করিত সেখানে বিচরণ করিত। বাহির তাঁহার কাছে সুলভ ছিল না বলিয়াই বাহিরের আকর্ষন তাঁহার কাছে এত বেশী ছিল, এবং বাহিরকে তিনি এমন করিয়া পাইয়াছিলেন। অল্প বয়সে হিমালয়ে দ্বিপ্রহরে একাকী কেলু বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া; প্রথম যৌবনে শাহিবাগের ছাদে একাকী রাত্রি জাগিয়া, পরিণত বয়সে নীরব নিশীথে স্তব্ধ ভাবে তারার দিকে তাকাইয়া তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহা কোন শিক্ষক তাঁহাকে কোন দিন দিতে পারে নাই। প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই কথাটি তাঁহার জীবনে এমন করিয়া সত্য হইয়াছে বলিয়াই শান্তিনিকেতনে এত ঋতু উৎসবাদির আয়োজন এত তরুমূলের মেলা, এবং "খোলা মাঠের খেলা।"

স্মৃতি

শ্রীজগদানন্দ রায়

১৯০১ সালের শ্রাবণ মাসে যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি, সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। গুরুদেব শিলাইদহের জমিদারির কর্তৃত্ব ছাড়িয়া আগেই সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। আমি বাড়ি ঘুরিয়া কয়েক দিন পরে আসিলাম। তখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি যখন শিলাইদহে জমিদারি-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথকে একটু-একটু গণিত শিক্ষা দিতাম। জমিদারির জটিল কাজ আমার ভালো লাগিত না। কেবল ভালো না-লাগা নয়, জমিদারি-সংক্রান্ত কাজে একটা হাঙ্গামাও বাধাইয়াছিলাম। ইহাতে আমাকে কয়েক দিন অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। জেলখানায় নয়। তাই যখন শুনিলাম গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকিবেন এবং সেখানে বিদ্যালয় হইবে, তখন তাঁহার সঙ্গ লইয়া আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। যদি জমিদারির কাজেই থাকিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আজ আমার কি দশা হইত তাহা অনুমানই করিতে পারি না। আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে যে-দিন গুরুদেব আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি জমিদারির কাজে থাকিতে চাও, না আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাইতে চাও।" সেই দিনটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সানন্দে বলিয়া ফেলিলাম,—"আমি নায়েব হইতে চাহি না। আপনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই যাইব।" গুরুদেব বলিলেন,—"তথাস্তু"। হাতে স্বর্গ পাইলাম।

যাহা হউক, শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিলাম রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় আগেই আসিয়াছেন। খুব আনন্দ হইল। তিনি খুব রসিক লোক ছিলেন। ভোরে উঠিয়াই বিদ্যার্ণব ও রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে খোয়াই দেখিতে বাহির হইলাম। উত্তরায়ণের পশ্চিমে যে-খোয়াইটি আছে, সেখানে খুব দৌড়াদৌড়ি করা গেল। এপর্য্যন্ত নদীয়া জেলার সমতল ভূমির সীমানা ত্যাগ করি নাই। বীরভূমের রাঙামাটি ও অসমভূমি এবং দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর খুব ভালো লাগিল। আর ভালো লাগিল শান্তিনিকেতন আশ্রমটি। মনে হইতে লাগিল, যেন উদ্ভিদ্-বিরল মহা প্রান্তর তাহার সমস্ত রসধারা নিঃশেষ করিয়া কোলের ছেলের মতো এই আশ্রমটিকে শ্যামলশ্রীতে মণ্ডিত রাখিয়াছে।

আশ্রমে আসিলাম বটে, কিন্তু আমার আগমনে একটি অতিথি আশ্রম ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার স্বর্গীয় হে—বাবু কয়েক দিন গুরুদেবের সহিত অবস্থান করিবেন বলিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমি ম্যালেরিয়া-রোগী।

স্বাস্থ্য কাহাকে বলে জানিতাম না। বৎসরের মধ্যে দশ মাস শয্যাগতই থাকিতাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁটাল খাইয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে আষাঢ়ে ম্যালেরিয়ায় ধরিত, এবং তাহার জের ফাল্গুন-চৈত্রের পূর্ব্বে শেষ হইত না। সুতরাং প্রথম-দর্শনেই হে…বাবু বুঝিয়া লইলেন আমি ম্যালেরিয়া-রোগী। মশকই যে ম্যালেরিয়া-বীজের বাহন বোধ করি তখন সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। হে…বাবুর ভয় হইল পাছে আমাকে কামড় দিয়া মশারা তাঁহাকে কামড়ায়। প্রথমে একটা মশারির মধ্যে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল; তার পরে ডবল্ মশারির ভিতরে। কিন্তু ইহাতেও হে…বাবুর আশঙ্কা গেল না। মশারা দুই শত গজ রাস্তা উড়িলে হাঁফাইয়া পড়ে, এই তত্ত্বটিও সেই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হে…বাবুর শয়নকক্ষ হইতে দুই শত গজ দূরে আমাকে নির্ব্বাসিত করা হইল। তবুও মশার পাল তাঁহার মশারির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। অগত্যা হে…বাবু আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

আমরা যখন শান্তিনিকেতনে আসিলাম, তখন বাড়িঘরের মধ্যে অতিথিশালার দোতলা বাড়ি এবং এখন যে-বাড়িতে ডাক-ঘর আছে, তাহাই ছিল। দক্ষিণদিকে ছিল, এখন যেখানে লাইব্রেরি আছে তাহারি মাঝের হল ঘরটা এবং পাশের দুটা ছোটো কুঠারি। আর অতি দূরে বাঁধের ধারে নীচু-বাংলা দেখা যাইত। তখন নীচুবাংলা খড়ে ছাওয়া একখানা বড় আটচালা ঘরের আকারে ছিল। সেখানে কাহাকেও তখন বাস করিতে দেখি নাই। ভৃত্যেরা ডাকঘরের বাড়িতে থাকিত। সেখানেই অতিথিদের জন্য রন্ধনাদি হইত। জয়পুরী সাদা পাথরের থালাবাটি বোধ করি দশ-বারো সেট্ ছিল। অতিথি আসিলে সেই সকল ভোজন-পাত্রে আহার করিতেন। প্রত্যেক বেলায় পাঁচ-সাত রকম নিরামিষ তরকারি থালায় সাজাইয়া দেওয়া হইত।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় আশ্রয় পাইলাম, আজকালকার লাইব্রেরি বাড়ির পশ্চিম কুঠারিতে। তখনো বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। শীঘ্রই ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ চলিতেছিল। কিন্তু আশ্রমের এদিক্‌টা ছিল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ। এখন যেখানে শিশুবিভাগ নারীবিভাগ ও হাঁসপাতাল আছে সেদিকে ভুলেও কেহ পা দিত না। এই জায়গাগুলি ছোট-বড় শাল ও কাঁটা গাছে আচ্ছন্ন ছিল। শুনিতাম শিয়াল ও হেঁড়োলের দল নাকি এই সব জঙ্গলে আশ্রয় লইত। শিশুবিভাগ, বীথিকাগৃহ ও কালাচাঁদ বাবুর বাসার কাছের শালগাছগুলি এখনো সেই শালবনের সাক্ষ্য দিতেছে। এই জঙ্গলের তলা কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। পরে আমরা এই জঙ্গলের নীচে লুকোচুরি খেলা করিয়াছি মনে পড়ে। তখন দিন-দুপুরে ও সন্ধ্যার পরে সরকারি সদর রাস্তা দিয়া লোকজন চলিতে ভয় পাইত। শুনিয়াছিলাম, আমাদের শান্তিনিকেতনে আসিবার কিছুদিন আগেও গোয়ালপাড়ার রাস্তায় দুষ্ট লোকদের হাতে পাথিকেরা লাঞ্ছিত হইয়াছে।

এই সময়ে আমাদের অধ্যাপনার কাজ বেশি ছিল না। আমি রথীন্দ্রনাথকে দিনে

অল্পক্ষণের জন্য গণিত শিক্ষা দিতাম এবং Huxleyর যে ছোটো বিজ্ঞানের বইখানা এন্‌ট্রেন্সের পাঠ্য ছিল, তাহাই সন্ধ্যার পরে পড়াইতাম। আর সংস্কৃত পড়াইতেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। বাকি বিষয়ের অধ্যাপনার ভার আমাদের উপরে ছিল না। গুরুদেব নিজেই সে-বিষয়গুলি পড়াইতেন। শিলাইদহেও তাঁহাকে ছেলেমেয়েদের নিজে পড়াইতে দেখিয়াছি। সেখানে লরেন্স নামে এক সাহেব মাষ্টার ও একজন পণ্ডিত ছেলে-মেয়েদের পড়াইতেন। কিন্তু মাষ্টার ও পণ্ডিতের হাতে পুত্রকন্যাদিগকে সমর্পণ করিয়া গুরুদেব কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এমন কি আমরা যখন পড়াইতাম, তখন কাছে বসিয়া তাহা শুনিতেন।

এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি রথীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞান পড়াইতেছিলাম। তখন সদ্য কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতায় লাগিয়াছি। স্কুল-কলেজে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এ, এম এ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ইংরাজিতে অধ্যাপনা করেন। আমার ছাত্রটি এন্‌ট্রেন্সের পরীক্ষার্থী সুতরাং ছাড়িব কেন? অনর্গল ইংরাজি ভাষায় রথীন্দ্রনাথকে পড়া বুঝাইতেছিলাম। ইংরাজিতে কত ভুল হইতেছে, সে-দিকে লক্ষ্যই নাই, অবিরাম ইংরাজি বলিয়াই চলিয়াছি। গুরুদেব কাছে বসিয়া পড়ানো শুনিতেছিলেন এবং বোধ করি মনে মনে হাসিতেছিলেন। শেষে তিনি আমাকে থামাইয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি আর ইংরাজিতে পড়াইয়ো না।" তাঁহার কথায় চৈতন্য হইল। সেইদিন হইতে এ পর্য্যন্ত কোনো বাঙ্গালী ছাত্রকে ইংরাজিতে কিছু শিখাইবার চেষ্টা করি নাই। জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে যে, অল্পায়াসে সুশিক্ষা-দান সম্ভব, আজ আমাদের দেশের লোকেরা বুঝিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু গুরুদেব পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলায় শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন।

ক্রমে পূজার ছুটি কাছে আসিল। আমরা বাড়ি ফিরিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। এই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। দুই মাস শান্তিনিকেতনে আছি, অথচ আমরা "পারুল বন" ও "আমানি ডোবা" ছাড়া আর বাহিরের কোনো জায়গা দেখিলাম না, ইহা মনে করিয়া হঠাৎ বিদ্যার্ণব মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। এক দিন দ্বিপ্রহরে আহারের পরে আমরা দু'জনে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। বোলপুর সহর ছাড়িয়া সোজা একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তা শেষ হইয়া ধানের ক্ষেতে পড়িল; সে-দিকে দৃক্‌পাত নাই, ক্রমাগত অগ্রসর হওয়াই গেল। শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম তখন আমাদের চৈতন্য হইল। কাছে একটা সাঁওতাল-পল্লী ছিল; অনুসন্ধানে জানিলাম বোলপুর সহর সেখান হইতে তিন ক্রোশ; শান্তিনিকেতন আরো দূরে। সাঁওতালরা ফিরিবার পথ দেখাইয়া দিল। অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে এক গলা ধানের ভিতর দিয়া

সরু রাস্তা, পথে জনপ্রাণী নাই। মহা বিপদে পড়া গেল। তখন দিক্‌ভ্রম হইয়া গেছে; দূরে দিগন্তে কোনো গাছপালার চিহ্ন দেখিলেই মনে হইতে লাগিল এই বুঝি শান্তিনিকেতন। রাত্রি যখন নয়টা তখন অতি-দূরে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা গেল। বাঁচা গেল,—সেই আলো লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম, এবং শেষে উপস্থিত হওয়া গেল একটি কুটীরে। এখানে গ্রাম নাই, শ্মশানের উপরে এই কুটীর; দুইজন ভৈরব তাহার অধিবাসী। যাহা হউক, আমাদের অবস্থা দেখিয়া ভৈরবদেরও হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা কঙ্কালী দেবীর স্থান। সন্ধ্যার পরে কোনো গৃহস্থই এখানে আসিতে সাহস করে না। যাহা হউক, ভৈরবেরা আমাদের সাহসের প্রশংসা করিয়া আদরে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং শেষে আলো লইয়া রেলের সাঁকো অবধি সঙ্গে আসিলেন। যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুটা। এই রকমে আমাদের নিশীথ-অভিযান শেষ হইল বটে, কিন্তু পরদিন আমার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

পূজার ছুটির পরে আশ্রমে ফিরিয়া শুনিলাম, ব্রহ্মবিদ্যালয় ৭ই পৌষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কি-ভাবে তাহার কাজ চলিবে সে-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে লাগিলাম। শিলাইদহের হোমিওপাথ ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ি মহাশয় এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসিলেন। বোধ করি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে দুই একবার আশ্রমে আসিয়া বিদ্যালয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে আগত অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখনকার লাইব্রেরীর মাঝের ঘরে সভা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ, সুধীরকুমার নাগ, গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, এবং প্রেমকুমার গুপ্ত এই পাচটি বালক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্ত ক্ষৌম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ইঁহারা যেরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় তসরের ধুতি-চাদর পরিয়া নিকটে ছিলাম। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ এবং পূজনীয় গুরুদেবের উপদেশের মর্ম্ম ১৯০১ সালের মাঘের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে অনেকদিন ধরিয়া উপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারি উদ্যোগে ছাত্র কয়েকটিকে পাওয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে চুঁচড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। রেবাচাঁদের উপরে ছাত্র-পরিচালনার ভার ছিল। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা যেমন তাঁহাকে ভালোবাসিত তেমনি তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। আমরা পড়াইয়াই খালাস পাই-

তাম। রেবাচাঁদের কঠোর শাসন-রীতি আমাদের কিন্তু ভালো লাগিত না। এখন যেমন সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেরা উপাসনা করে, এবং খালিপায়ে থাকে, বিদ্যালয় আরম্ভের দিন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রত্যেকের এক-একখানি চেলির কাপড় ও চাদর থাকিত। তাহা পরিয়া ছেলেরা উপাসনায় বসিত। আহারের সময়ে প্রত্যেকে গাড়ু ভরা জল লইয়া আহার-স্থানে যাইত। বলা বাহুল্য পট্টবস্ত্র, গাড়ু, থালা, বাটি ইত্যাদি সকলি বিদ্যালয়ের খরচ হইতে দেওয়া হইত। অনেক ছাত্রের বিছানাও বিদ্যালয় হইতে দিতে দেখিয়াছি। তখন কোনো ছাত্রের নিকট হইতে নিয়মিত বেতন লওয়া হইত না। পাকশালা ছিল না; এখানকার লাইব্রেরীর মাঝের ঘর এবং তাহারি পাশের দুইটি ছোট ঘর ছাড়া আর ঘরও ছিল না। রথীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী তখন জীবিতা। তিনি তরকারি কুটিয়া এবং আহার্য্য সামগ্রী সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। রান্না হইত পোষ্ট আফিস্ সংলগ্ন যে-ঘরে মোটর থাকিত, সেই ঘরে। ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি ছিল না, আহারও সেখানে বসিয়া হইয়া যাইত। মাতা-ঠাকুরাণীর সুব্যবস্থায় ছাত্র ও অধ্যাপকেরা কিছুদিন যে-আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের সকাল-বিকালের জলখাবার তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়া আমাদের কাছে আসিত।

এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্ব্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাশেই আমরা তাহাদের পড়াশুনা শেষ করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ, গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। সে-এক আশ্চর্য্য সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেক দিনই তিনি কি-প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্য সভায় উপস্থিত থাকিয়াছি,—কোনো দিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই। আজকাল যাহাকে Sense training বলা হয়, গুরুদেবই আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথমে তাহার সূত্রপাত করেন। একটা জায়গায় কতকগুলি কড়ির স্তূপ রাখা হইত। বালকগণ আন্দাজে তা'র সংখ্যা বলিয়া দিত। একটা পাত্রে আট দশ রকম জিনিষ রাখা হইত। ছাত্রেরা এক নজর দেখিয়াই সেগুলির বিবরণ লিখিয়া দিত। তা' ছাড়া আন্দাজে জিনিষের ওজন ও দৈর্ঘ্য নিরূপণ প্রভৃতি অনেক খেলা ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে আট-দশ বৎসর গুরুদেব এই সকল চালাইয়াছিলেন। ইহার উপরে তিনি দুই-তিনটা ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাশে শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করাও শিখাইতেন। এই সময়ে অভিনয় যে ছিল না তাহা বলা যায় না। এখনকার লাইব্রেরী ঘরে ছেলেরা হেঁয়ালি নাট্যের

অভিনয় করিত। তাহার ব্যবস্থাও গুরুদেবকে করিতে হইত। এখন যেমন নূতন গান হইলে সঙ্গীতজ্ঞরাই তাহা প্রথমে উপভোগ করেন, তখন তাহা ছিল না, নূতন গান হইলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সান্ধ্যসভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইত না। "মোরা সত্যের পরে মন" এই গানটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই রচিত হইয়াছিল। আমি ও বিদ্যার্ণব মহাশয় বিকালে পারুলডাঙ্গায় বেড়াইবার সময়ে এই গানটি জোর গলায় গাহিতাম মনে পড়ে। তা' ছাড়া আমাদেরও মাঝে মাঝে বৈঠক বসিত। সেখানে রসসাগরের পাদপূরণের মতো খেলা চলিত। ইহাতে কেহ হয়ত একটা শব্দ বা বাক্য বলিতেন, তাহারি সঙ্গে মিল রাখিয়া মুখে মুখে তাড়াতাড়ি দুই ছত্রের কবিতা রচনা করিতে হইত। মনে পড়ে একবার শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইহার সহিত মিল রাখিয়া একটি কবিতা রচনা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করা গেল,—

হনুমতা হতা লঙ্কা
কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

খুব হাসির রোল উঠিয়াছিল। একবার আমাদের মধ্যে স্থির হইল, সাধারণ বাক্যালাপে ইংরাজি শব্দ একেবারে ব্যবহার করা হইবে না; ব্যবহার করিলে প্রত্যেক শব্দের জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। গুরুদেবও এই খেলায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু জরিমানা দিতে হয় নাই। বেশি জরিমানা দিয়াছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। কারণ তিনি ইংরাজি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু কথাবার্ত্তায় অনেক ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একবার এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মনে আছে, ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করার জন্য তাঁহাকে অনেক দণ্ড দিতে হইয়াছিল। এমন কি যখন কলিকাতায় ফিরিবার জন্য গাড়িতে উঠিতেছেন সে-সময়েও চারি পয়সা জরিমানা দিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের গায়ে খুব জোর ছিল। তিনি ক্রিকেট্ ইত্যাদি নানারকম খেলা জানিতেন। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ ঠিক যুবকের মতোই দেখিতাম। প্রতিদিন উপাধ্যায় মহাশয় বিকালে ছেলেদের লইয়া খেলা করিতেন। তিনি গৈরিক উত্তরীয়খানিকে সুকৌশলে জামার মতো গায়ে জড়াইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেন। উত্তরীয়কে গুটাইয়া জামার মতো গায়ে দেওয়ার কৌশল তখনকার অধ্যাপক ও ছেলেরা শিখিয়াছিলেন। এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিছুদিন একজন পালোয়ান ছেলেদের কুস্তি শিখাইত দেখিয়াছি। তা'র পরে একজন জাপানি কুস্তিগির ছেলেদের "যুযুৎসু" শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যাহা হউক ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের সংখ্যাও বাড়াইতে হইল। হিসাবপত্র রাখার জন্য একজন লোকের দরকার হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ি হিসাবপত্র রাখিতেন, গুরুদেব স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে আদিকুটীরের

এবং রান্নাঘরের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্নবাবু ও রাইপুরের রবীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। সিংহ মহাশয় ভয়ানক রাশভারি লোক ছিলেন। ঘরের জন্য মাটি লওয়া হইতে লাগিল এখনকার দুই ক্যাবিনের মাঝে যে-আমগাছটি আছে, তাহার তলা হইতে। ইহাতে সেখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে এবং এমন কি শীতকালেরও কিছু দিন পর্য্যন্ত সেখানে জল জমা থাকিত। ছেলেরা তাহাকে নাম দিয়াছিল "কচ্ছপ পুকুর।" বোধ করি হঠাৎ কোনো একদিন একটি কচ্ছপশাবক ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই নামটি। এখন কচ্ছপ পুকুরের নাম-গন্ধ নাই। প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমে শিক্ষক হইয়া আসেন, তখন তিনিই ছেলেদের হইয়া সেই পুষ্করিণী ভরাট্ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসর খানেকের মধ্যে আশ্রমের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। উপাধ্যায় মহাশয় ও রেবাচাঁদ যাঁহারা বিদ্যালয়ের পত্তনের সহায় ছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। নূতন আসিলেন চন্দননগরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার এবং কুঞ্জলাল ঘোষ। ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা এখন নূতন রান্নাঘরে আহার করি, আদি-কুটীরে ছেলেদের সঙ্গে বাস করি। বোধ হয় এই সময় হইতে যাহাকে বলে "Constitution" তাহারি সূত্রপাত হইল। গুরুদেব আমাকে ও মনোরঞ্জনবাবুকে আদেশ দিলেন, কুঞ্জবাবুর হিসাবের খাতা আমাদিগকে প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া সহি দিতে হইবে।

এখন অধ্যাপক এবং কর্ম্মচারীদের যেমন চায়ের গোষ্ঠী আছে। আশ্রমের প্রথম বৎসর হইতে আমাদেরও সেই রকম চা-পান গোষ্ঠী ছিল। বিকালে চায়ের সভাটি জমিত ভালো। গুরুদেব প্রায়ই সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলের সহিত গল্প করিতেন। আমরা সকলেই প্রাণ খুলিয়া হাসি-তামাসা করিতাম। সুবোধবাবু ছিলেন এই সভার নেতা। সর্ব্বদা একত্র অবস্থানে, একত্র আমোদ-প্রমোদে, একযোগে কাজকর্ম্ম করায় অধ্যাপকদিগের পরস্পরের সঙ্গে যে-হৃদয়ের যোগ হইয়াছিল, এমনটি আর দেখি নাই।

তখনকার উৎসবগুলিও অনুপম ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে দুই-তিন বৎসর ১লা বৈশাখে যে-উৎসব হইত, তাহার কথা আজো ভুলি নাই। প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরীর মাঝের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব "আমারে কর তোমার বীণা" গানটি গাহিলেন; সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তার পরে পশ্চিমে মেঘ করিয়া কাল-বৈশাখীর ঝড় আসিল। মোহিতবাবু এবং আরো

অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন। মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে-প্রকারে দৌড়াইতেছিলেন তাহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে। তিনি যেন ছিলেন, উৎসাহের জীবন্ত মূর্ত্তি। বর্ষশেষের রাত্রিতে আমরা কেহই ঘুমাইতাম না। কেহ ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতাম। সমস্ত রাত্রি মাঠে ঘুরিয়া গোলমালে কাটানো যাইত। তার পরে যখন রাত্রি চারিটার সময়ে মন্দির হইতে মৃদঙ্গের শব্দ এবং রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর সুর কানে আসিত,তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইত গুরুদেবের উপদেশ। সেই সকল উপদেশ এখন বঙ্গভাষার পরম সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন ভাবি, আমাদের তখনকার সেই উৎসাহ, সেই উদ্যম কোথায় গেল।

সে-সময়কার ৭ই পৌষের উৎসবগুলিও সুন্দর ছিল। কলিকাতা হইতে অনেক বিশিষ্ট অতিথি আসিতেন। মনে পড়ে একবারের ৭ই পৌষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয় আসিয়াছিলেন। "কান্ত কবিকে" সেই প্রথমে দেখিলাম এবং তাঁহার গান শুনিলাম। একটা হারমোনিয়ম্ কাছে পাইলে তিনি অবিরাম গান করিতেন। গানে তাহার ক্লান্তি দেখি নাই। বোধ হয় সেইবারকার ৭ই পৌষে আশ্রম-বালকেরা "বিসর্জ্জন" নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিল। ইহাই আশ্রমের ইতিহাসে প্রথম অভিনয়। ইহাতে অপর্ণার ভূমিকা ছিল না। শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার হইয়াছিলেন গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ হইয়াছিলেন শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, এবং রঘুপতি ছিলেন দিনুবাবু। শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় ষ্টেজ-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়, "দুই কানে বাসা করিয়াছে দুই টিয়া পাখী" বলিয়া যে-সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আজো মনে আছে। অভিনয়ে এমন উৎসাহ আর দেখি নাই। আমরা কয়েকজন সেই পৌষ মাসের শীতে ষ্টেজেই রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। লাইব্রেরীর উত্তরে এবং রান্নাঘরের পশ্চিমে যে-একটি বড় ঘর ছিল, সেই ঘরে অভিনয় হইয়াছিল।

যত দূর মনে পড়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে অজিতবাবু প্রায়ই আশ্রমে আসিতেন। অজিতবাবুর তখন পাঠ্য-দশা; সতীশবাবুর মৃত্যুর পরে বি, এ, পাশ করিয়া তিনি আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। সতীশবাবুর আগমনে বিদ্যালয়ের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এমন সাহিত্য-রসিক উৎসাহী যুবক আর দেখি নাই। নিত্য নূতন রচনায় এবং কবিতাপাঠে তখনকার ছাত্রদিগের ভিতরে তিনি সাহিত্য-প্রীতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন আপন-ভোলা লোক আর দেখা যায় না। রাত্রে এক সঙ্গে আহারে বসিতাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আহার শেষ করিয়া সতীশবাবু উঠিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়ি-

তেন। কত অনিদ্র রজনী যে তিনি একা এবং কখনো আজিতবাবুর সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিতেন, তাহা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের অতি সামান্য উপলক্ষও তিনি ত্যাগ করিতেন না। সতীশ বাবুর আয়োজনে একবার Midsummer Night's Dream এর যে-অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ইহার রিহার্সাল্ হইত উত্তরায়ণের পশ্চিমের খোয়াইয়ের ভিতরে। রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। আমারো একটা ভূমিকা ছিল। সেক্সপিয়ারের লেখা কবিতা মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। খুব মুখস্থ করিলাম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া দেখি, সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহার এক ছত্রও মনে নাই। কিন্তু অভিনয় ত করিতে হইবে,—কাজেই যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া অভিনয় শেষ করিলাম। শ্রোতৃবর্গ এই নূতন অভিনয় দেখিয়া অবাক্। স্বর্গীয় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। দর্শকদের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমার অভিনয়-পটুতা দেখিয়া তিনি খুব সাধুবাদ করিয়াছিলেন মনে আছে।

১৯০৪ সালের মাঘ মাসে সতীশ বাবু এই আশ্রমেই বসন্তরোগে মারা যান। তখন বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। আমরা চিঠি পাইলাম, বিদ্যালয় শিলাইদহে যাইবে। সকলেই শিলাইদহে উপস্থিত হইলাম। বৈশাখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ শিলাইদহেই হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। বোধ করি এই সময়েই অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় এবং নগেন্দ্রনাথ আইচ শিলাইদহে আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে যুক্ত হইয়াছিলেন। মোহিত বাবু গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রভৃতির পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিলাইদহেই ইহার সূত্রপাত হয়।

বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে ছাত্র-সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল মনে পড়ে। মোহিত বাবু এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন গুরুদেবের শরীর ভালো ছিল না। অথচ দায়িত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আবার উপর্য্যুপরি পারিবারিক বিপদ আসিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে, কিন্তু তাঁহাকে আমরা একটুও নিরুৎসাহ হইতে দেখি নাই। অক্ষম আমরা দীর্ঘকাল কাছে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শ-অনুসারে ছেলেদের গড়িয়া তুলিতে পারিতাম না; বরং আমরাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া গোলযোগ বাধাইয়া তুলিতাম। এখন সে-সব কথা মনে করিলে লজ্জায় মাথা নত হয়। গুরুদেব নিজেই ছেলেদের সহিত মিশিয়া ছেলেদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিতেন এবং তাঁহার গবেষণা-সম্বন্ধীয়

পরীক্ষাদি আমাদের দেখাইহেন। অনেক বার গুরুদেব নিজে অয়োজন করিয়া রায়পুর প্রভৃতি স্থানে ছেলেদের লইয়া পিক্‌নিক্‌ করিতে গিয়াছেন। মনে পড়ে, একবার গুরুদেব এবং আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র ছেলেদের লইয়া হাঁটিয়া বাইপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং আহারান্তে হাঁটিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছিলেন। ছেলেদের তখন যতগুলি বাসগৃহ ছিল, গুরুদেবকে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক বাসগৃহে কিছুদিন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

ইহার অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলা খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয় ত ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে-দিনে নূতন-নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থম্‌থমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "শারদোৎসব" নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগা-গোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় "শারদোৎসব" পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে-ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতা কম নয়।

আশ্রমের প্রথম জীবনে এখনকার মতো সাহিত্য-সভা এবং পত্রিকাদি-প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট ছিল। মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে "সাহিত্য-সভার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়া-ছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনা-পাঠে মস্‌গুল রাখিতেন। গুরুদেব যে-সকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকারই মতো আমাদেরি ভাগ্যে জুটিত। তারপরে কিছুকাল ধরিয়া অতি প্রত্যুষে তিনি মন্দিরে নিয়মিতভাবে যে-সকল উপদেশ দিতেন, তাহাও তখন আশ্রমে সাহিত্যক্ষেত্র রচনার সহায় হইয়াছিল। সেই অমূল্য উপদেশাবলির অধিকাংশই "শান্তিনিকেতন" নামক পুস্তিকার কয়েক খণ্ডে রহিয়াছে। তারপরে পূজনীয় বড়বাবু মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন "বেদান্ত দর্শন" অথবা

"কাণ্ট" লইয়া প্রত্যেক সন্ধ্যায় দিনের পর দিন আলোচনা চলিতেছিল। সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতেন। আমার কিন্তু শুনিতে শুনিতে ঘুম পাইত। ঘুম আর রাখা যায় না; তাই ঘটি হাতে করিয়া প্রায়ই সভা ত্যাগ করিয়া যাইতাম। বড়-বাবু কয়েকদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন,—"জগদানন্দ আমাকে দেখ্‌লেই ঘটি হাতে ক'রে বার হয়ে পড়েন। তাঁর হ'ল কি? আচ্ছা তাঁকে ছুটি দেওয়া গেল।" গুরুদেবের কাছে যেমন অনেক নূতন কবি ও লেখক রচনা সংশোধন করাইবার জন্য উপস্থিত হন। আমরাও এক সময়ে আমাদের নিজের রচনা সংশোধন করাইবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতাম। ইহাতে তাঁহাকে একটুও বিরক্ত হইতে দেখি নাই। কোন্ বিষয় কি-রকমে লিখিলে ভালো হইবে, সর্ব্বদাই সে-সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছি। আমার আগেকার বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষা ভয়ানক জটিল ছিল। সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার উপদেশ তিনি আমাকে বার বার দিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, আমার দুই-একখানি বইয়ের প্রুফ্ পর্য্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়া সংশোধন করিয়াছেন। কেবল আমিই যে এই অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা একটু-আধটু লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের উপরে নানা বিষয়ের লেখার ভার দিয়া, তিনি তাহা আদায় করিয়া লইতেছেন এবং সংশোধন করিয়া দিতেছেন ইহাও অনেক দেখিয়াছি। ইহার ফলে এক সময়ে আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদের ভিতরে সাহিত্যচর্চ্চা খুব বাড়িয়াছিল। সেই সময়ের কয়েকটি ছাত্র এবং অধ্যাপক এখন সুলেখক বলিয়া খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছেন।

A Flower

M. Collins

There is a little plant to be met with every where in and about the Asrama of Santiniketan, a little so lowly in its growth it hardly seems to leave the earth at all; and its spreading shoots cling so close to the soil with their tiny rootlets, they seem to fear lest some ungentle breeze should come and disturb their dreams of peace and happiness. Borwning would have been glad to to know this flower, for not only is it so closely bound to earth but its bright blue eyes are

ever and ever gazing up at the heavens. In the hottest months of the year, in the hottest hours of the day they keep their watch, and who would not like to think that these little flowers, picturing lovers' thoughts, have become filled with the bright blue radiance on which they gaze.

But this little flower has no name. In the west where wild flowers seem to be more at home, it would soon have found one. Some little touch of child-poetry would have clung to it and glowing with many an association from the golden age of childhood, it would have helped to enrich the life-blood of poetry. Chaucer's daisy, we may be sure, received much of its glamour from his earbist recollections. And he who wrote of daffodils :

"That come before the swallow
dares, and take
The winds of March with beauty,"

must have brought with him to the London stage many a memory-pricture, many a flash of feeling from the fields of Avon as he knew them in his boyhood.

A nameless flower! And has it therefore no place in poetry ? It is true it can add little or nothing to the wealth of sensuous imagery at the poet's disposal. But it may inspire ; and who knows how many a bard may have found inspiration in our little flower. Named or nameless, then—what matters ? And inded, who can wonder if to the poet's vision, glancing "from heaven to earth, from earth to heaven", all individual names and forms should grow dim, and if from the man of old should emerge for him the one, from the gorgeous multiplicity of flowers the simple "flower", a type of beauty and all that beauty means.

Such an almost apotheosis of the flower is one of the most impressive features in the poetry of Rabindranath Tagore—the simple flower that leads the thoughts on from beauty to truth, and from truth to the divine. It is not that there is any lack of individual flowers : his songs are full of the flowers of every season in rich abundance. But they are for him just messengers, and their livery is of no real importance ; they are tokens, and the form they bear matters little. He brings them in

for us from the dark forest, where in ancient days the Indian seers taught their wonderful lore. And with them he brings too the same ancient lore. But what was once a mystery for the few, dark like the forest in which it was taught, far away from the abodes of men, is now brought near to all. Our seer has been with those old forest-dwellers; he has sat with them and drunk in all their throughts. But in the forest he found too the forest-flower and, new-inspired, the message that he brings is shot through—as when the flowers lie thickest in the forest gloom—with the divine light of love.

রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীনরেন্দ্র দেব

কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে এদেশের ও দেশান্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন খানি আজ যাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার চরণশায়ী, কেবলমাত্র নাট্য-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ক'রতে বসলেই রূপ-দক্ষ রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপটি যেন ধরণীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে চক্ষের সমুখে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে!

কেবলমাত্র রচনার দিক দিয়ে নয়, নাট-কীয় ঘটনা সমাবেশ, চরিত্র চিত্রণ ও লিপি চাতুর্য্য ছাড়াও নাটকের অভিনয়ে ও রঙ্গমঞ্চে তার কলাসম্মত প্রয়োগ-নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কীর্ত্তি আজ বিশ্ব-লোকের বিস্ময়ের সামগ্রী!

'আর্টের' সীমানার অন্তর্ভুক্ত বিবিধ কলা কৌশলের একত্র সমাবেশে অভিনয়ের সৃষ্টি। শুধু প্রথম শ্রেণীর একখানি নাটক পেলেই, প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করাও সকল সম্প্র-দায়ের পক্ষে সম্ভবপর ও সাধ্যায়ত্ত নয়। নাট্যকরের রচনা চাতুর্য্যকে কাজে লাগাবার যোগ্য অভিনেতাও চাই। নাটকে কাজে বর্ণিত ঘটনারস্থল বা দৃশ্যের অবতারণায় বাস্তবতার অনুকরণ করাই প্রয়োগ শিল্পীর চরম লক্ষ্য হ'লে চ'ল্‌বেনা, কারণ বাস্তবের অবিকল নকলটাই যে সবচেয়ে বড় 'আর্ট' নয়, এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। নাট্যকারের কল্পিত চরিত্রকে সৌন্দর্য্যের স্বপ্নাবেশের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তোলাই

আর্টিষ্টের কাজ।* প্রিয়দর্শণ নিপুণ অভিনেতৃগণের সুকণ্ঠ আবৃত্তি, সুদৃশ্য দৃশ্যপট ও সুশোভন সাজ সজ্জা, সুমধুর সঙ্গীত, ললিত নৃত্য সজীব হাবভাব ও সুচারু ভঙ্গী এবং আগম-নির্গম প্রভৃতি নানা বিভিন্ন কলা নৈপুণ্যের পূর্ণ বিকাশ হ'লে তবেই প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের অভিনয় হওয়া সম্ভবপর।

একসময়ে কলিকাতায় 'সঙ্গীত-সমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্বর্গত অগ্রজরা সেখানকার সভ্য ছিলেন। সেই সময় 'সমাজের' সভ্যেরা তাঁদের নিজেদের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'রাজারাণী' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাটকের অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন। 'রাজরাণী' নাটকে 'শঙ্করের' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আজও একটা স্মরনীয় ব্যাপার হ'য়ে আছে। শুধু অভিনয়ের দিক দিয়ে নয়, 'রাজারাণীর' মত একখানি সুন্দর নাটকও সে যুগের নাট্য সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতি নাট্য ও বাঙলা ভাষায় এক নূতন দান! প্রকৃত 'গীতিনাট্য' ব'ল্‌তে যা বুঝায়, বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে তা একখানিও ছিল না। রবীন্দ্রনাথই এদেশে গীতিনাট্যের প্রথম স্রষ্টা। এছাড়া 'রূপক' নাটকের রূপদক্ষ নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও দাবী সকলের চেয়ে বড়। 'রাজা' 'ডাকঘর' 'অচলায়তন' 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি যে কোনও একখানি নাটক পড়লেই এ সত্যটুকু উপলব্ধি ক'রতে পারা যায়।

এই সেদিন, মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে 'বিচিত্রা'র আসরে যখন রবীন্দ্রনাথের 'ডাক ঘর' অভিনয় হয়েছিল, যে সকল ভাগ্যবান দর্শকের সে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল তারা আজও সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের কথা ভুলতে পারেনি। কবি স্বয়ং এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। ভাবে, ভঙ্গীতে, সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে তিনি সেদিন যে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা' রঙ্গশিল্পের শ্রেষ্ঠতম রূপদক্ষেরই দক্ষতার পরিচায়ক। তাঁরই শিক্ষকর্তায় ডাকঘরের অভিনেতৃসঙ্ঘ শিক্ষিত হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সাহায্যে তিনিই রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা

---

* "In every day life, when we are mostly moved by our habits, we are economical in our expression; for then our soul-consciousness is at its low level,—it has just volume enough to glide on in accustomed grooves. But when our heart is fully awakened in love, or in other great emotions, our personality is in its flood-tide. Then it feels the longing to express itself for the very sake of expression. then comes Art.........

"—What is Art? Personality" P.P. 17. Lecutures delivered in America.

By Rabindranath Tagore.

ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতি-ভার উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে সেদিন 'ডাক-ঘর' অভিনয়ের প্রত্যেক বিভাগে অপূর্ব্ব কলা নৈপুণ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া গেছল।

'ডাকঘরের' পরই 'ফাল্গুনীর' অভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমে 'কবি' ও পরে 'বাউল' রূপে 'ফাল্গুনী' নাটকের তাঁর অভিনয় সেদিন দর্শকদের বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত করে দিয়েছিল। দু'টি বিভিন্ন চরিত্রের বেশভূষা ও রূপসজ্জায় (Make-up) তিনি যে রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! নববসন্ত সমাগমে তরুণের দল যখন নেচে এলো, গান গেয়ে—

"ওরে, আজ ফাগুন লেগেছে বনে বনে!"

তাদের সে লীলাচঞ্চল ললিত নৃত্যভঙ্গীর মধ্যে সেদিন যে অনুপম সৌন্দর্য্যটুকু বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল, তা' যেন সেই সুদূর অতীতের এক গৌরবময় যুগের স্মৃতি-চিহ্ন বহন ক'রে এনেছিল! সেই চপল-চটুল হাস্যলাস্যময় ফাল্গুনী-সঙ্ঘ যেন 'অজন্তা' গুহার প্রাচীর চিত্রে অঙ্কিত অতুলনীয় নৃত্য-উৎসবের ছবিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল!

তাঁর 'অচলায়তন', 'অরূপরতন', 'বসন্তোৎসব', 'শারদোৎসব' প্রভৃতির অভিনয় যারা দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই হয়ত একটা ধারণা হ'য়ে গেছলো, যে 'দাদাঠাকুর' বাউল, "বৈরাগী" ইত্যাদি এই শ্রেণীর ভূমিকাতেই তিনি চমৎকার কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। তাঁর এ সকল অংশ অভিনয়ের মধ্যে একটা অভিনবত্বের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় এবং একটা নূতন সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়!

কিন্তু যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জ্জন' নাটকখানি অভিনয় ক'রেছিলেন; সেদিন লোকে তাঁর নাট্য-প্রতিভার আর এক অভূতপূর্ব্ব বিকাশ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিল! অভিনয়ের সুবিধা ও সৌকর্য্যের জন্য কেবল-মাত্র মন্দিরটিকেই কেন্দ্র করে সমগ্র নাটক-খানিকে একাঙ্কে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে তিনি প্রকৃত রূপদক্ষের মতো যে অভিনয় কলা কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন এদেশের রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে আর কেউ সেভাবে নাটকের প্রয়োগ কৌশল দেখাবার কল্পনাও করতে পারেনি। 'জয়সিংহের' ভূমিকায় তাঁর সেদিনের অপূর্ব্ব অভিনয় অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার অতুলনীয় গৌরব সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলেছিল! সেদিন তাঁর সে সুন্দর রূপ-সজ্জায়, সে অনিন্দ্য কণ্ঠস্বরে, তাঁর সেই প্রাণস্পর্শী এক অভিনব ধরণের আবৃত্তিতে, তাঁর সে স্বচ্ছন্দ আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, তাঁর সে প্রত্যেক শোভন অঙ্গসঞ্চালনে, তাঁর চ'খে-মুখের ভাব পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় 'বিসর্জ্জনের' কবি কল্পিত তরুণ জয়সিংহকে লোকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ ক'রতে পেরে-ছিল, অথচ তার মধ্যে কবিকে কোথাও ধরতে পারেনি!

স্থির ছিল যে তিনি একদিন 'রঘুপতির' ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হবেন, এবং সেজন্য তিনি প্রস্তুতও হয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণে তা' আর ঘটে ওঠেনি।

তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে, বহুবার তাঁর অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যে কোনও অংশের অভিনয়ে যে কোনও রসের অবতারণায় তিনি যে সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তা সেই 'বাল্মীকি প্রতিভার' যুগ থেকে আরম্ভ করে এই সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের নিকট 'মুক্ত-ধারা' পাঠের সময়ও দেখা গিয়াছে। সুসভ্য ও মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন অথচ প্রগাঢ় হাস্য রসের অবতারণায় রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখতে পাওয়া যায় তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'বশীকরণ' প্রভৃতি রঙ্গরসাত্মক নাট্যের মধ্যে।

অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত, ও তাঁর নাটক ও গীতি নাট্যের অগণিত গান ছাড়াও তিনি যে সহস্রাধিক সঙ্গীত রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিই কাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে কৌস্তভমণি স্বরূপ! তিনি কেবল এই অনুপম সঙ্গীতগুলি রচনা ক'রেই ক্ষান্ত হ'ন নি, সেই প্রত্যেক গানখানিতে আবার তার এক একটি নিজস্ব সুর ও সংযোজনা করেছেন! সে সঙ্গীত ও সুরের প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি এমন এক একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কেবল অসামান্য প্রতিভাশালী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁর সেই বিচিত্র সুর সংযুক্ত অগণ্য সঙ্গীতের প্রত্যেকটি তিনি নিজে গান ক'রে শুনিয়েছেন এবং অপরকেও সেই সুরে যেগুলি গাইতে শিখেয়েছেন। সঙ্গীতকে তার প্রাচীন নিগড়ের কঠিন বন্ধন-পাশ থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি তার নির্জ্জীবতা অপসারিত ক'রে, তাকে আজ নব জীবনে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন! কলা বিদ্যার মধ্যে গানের স্থান যে কত উচ্চে একথা সর্ব্বজন বিদিত। রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গীতকার শিল্পীর মণি খচিত রত্ন সিংহাসন খানিও আজ নিজ গুণে অধিকার ক'রে তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করেছেন।

মনে পড়ে সেই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে কলিকাতায় (টাউন হ'লে) একবার শিবাজী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বিরাট জনসমাগমে 'টাউন হল' যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। ৺সুরেন্দ্রনাথের মতো উচ্চকণ্ঠ বাগ্মীকেশরীও সে বিপুল জনতাকে তাঁর বাণী শোনাতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উঠে যেই তাঁর সেই ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি সুরু করলেন—

"কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে
হে রাজা শিবাজী—"

লক্ষ লোকের সেই মহতী জনতা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল! মুগ্ধ হ'য়ে সকলে কবির সেই কিন্নর কণ্ঠের আবৃত্তি শুনতে লাগল! টাউন হলের সর্ব্বশেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সেদিন কবির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল! তার পর তাঁর নিজের আরও কত কবিতার আবৃত্তি তাঁর মুখে আমাদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে আবৃত্তি যারা শুনেছে তাদের কানের ভিতর দিয়ে প্রাণের তারে গিয়ে সে স্বরটি

যেন চিরকালের জন্য আটক হয়ে আছে, তাই আজও সেখানে তার রেশটি বাজছে! রবীন্দ্রনাথের সে আবৃত্তি মাধুর্য্যের যেন তুলনা হয় না!

কিছুদিন পূর্ব্বে 'গৃহ-প্রবেশ' অভিনয় করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যতীনের অংশ কবি স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। দিন কয়েক নাটক খানির মহলাও চলেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁর সে অভিলাষ আর কার্য্যে পরিণত করতে পারেন নি। এই সময় ষ্টার থিয়েটার 'গৃহপ্রবেশের' অভিনয় আয়োজন করেন। উক্ত থিয়েটারের কয়েক জন সুদক্ষ অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের নিকট অভিনয় শিক্ষার জন্য নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করেন। আজ যে প্রকৃত কলাভিজ্ঞগনের নিকট ষ্টারের "গৃহপ্রবেশ" রঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ দান বলে সাব্যস্ত হয়েছে তার মূলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার জাদুমন্ত্র বিদ্যমান!

আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলি যদি রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রয়োগ-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা ও পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহ'লে তারা যে পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করতে পারেন একথা রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা অনায়াসেই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন, কারণ আজ অনন্ত সুন্দর 'আর্টের'বহু বিস্তৃত রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের রাজ-সিংহাসন, পৃথিবীর উচ্চে এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র!

চিত্রাঙ্কণ বিদ্যাতেও রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হাত আছে, একথা হয়ত অনেকেই জানেন না। ছবি আঁকাতেও তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ নন! তাঁর নিজের হস্তাক্ষর চিত্রের মতোই সুন্দর! তিনি কিছু লিখতে লিখতে কোনও স্থান যদি কেটে-কুটে পরিবর্ত্তন করেন তাহ'লে সেই কাটা অংশটুকু তিনি এমন চমৎকার চিত্র-বিচিত্র করে রাখেন, যে তাঁর হাতের লেখা সেই পাণ্ডুলিপিখানি কাটাকুটির জন্য নোংরা হওয়া দূরে থাক্ বরং সেটা একটা অতিরিক্ত আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে ওঠে!

একদিন যখন কবির কাছে গিয়ে বলা হোলো যে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জন্য আপনি আরও দু'চারখানা নাটক লিখে দিন, এবং মাঝে মাঝে তার অভিনয় আয়োজন করে দেখিয়ে দিন যে উচ্চ শ্রেণীর নাটক অভিনয়ের আদর্শ কি রকম হওয়া উচিত। উত্তরে তিনি বলেন তা পারি—"এখনও পারি, শুধু আমাকে তোমরা অন্য দিক থেকে ছুটী দাও"—অন্য দিক থেকে ছুটী হয়ত তাঁকে দিতে পারা যেতো, কিন্তু তাহ'লে যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনতে পাওয়া যাবে না; কবি রবীন্দ্রনাথের বাঁশীতে পূরবীর সন্ধ্যারাগ আর বেজে উঠবে না। কথা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বন্ধ হবে, গুরু রবীন্দ্রনাথের উপদেশ বাণী অশ্রুত থেকে যাবে! আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপাসনায় স্তোত্র গাথা স্তব্ধ হবে! আমরা যে আজ সকল রকমে দীন, তাই আমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মতো তাঁর সমস্ত আনন্দ রসের ঐশ্বর্য্যটুকু এক সঙ্গে পেতে চাই!—এবং তা যে পাওয়াও যাবে এ বিশ্বাসও আমাদের আছে! শুধু তাঁর এই শুভ জন্মতিথি বর্ষে বর্ষে অক্ষুরন্ত হ'য়ে ঘুরে আসুক ভগবানের কাছে এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা]।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীশান্তা দেবী

খুব অল্প বয়সে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত একখণ্ড রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী হাতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে গল্প পদ্য গদ্য প্রবন্ধ সবই একসঙ্গে পাওয়া যাইত। কিন্তু তখনকার বয়সে কাব্য মনকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিত না। সুতরাং তাহা কোনোদিন পড়িয়া দেখি নাই। সকলের আগে মন যাইত ইউরোপ প্রবাসীর পত্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসঙ্গে বাক্সের উপর "নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য" করিয়া কি করিয়া যে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন এবং ভুল করিয়া অপরের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়া কি রকম গোলমাল বাধাইয়াছিলেন এই সকল বর্ণনাই ছিল আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে গল্প গুচ্ছের দিকে মন ঝুঁকিতে লাগিল। তখন কেবলমাত্র নিছক হাস্যরস ছাড়া অন্য রস সন্ধানও মন করিত। সে ছিল বিস্ময় রস। কোন্ কোন্ গল্প তখন পড়িয়াছি মনে নাই, কিন্তু এই বিস্ময় রসকে যে সকল ছবি জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং আপন মনে নব নব ছবি গড়িয়া তুলিতে ও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি নানাগল্পের কাঠামো হইতে সরিয়া আসিয়া আজও একটি স্বতন্ত্র চিত্রশালার মত মনের একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বিস্ময়কর ছবিগুলি শুধু যে বিস্ময় জাগাইত তাহা নহে, ভীতিও জাগাইত। ভৌতিক বিস্ময়ের ভীতি মনকে যতই কাঁপাইয়া তুলিত, ততই সেই রহস্যময় অন্ধকার রাজ্যের ভিতর উঁকি ঝুঁকি দেওয়া বাড়িয়া চলিত, ছবিগুলি মনে আরো শিকড় গাড়িয়া বসিত।

মনে পড়ে জীবিত ও মৃতের কাদম্বিনীর সেই প্রথম ছবি। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-রাত্রির গভীর অন্ধকারে শ্মশানের কোলে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল সেত আপনার গৃহে নাই। মৃত্যুশয্যার কথা মনে করিয়া সে বুঝিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে অথচ সে দেখিতেছে যে সে বাঁচিয়াই আছে। কাদম্বিনীর মনের এই দ্বন্দ্ব আমার শিশু মনকে মহা সমস্যায় ফেলিয়াছিল। মৃত্যু যে কি জিনিষ, মরিয়া মানুষ কেমন করিয়া আপনার মৃত্যুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই কাদম্বিনীর মত আমারও মন সংশয় দোলায় দুলিত। অবশেষে মরিয়া কাদম্বিনী প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই। বাহিরের লোক বুঝিল বটে যে কাদম্বিনী প্রথমবার মরে নাই; কিন্তু কাদম্বিনী নিজে কি করিয়া বুঝিল সেইটা আমার কাছে রহিয়া গেল এক পরম সমস্যা।

"নিশীথে"র সেই পদ্মার চরে জোর হাসি, যাহা পদ্মাপার হইয়া দেশদেশান্ত লোক লোকান্তর ছাড়াইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াও মস্তিষ্কের সীমানা ছাড়াইয়া যায় না—মৃতের পরিহাসের মতই কানে বাজিত। মনে হইত যেন শুনিতে পাইতেছি। মাথার উপর দিয়া হাসির তীব্র সুর ভাসিয়া যাইতেছে, যেন অন্ধকারে শীর্ণ অঙ্গুলি বাড়াইয়া "ওকে, ওকে, ও কে গো?" বলিয়া দক্ষিণারঞ্জনের মশারির

চারিধারে কে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। মৃতাত্মার এই নির্ম্মমতার বেচারী দক্ষিণার প্রতি বড় করুণা হইত।

'মণিহারা' ফণি-ভূষণের ঘরে বর্ষার অন্ধকার রাতের পর রাত নদীর ঘাট হইতে সুরু করিয়া দেউড়ি পার হইয়া অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া সর্ব্বাঙ্গে হীরা ও স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়া হাড়ে গহনার খট্ খট্ ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলিয়া যে কঙ্কাল উঠিত, তাহার সমগ্র ইতিহাসটাই যে মিথ্যা প্রমাণ করা হইল কেন বুঝিতাম না ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী ছিল এক কথায় ইহা বলিয়া মন হইতে মণিমালিকার সালঙ্কারা কঙ্কাল মূর্ত্তিকে মুছিয়া ফেলা গেল না। কঙ্কালের সেই অবাস্তব ভীতি বিস্ময়কর কাহিনীই সত্য হইয়া বলিত নৃত্যকালী একটা পরিহাস মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নানা রস নানা রূপ ও নানা ভঙ্গী দেখা দিয়াছে। মানুষের মনের বহু বিচিত্র গতিকে বহু চিন্তা সমস্যা দুঃখ সুখ হাসি কান্না ও ছোট বড় অনুভূতির নানা স্তরকে তিনি তাঁহার লেখনীর সতেজ কোমল, দৃঢ় ও পেলব স্পর্শে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই স্পর্শের ছন্দ তঙ্গী ও দৃঢ়তা অনুসারে বিষয়ের বৈচিত্র্য হিসাবে রসের ও রঙের তারতম্য অনুসারে নানা দিক দিয়া দেখিলে গল্পগুলিকে নানা শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু এতগুলি শ্রেণী বিভাগ করিয়া এত রকমে তাহাদের রূপ ও রসের বিশ্লেষণ করা ক্ষুদ্র শক্তি, স্বল্পকাল ও অল্প স্থানের পক্ষে সম্ভব নহে। এখানে আমরা কেবল বিস্ময় রসের কথাই দুই একটা আলোচনা করিব।

জীবনে মানুষ আপনাকে ধন জন যৌবন হিংসা প্রেম মান মর্য্যাদা নানা জালে জড়ায়। এই পার্থিব জটিলজালই তাহার কাছে শাশ্বত হইয়া উঠে। অথচ সে জানে যে একদিন এই জাল ছিন্ন করিয়া সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া অথবা পিছনে ফেলিয়া তাহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে হইবে। ইহা হইতে মানুষের মনে একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। সমস্ত জীবন দিয়া মানুষ তিল তিল করিয়া যাহা গড়িল, যাহা বেষ্টন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াই প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বাঁচিল, তাহার ভিতর হইতে সে কোথায় যায়? যদি যায় তবে কি অতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার সৃষ্ট এই সংসারের চারি ধারেই ঘুরিয়া বেড়ায় না, ইহাকেই ফিরিয়া যাইতে চায় না! অজানা লোকে কেমন করিয়া সে শান্তি পায়? অথবা শেষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়!

জীবিত মানুষের অনন্তকাল এই দেহে কি পর দেহে বাঁচিয়া থাকিবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহারই সহিত আপনার ও পরের মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহল ও বিস্ময় মিলিয়া যে ভৌতিক বিস্ময় রসের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষ চিরকাল নানা কাহিনীর ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে তাহা ছিল নিছক ভূতের গল্প। তাহার ভিতর বর্ণভঙ্গিমার কি রেখা বিন্যাসের কোনো বালাই ছিল না; মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস ভয় বিস্ময় সংস্কার প্রভৃতির কোনো বিশ্লেষণ ছিল না; কেবল ছিল বিভীষিকাময় ও বিস্ময়কর রহস্য লোকের ছবি। কিন্তু মানুষের ভাবার ক্ষমতা চিন্তা শক্তি, আপনার অনুভূতি গুলিকেও বিশ্লেষণ ও, বিচার করিয়া

দেখিবার সামর্থ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সাহিত্য বস্তুর ছাচটির কারিগরী ও মাপ জোখ নানা নিয়ম মানিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতের গল্পের চেহারা বহুল পরিমাণে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহাকে মানুষ নিছক ভয় ও বিস্ময়ের ঘটনা মালা করিয়া রাখে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনার কৌতূহল, সংশয়, বেদনা, অতৃপ্তি, ক্ষোভ, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা সকল কিছুকেই প্রকাশ করিতেছে, আপনার বিচার বুদ্ধিকে ও অধ্যাত্ম বুদ্ধিকেও টানিয়া আনিতেছে। আবার সকল গুলিকে মিলাইয়া সাহিত্য সৃষ্টির একটি সমগ্র রূপও প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে হয়ত বিশেষ একটি রস কি অনুভূতি আর সব গুলিকে ছাপাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এতখানি উঠিতে পাইতেছে না যাহাতে ইহার বিশেষ ছন্দটির পতন হয় কি তাল কাটিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত না মৃত' 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'গুপ্তধন', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মাষ্টারমশায়' প্রভৃতি গল্পে এই বিস্ময় রসকে নানা ভাবে পাই। আবার 'মহামায়া' 'মধ্যবর্ত্তিনী' প্রভৃতি গল্পে যদিও ঠিক এই রসটি নাই, তবু ইহা যেন গল্পের মূল বস্তুটকে ছুঁইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনো গল্পেই ভৌতিক বিস্ময় রস অন্যান্য রসকে ও লেখকের সংশয়ও বিশ্বাসকে ছাপাইয়া চাপা দিয়া যাইতে পারে নাই। সে আপনার মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিয়াছে।

'মণিহারা' গল্পটি সাধারণ ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য বাড়িটি 'পোড়ো' এবং 'অভিশাপ গ্রস্ত' বলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে একটু রহস্যময় কৌতুহল জাগাইয়া তোলা হয়। কিন্তু তারপরই গল্পটি একেবারে আমাদের পরিচিত সংসারে নামিয়া আসিয়াছে, নায়কটি নব্যবঙ্গ, নায়িকা অলঙ্কার-বিলাসিনী সুন্দরী সুগৃহিণী; সুতরাং ইহার ভিতর রহস্য লোকাতীত হইয়া উঠিবার কোনো ঠাঁই নাই। মণিমালিকা ঢাকাই শাড়ী ও বাজুবন্ধ পরে এবং রন্ধনে নুন ঠিক দেয়; অতএব তাহাকে লইয়া যে গল্প রচিত হইবে সে তাহার স্বামীর মনোরাজ্যের ও গৃহ কোণের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিসের হইতে পারে? সেই ছন্দেই গল্প চলিতেছিল। হঠাৎ ছন্দ বদ্‌লাইয়া গেল। গহনা লুকাইবার তাড়ায় মণি বাপের বাড়ী পালাইলে শূন্য গৃহে নায়ক ফণি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হঠাৎ সেই 'পোড়া' অভিশাপ-গ্রস্ত বাড়ীটার ছবি অল্পে অল্পে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইবার বুঝি কি ঘটে! গভীর রাত্রি নির্জ্জন গৃহে 'জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারের' সাম্‌নে শ্রাবণ বর্ষণের মধ্যে একাকী জাগিয়া ফণি বসিয়া আছে; রহস্য এইখানেই গভীর-হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই কঙ্কাল ও অলঙ্কারের ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ নদীর ঘাট হইতে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত রাতের পর রাত কঙ্কালময়ী সালঙ্কারা মণিমালিকার আসা যাওয়া, পড়িতে পড়িতে গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। ফণি জাগিয়া উঠে দেখে কেহ কোথাও নাই। এই খানে যেই রহস্য গভীরতর হইয়া উঠিল, ভৌতিক বিস্ময় উগ্র হইয়া উঠিল অমনি লেখনীর মুখে সংশয়ের সুর ধ্বনিয়া উঠিল। সত্য যাহা ছিল তাহা স্বপ্ন হইল; আবার স্বপ্নই সত্য কি জাগরণ সত্য সে লইয়াও দ্বন্দ্ব লাগাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না। সেই রাত্রের স্বপ্ন জাগরণ মিশ্রিত নাট্যের অভিনয় আবার চলিল।

এবার কঙ্কালের পিছু পিছু ঘাটে আসিয়া ফণি জলে নামিল। তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, কিন্তু নিশিতে ডাকার যে চিরপ্রচলিত গল্প আছে, সেই গল্পেরই মত তাহার পরক্ষণেই সলিল সমাধি হইল। কঙ্কালময়ী মণিমালিকার এ ডাককে যখন গভীরতম রহস্য বিস্ময় ও ভীতির সোপানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, তখন ও তাহাকে পাছে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া যায়, তাই লেখক ফণির শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন ফণিভূষণের তন্দ্রা টুটিয়া গেল·········স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।' পাছে রসভঙ্গ হয় তাই আগেও একথা বলেন নাই, শেষেও বেশী জোর দেন নাই। কিন্তু এই স্বপ্নলীলাকে এতখানি ভয়ঙ্কর করিতে তাঁহার প্রাণে লাগিল, কাজেই তার ভয়ঙ্কর রূপটা দেখাইবার পুরা-পুরি আনন্দ পাইবার পর হঠাৎ সদয় হইয়া তিনি সমস্তটাকে একটা পরিহাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। এতক্ষণ যে গল্প শুনিতেছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "আমার নাম ফণিভূষণ এবং আমার স্ত্রীর নাম ছিল নৃত্যকালী।" গল্পের কাঠামোর ভিতর কোথাও ঘা লাগিল না, কারণ তাহা যতখানি মনস্তত্ত্ব চর্চ্চা করিবার লোভ প্রেম ইত্যাদির রূপ দেখাইবার এবং ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া ভয়ঙ্কর পরিণতিতে আনিবার তাহা আনিয়াছে। লেখকের গল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরই পাঠকের বুকের বোঝাটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য সহাস্যে তিনি বলিলেন "ওটা আগাগোড় পরিহাস্য" এ যেন প্রাণ ভরিয়া গালাগালি করার পর তাহা প্রত্যাহার করা। মনের ঝাল মিটাইয়া গালি দেওয়া হইল, আবার মানহানির মোকদ্দমা এবং মিথ্যা ভাষণের পাপও বাঁচিয়া গেল।

এমনি করিয়া সকলগুলি বিস্ময় রসের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় সর্ব্বত্রই নানা রসের মাত্রা কেমন ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে যে রসে যাহার বিশেষত্ব তাহাতে সে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যায় নাই। তাহার একটা মনগড়া মীমাংসাও করিয়া লইতে হয় নাই। তাহাও গল্পের ভিতর হইতেই হইয়া গিয়াছে।

একমাত্র 'ক্ষুধিত পাষাণে' আমরা দেখি বিস্ময়রসকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চরম বিস্ময়ের কোঠায় পাঠককে তুলিয়া দিয়া তিনি অকস্মাৎ ট্রেণে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। কেবল মনটা বোধ হয় একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল তাই যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন "লোকটা আমা-দিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল— গল্পটা আগাগোড়া বানান।"

ক্ষুধিত পাষাণের এই নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়রসের বিষয়ও বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু স্থানও নাই সময়ও নাই, তাই থামিতে হইল।

শেষকালে কেবলমাত্র একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বিচিত্র দিক সম্বন্ধেও কিছুই বলা হয় নাই, সকল গল্পের ভিতরই যে বিশেষ একটি বিশেষত্ব আছে সে বিষয়েও কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার ছোট গল্প মাত্রের ভিতরই একটি সুষমা ও সামঞ্জস্যের চিহ্ন আছে, তাহা কোথাও অতি বাস্তব হইবার আগ্রহে আর্টের বাঁধন ছিঁড়িয়া

খবরের কাগজের পুলিশ আদালতের রিপোর্ট কিম্বা মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকের রেকর্ড বই হইয়া দাঁড়ায় নাই। পঙ্কেও যেখানে তাহার জন্ম সেখানে সে পঙ্কজ হইয়া উপরের দিকে চাহিয়াছে, কারণ আর্ট মাটি নয়, মাটি হইতে গড়া স্রষ্টার হাতের প্রতিমা, আর্ট কালী নহে, তুলির লিখনে আঁকা ছবি। সৌন্দর্য্য, সংযম, সুবিন্যাস ও সুসঙ্গতিই যে তাহার জীবন তাহা রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ ভুলিলেও তিনি কখনও ভোলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্বসৃষ্টিকে উল্টো দিক থেকে দেখ্‌লে কেবল তা'র বিচিত্র শক্তির দিকেই চোখ পড়ে, সেখানে সমস্তই আপেক্ষিক এবং আকস্মিক বলে' ভ্রম হয়, চরমের আনন্দময় উপলব্ধির অভাবে সমগ্রের রূপ আমাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। এ রকম অবস্থায় কাব্যের মূলগত আনন্দে প্রবেশ না হওয়ায় মনে ভাব্‌তে পারি বিচ্ছিন্ন শব্দের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষেই বুঝি কাব্যের পরিচয়, অর্থাৎ কেবল উপকরণ আছে, এবং গতি আছে, হয়ত কৌশলের খেলাও থাক্‌তে পারে, কোথাও কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু জ্ঞানী তাঁর উপলব্ধির যোগে কাব্যের ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে পারেন ব'লে তাঁর কাছে বস্তুর বন্ধন আর থাকে না, পরম আলোকে তিনি অন্তরের ঐক্যটিকে বিচিত্র সম্বন্ধের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পান। সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পূর্ণের মহাপট ভূমিকায় রূপ পর্য্যায়ের বিচিত্র ধারা তাঁদের কাছে অন্তরের সামঞ্জস্যে ব্যঞ্জনা-ময় হয়ে ওঠে ব'লে তাঁরা বাধাকে নিয়মকে একান্ত করে' দেখেন না, মানুষের কাছে তাঁরা একটি পরম মিলনতত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হন, সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে দেখার মরীচিকা ভ্রান্তিবশত মানুষের যে এত যন্ত্রণা, সেই দুঃখের কারণ তাঁরা ভিতর থেকে দূর করে' দেন।

যুগে যুগে মহাপুরুষ লোকালয়ে এসেছেন এই বাণী নিয়ে, কালের বিভিন্নতায় তা'র প্রকাশ এবং প্রয়োগ ভিন্নরূপ নিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের যুগে ঋষি যখন দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানকে ডেকেছিলেন, বুদ্ধদেব অপরিমেয় মানসসংস্কার দ্বারা মানুষকে দুঃখ-পারের পথ দেখিয়েছিলেন, খৃষ্ট এক পিতার পুত্ররূপে সকলের প্রেমকে অনন্তের দিকে উদ্বোধিত করেছিলেন, মানুষের কাছে অস্তিত্বের এই আনন্দময় মিলনের সম্বন্ধটিই নির্ম্মল, সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সেই বাণী আজ নবযুগের দ্বারে এনেছে, তাঁর সমগ্রজীবনের মধ্য দিয়ে, কাব্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে সর্ব্বমানবের মিলনতত্ত্বটি পরম প্রকাশিত হয়েছে।

কালের ক্রমপরিণতিবশত সত্যকে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিতে হয়—তার মধ্যে বর্ত্তমানের সঙ্গে বিশেষের সঙ্গে সেই যোগ থাকা চাই যাতে মানুষ তাকে সহজে আপন

ব'লে চিন্‌তে পারে, আপন করে' নিতে পারে। আজ্‌কের দিনে মানুষ যেখানে বাধা বিরুদ্ধতায় পীড়িত, যেখানে মোহাবরণে তা'র সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন, সেই বেদনায় বিশ্বভারতী শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছে, তাকে আলো দেখিয়েছে। মানুষের শক্তি এবং তা'র প্রয়োগক্ষেত্র আজ্‌কের দিনে বহু প্রসারিত, নিবিড়তর, কিন্তু তা'র সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণরূপে পরম অভি-প্রায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না ব'লে তা'র চিত্ত আজ ভারগ্রস্ত, সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না, তা'র নিজের বিচিত্র শক্তির বেগ সৃজনলীলার আনন্দে যুক্ত হতে না পেরে প্রতিনিয়ত নিজেকেই মর্ম্মাহত করছে। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, মানব সভ্যতার ভিতরেও শক্তির জাগরণ অনন্তের উপলব্ধি নিয়ে সত্যে প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তার অন্তরে অন্ধ আন্দোলনের অন্ত নেই, তখন বিচিত্র শক্তির বিবিধ অপব্যয়, আত্মবিরুদ্ধতা, অকারণ উত্তেজনা, তীব্র অবসাদ। চরমের স্পর্শ পাওয়া মাত্র তা'র এই দৈন্য দশা ঘুচে যায়, তা'র জ্ঞান ও কর্ম্ম, প্রেরণা ও প্রকাশ অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে বিবৃত হ'য়ে সুষমায় অভিব্যক্ত হতে থাকে, তার সমস্ত বেদনা পরম চেতনায় ধন্য করে' তোলে। মানব ইতিহাসে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি, উদ্বেগ, এত বিচিত্র বহুমুখী উদ্যমের সংঘর্ষজনিত উগ্র উত্তেজনার আবর্ত্তন কখনো এমন একান্ত, সর্ব্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়নি—এতেই বোঝা যায় মানব সভ্যতা একটি নব-জাগরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, তার এতদিনকার সঞ্চিত শক্তি সত্য সমন্বয়ে মুক্তিপথ খুঁজছে, অতীতের খণ্ড বিভক্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না, অথচ আত্মার যে বড় আশ্রয়ের যোগে তার শক্তি সত্যে সৃজিত হয়ে উঠতে পারে তাকেও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দৃঢ় করে অধিকার করতে পারছে না। প্রাচ্য মহাদেশে বহু সাধকের আবির্ভাবে অনমনে চরমের ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে এর সত্যতা রাখ্‌তে পারেনি ব'লে বারেবারে তার ইতিহাস কখনো আবদ্ধ চেতনাকে তীব্র করে' পাওয়ার চেষ্টা, আবার ঐকান্তিক সাধনার প্রতিক্রিয়ারূপে কখনো অবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের স্থানে অসংবৃত ভাব বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে—দুয়েরই মূল সত্যের সঙ্গে কর্ম্মময় যোগের অভাব। আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করেছি মন্ত্রে, পশ্চিমদেশের লোক স্বভাবতই সচল এবং ক্রিয়াশীল ব'লে তারা যন্ত্রঃ প্রতি আস্থাবান, তারা বিশ্ব ব্যাপারে শক্তিকে স্পষ্ট করে' উপলব্ধি করেছে এবং তাকে নিজের অনুকূল করে তোলার সাধনায় জড় জগতে জীবজগতে ওরা জয়ের পরিসর বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু সত্যকে প্রয়োগ করতে না পারলে যেমন তার প্রাণধর্ম্ম ক্ষীণ হয়ে আসে, তেম্‌নি চরমকে পূর্ণকে স্বীকার না করলে কর্ম্মও সৃজনধর্ম্মী না হয়ে কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনতন্ত্রের ব্যর্থতায় আপনার দুর্গতিকে ডেকে আনে। এই জন্যে বুদ্ধদেব বলেছেন রূপরাগ, অরূপরাগ দুইই পরিত্যাজ্য; যে মৈত্রীজ্ঞানে দুয়ের সমন্বয় বিশ্বভারতীর প্রথম কথাই হচ্ছে তাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে আহ্বান করেছেন কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়, বিশ্বভারতীর আনন্দময় মিলন বাণী পূর্ব্বপশ্চিমকে অভিন্ন প্রেমের সার্থকতার সন্ধান দিয়েছে, ঐ প্রেমের যুক্ত সম্বন্ধেই আত্ম-

জ্ঞান এবং সেই কারণেই এতে অহংকার রিপুর ক্ষয়, মঙ্গলকর্মের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মধ্যে এই আলো এলেই সে পরমের ঐক্যবোধে সৃজনের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করে, এবং তখনই সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে কর্মের বিভিন্নতায় আত্মপ্রকাশের শক্তি পায় কারণ মিলনের অর্থ স্বাতন্ত্র্য বিলোপ নয়, সত্য সম্বন্ধ। বিশ্বভারতীর আদর্শ মানবের ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে' তাকে ব্যক্তিবিশিষ্টতায় আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়ে দেওয়া। ইউরোপে আজ আত্মার দুর্বলতায় লোভকে বিরোধ করে তুলে তারই যোগে কর্মকে স্থায়ীত্ব দিতে চেষ্টা করছে, কারণ তাঁরা অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে; তাই পশ্চিমদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এক প্রধান পুরোহিত তাঁর ইতিহাসে বিচিত্র প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে মানব সরলতায় আত্মা নামক নূতন এক শক্তি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা লিখেছেন। এই নূতন শক্তিকে সুবিধামত প্রয়োগ করে' বিশেষ বিশেষ দেশকে একত্র বন্ধনে যুক্ত করতে তিনি যত্নবান; আমাদের দেশে ভাব সম্ভোগসাধনায় সনাতন মূর্ত্তি বিগ্রহকে ধ্যানের উপকরণ করে' তুলে শক্তির বৈচিত্র্যকে আমরা উপেক্ষা করেছি দুঃখে অভিভূত হয়ে সমগ্রের যোগবিচ্ছিন্ন বিশেষ শক্তির প্রয়োগে আশু ফল প্রাপ্তির আশায় দেশাত্মার পূর্ণ জাগরণের চিহ্ন নেই, মোহ আছে। কিন্তু আজকের এই যুগসন্ধির দিনে কোনো সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের আহ্বানে আত্মার অবমাননা মানুষের সইবে না, আজ তার সমস্ত শক্তি সমস্ত বেদনা চরমকে স্পর্শ করতে চায়, সব চেয়ে যা বড় তার কমে আর তার অধিকার নেই। সমস্ত উত্তেজনা সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যে আজ আমরা সেই মঙ্গলময় আশার বাণী শুনতে পেয়েছি। আমাদের দুঃখের তপস্যায় ধ্রুব জ্যোতি এসে পৌঁছেচে; বিশ্বভারতী আমাদের কাছে সেই আনন্দময় মুক্তির সন্ধান এনেছে—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং। উপনিষদ বলেছেন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করা যায় ধাতু প্রসাদাৎ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নাবস্থায়; চিত্তকে শান্ত ক'রে, বাধাকে বিরোধকে শুভ বুদ্ধির দ্বারা সংহত করে' আজ আমরা বিশ্বভারতীর এই অমৃত বাণীকে সহজেই গ্রহণ করতে পারব। পূর্ণের আহ্বানে মানুষের বিচিত্র শক্তি সৃজন ধর্ম্মী হয়ে ওঠে, তার প্রাণ মন চৈতন্যময় কর্ম্ম বিকাশে মুক্তির স্বরাজ সাধনায় জয়ী হয়ে চলে, আশ্রম নিকুঞ্জবনে যে সত্যের প্রেরণায় জ্ঞানী তপস্বী শিল্পী কর্ম্মী মুক্তির উৎসবে যোগ দিয়েছেন, তার আলো আজ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত অজ্ঞানের দিকে আজ শুভ জাগরণের চিহ্ন আবরণ ভেদ করে' দেখা দিয়েছে। এই পূর্ণ সত্যের সাধনায় মানুষের নানা জাতির আত্মীয়তা, নানা শক্তির সমন্বয়, কল্যাণ কর্ম্মে, ত্যাগে সাহচর্য্যে এইখানেই আমাদের চিরদিনের আশ্রয়, চিরদিনের মুক্তি।

আজকের দিনে আশ্রমে আমাদের এই পুষ্পিত আনন্দ উৎসবে, আচার্য্য দেবের জন্ম দিনে বিশ্বভারতীর মিলন বাণীকে আমরা প্রণমিত অন্তরে গ্রহণ করব, আমরা ধন্য হব।

Regd. No. C 899.]

[৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা ।

শান্তিনিকেতন পত্র

আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩৩

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা ।]

[বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য তিন আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্য্যন্ত "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময়মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দর সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠা ৬৲, আধ পৃষ্ঠা ৩।০, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া জানিতে হয়।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৬। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

৭। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৮। পুরাতন বা নূতন গ্রাহকগণ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার সময়ে কুপনে নাম ও ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

পোঃ শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)

শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ | আষাঢ়, শ্রাবণ সন ১৩৩৩ সাল | ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা

বিশ্বভারতীর আদর্শ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে বাধা দান করা। হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য শিক্ষিত ভারতের মন জাগ্রত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের সৃষ্টি। ব্রাহ্মসমাজ অপৌত্তলিক ঔপনিষেদিক ব্রহ্মোপসনা প্রচারদ্বারা ভারতের জাতীয় সমস্যা সমাধানে মন দিলেন। আর্য্যসমাজ অপৌত্তলিক বৈদিক ধর্ম্ম পুনপ্রবর্ত্তন ও প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে নব জাগরণ আনয়ন করিলেন; রামকৃষ্ণ মিশন বৈদান্তিক মতের সহিত লৌকিক প্রতীক পূজাদির সমন্বয় করিয়া হিন্দুসমাজে আর এক স্রোত আনিলেন। বর্ত্তমান ভারতে এই তিনটি সম্প্রদায় ভারতের চিন্তা ধারাকে প্রধানত গঠিত করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না।

ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক জীবন ও বাস্তব জগতের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শের কথা প্রচার করেন। মহর্ষি সেই আদর্শই জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের কাছে বাস্তব জগতের বোঝা বড়ই কঠিন; বাস্তবের পীড়নে আত্মিক ও আদর্শের সাধন ম্লান হইয়া যায়, সেইজন্য মানুষের পক্ষে মাঝে মাঝে তাহার অন্তরের শূন্যতাকে আধ্যাত্মিক রসে পূর্ণ করিয়া লইবার প্রয়োজন। মহর্ষি সেই

সাধনার জন্ম স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম হইতে মুক্তি লইয়া মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস করিতেন হিমালয়ের মধ্যে বা গঙ্গার তীরে। কিন্তু সকলের পক্ষে সে সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয় তাহা তিনি জানিতেন। সেইজন্ম তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন—যেখানে আধ্যা-ত্মিক জীবন লাভেচ্ছু সাধারণ গৃহী ও সংসারী মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাদের শূন্য মনকে পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন। পৃথিবীর যে কোনো ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে আসিয়া নির্জ্জন সাধনা করিতে পারেন; তবে সেখানে কোনো প্রতিমা পূজা হইতে পারিবে না। প্রতিমার ত' অন্ত নাই; সে-জিনিষ প্রবেশ করিলে দু দিনে সব শান্তি নষ্ট হইবে। কোনো ধর্ম্মের নিন্দা সেখানে হইবে না; ধর্ম্মের নামে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা হীনবৃত্তি জাগিয়া উঠে, দেবতার নামে দানবের পূজা হয়; সেইজন্ম কোনো ধর্ম্মের নিন্দা সেখানে হইতে পারে না। মানুষের আহার সম্বন্ধে রুচি বিচিত্র; কিন্তু পশু বধ ও মাংসাহার লইয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিরোধ অনেক নরহত্যাও হয়; সেইজন্ম কি দেবতার নামে কি আহারের নিমিত্ত পশুহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।

মন্দিরে কোনো প্রতীক কোনো বেদী নাই—সেখানে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে পারেন; অন্তরের ইষ্টদেবতাকে লইয়া বিরোধ করিতে পারে না। কোনো জীবহত্যার দ্বারা কোনো সম্প্রদায়ের বা কোনো জাতির মনে সামান্ত আঘাতও দেওয়া হয় না। ধর্ম্মের বা মহাপুরুষদের নিন্দা হয় না বলিয়া কোনো ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষেই এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিবার বাধা নাই। সর্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ব্যর্থ চেষ্টা তিনি করেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন হিন্দুর ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সকল ঈশ্বর লাভেচ্ছু শান্তিনিকেতনে সাধনার জন্ম আসিতে পারেন,—ধর্ম্ম বাহিরের সংজ্ঞামাত্র।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস সুরু এইখানে। তারপর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। দুই এক-জন মুমুক্ষু ব্যক্তি আসিতেন কিন্তু মহর্ষি যে আদর্শে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল বলিয়া মনে হইল। লোকে যখন তাঁহাকে এই মরুভূমিতে অর্থ অপব্যয়ের জন্ম তিরস্কার করিত, তিনি বলিতেন "তোমরা ভাবিও না, কাজ হইবেই।" সাধকের সেই বিশ্বাস পূর্ণ হইল এর পঞ্চাশ বৎসর পরে 'বিশ্বভারতী' স্থাপনার দ্বারা। 'বিশ্বভারতী'র আদর্শ আজ রাজা রামমোহনরায়ের ও মহর্ষির আদর্শকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। শান্তি-নিকেতনে সেই জিনিষটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়াছে ও তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন কিরূপ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত তাহারই ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব ধর্ম্মান্দোলনের সুরু হইয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; য়ুরোপীয় সভ্যতার ও খৃষ্টান সমাজের আক্রমণ হইতে হিন্দু ভারতকে রক্ষা করিবার জন্ম চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছিল। ভারতের তিনজন মনীষি প্রচীন হিন্দু-ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠনের কল্পনা করিতেছিলেন। পণ্ডিত মুন্সীরাম (শ্রীশ্রদ্ধানন্দস্বামী) আর্য্যসমাজের আদেশানুযায়ী ভারতের তরুণ মনকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিবার ইচ্ছায়

হরিদ্বারে 'গুরুকুল' স্থাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঔপনিষেদিক ধর্ম্ম নবীনভারতের জীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবজনের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র দিবার জন্য বেলুড়ে 'মঠ' স্থাপন করিলেন। এই তিনটি ঘটনা একই বৎসরের মধ্যে বোধ হয় ঘটে; ১৯০১ সালে গুরুকুল ও শান্তিনিকেতন সালে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুজাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছিল—তাহারই গঠনশীল (Constructive) রূপ এই তিনটি স্থানে প্রকাশ পাইল। হিন্দুজাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা তখন অভিন্ন ছিল; রবীন্দ্রনাথ, মুন্সিরাম, বিবেকানন্দ তীব্রভাবে স্বাদেশিক (Patriot) ও হিন্দু। রবীন্দ্রনাথের সেইযুগের লেখার মধ্যে সেই হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই; তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধ মোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই।"* তাঁহার রচনাবলী হইতে তাঁহার হিন্দুজাতীয়তার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রগণকে দীক্ষাদান, বিশেষ মন্ত্রাদি শিক্ষার ব্যবস্থা এক সময়ে করা হইয়াছিল।

এইভাবে বিদ্যালয় বাড়িতে লাগিল একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানরূপে, যেখানে প্রাচীনভারতের চিত্র কবি ফুটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চারি বৎসর পরে। তখন কবি কিরূপভাবে তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন হিন্দুমুসলমান বিরোধ দেখা দিল ও হিন্দু তাহার রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মুসলমানকে আহ্বান করিল—ধর্ম্মবোধ হইতে নয়,—তখনই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞানে আঘাত লাগিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মকে হিন্দুত্বের উপর বসাইয়াছেন। তিনি ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ভারতের যে সমস্যা তাহা হিন্দুসমস্যা নহে তাহা 'ভারতীয়' সমস্যা। তিনি লিখিয়াছেন, "একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানদের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।"* গোঁজামিল দিয়া জাতি গঠিত হয় না, ধর্ম্মও রক্ষা হয় না।

শান্তিনিকেতনে তিনি মুসলমান ছাত্র আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এখানকার ভিতরের বাধা তাহা বহুকাল আটকাইয়া

* রবি-আগরতলা ১৩৩৩।

* হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—পরিচয় পৃঃ ৭৪।

রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব আবার এমন নহে যে যাহা তিনি নিজে বুঝেন তাহাই অন্যের উপর জোর করিয়া চাপাইবেন; তিনি পাশবিক বলেরও যেমন বিরোধী, ততোধিক বিরোধী নৈতিক জুলুমের উপর। মানুষের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাই ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি থাকিলেন। একদিন আসিল যখন খৃষ্টান পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুস আসিলেন, মুসলমান ছাত্র আসিল, রান্নাঘরে হিন্দু ছাত্রদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া গেল। যেদিন শান্তিনিকেতন মুসলমান খৃষ্টানের জন্য দ্বার উন্মোচন করিল সেদিন শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের একটা বৃহত্তর জীবনের সূচনা হইল।

শান্তিনিকেতনে তথা-কথিত প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ থাকিল না; তাহা বর্ত্তমান ভারতের 'ভারতীয়' প্রতিষ্ঠান হইল, যথার্থ National হইল—হিন্দু-National মাত্র নহে। রবীন্দ্রনাথ বলেন ভারতের বাণী এই বাহিরের Elementকে গ্রহণ করা। কবিতায় তিনি যে বলিয়াছেন—

হেথায় আর্য্য, হেথায় অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,—
শক হুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন

ও তাঁহার ইতিহাসের ধারার মধ্যে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তার মর্ম্মকথা এই যে ভারত ও হিন্দু সকলকে গ্রহণ করিয়া বড় হইয়াছিল। গ্রহণের পালা সাঙ্গ হইলেই মৃত্যুর পালা সুরু হয়। ভারতের ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দিয়াছে। সুতরাং শান্তিনিকেতনকে যথার্থভাবে জীবন্ত করিতে হইলে তাহাকে ভারতীয়, তাহাকে National করিতে হইবে, কেবলমাত্র হিন্দু নহে।

তারপর আবার কয়েকবৎসর কাটিয়া গেল। য়ুরোপের যুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকায় গেলেন। যুদ্ধান্তে য়ুরোপে গেলেন। সর্ব্বত্রই মানুষের আর একটি রূপ দেখিলেন—সেটি হইতেছে Nationalism। জাপান ও আমেরিকায় তিনি Nationalismএর বিকট রূপের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিলেন। য়ুরোপ গিয়াও তিনি তাহারই বিরুদ্ধে বলিলেন। পশ্চিম তাঁহার কথা বুঝিল—শুনিল না অথবা শুনিল বুঝিল না। তখনই তাঁহার মনে হইল, যে পৃথিবীতে এমন একটি স্থান হোক যেখানে মানুষ নিজের জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়া, নিজের ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া, নিজের সংস্কারের গণ্ডী ছাড়িয়া একটা বৃহত্তর মানবতার জন্য, একটা যথার্থ অধ্যাত্ম জীবনের জন্য সাধনা করিবে। ইতিপূর্ব্বেই শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হয় (১৯১৮ সালে)। তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর জ্ঞান চর্চ্চা মাত্র। কিন্তু ক্রমেই কবি বুঝিতে পারিলেন যে এই জ্ঞান চর্চ্চাই মানুষকে এক করিতে পারে না; য়ুরোপে জ্ঞানের ত' অভাব নাই; উহার জ্ঞানের অন্তরালে কি কালসর্প লুক্কায়িত রহিয়াছে! সুতরাং জ্ঞানের পিছনে ধর্ম্মজ্ঞান থাকা চাই। সে ধর্ম্ম কোন শাস্ত্রের ধর্ম্ম নয়—কোনো গুরুর ধর্ম্ম নয়—সহজাত মানবধর্ম্ম। সে-ধর্ম্ম এককালে ভারতবর্ষ দিয়াছিল জগৎকে। সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া আজও ভারতের এক ঋষির পদতলে প্রতিদিন মাথা নত করিতেছে। ভারতের সে-বাণী কি? সে-বাণী মৈত্রী।

দর্শনের জটিলতার মধ্যে না গিয়া মানুষ নিজ জীবনে সহজ আনন্দ পাইতে পারে—ও লৌকিক জীবনে মৈত্রী প্রদর্শন করিতে পারে ও সবার বাহিরে সবার উপরে যে আত্ম-জগত সেখানে ধ্যানলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। কবির জীবন ত' এই কথা সাক্ষ্য দিতেছে—বিশ্বভারতীও আজ সেই কথা প্রচার করিতেছে। মানুষের সহজ-আনন্দ—তাহার রসের আনন্দ—তাহার জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিত্র, কলা, কার্য্য, সঙ্গীত, নৃত্যময় পৃথিবীকে, আনন্দে উপভোগ করা। আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার দিয়া এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় পৃথিবীকে পাওয়া হইতেছে এই সহজ-আনন্দ।

কর্ম্মের মধ্যে, সেবার মধ্যে মানুষ 'মৈত্রী' সাধন করে। বিশ্বভারতীর চতুর্দ্দিকে আজ সে-সুযোগ উপস্থিত। পল্লীসংস্কার আমাদের 'মৈত্রী' ভাবনার রূপ। এই সবের মূলে হইতেছে বিশ্বভারতী যেখানে ধ্যানের দ্বারা জগৎকে অখণ্ড করিয়া দেখিতেছি। মানুষ সেই ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া বিরোধ করে না। বৃহত্তর সাধনার মধ্যে সমস্ত নিমজ্জিত হয়। সেই জন্যই আজ সাহস করিয়া রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, সকল বর্ণের ও মতের লোককে নিঃসঙ্কোচে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তিনি বলিতেছেন জীবন ধ্যানের দ্বারা দৃঢ় হউক, মৈত্রী দ্বারা সফল হউক, সহজ-আনন্দের দ্বারা সুন্দর হউক। পরিপূর্ণ জীবনের সাধনা এইখানে—ইহা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মানুষকে একদিন শান্তি-নিকেতনের নির্জ্জন প্রান্তরে সাধনার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন; আজ আশ্রমের সেই নির্জ্জনতা নাই বলিয়া অভিযোগ হয়। কিন্তু আজ মহর্ষির সাধনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; আজ নানা দিক দেশ হইতে মানুষ আসিতেছে একটি বৃহত্তর যোগ স্থাপনের জন্য। সাধনা এখন বিচিত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম একদিন প্রাচীন ভারতের জয়গান করিয়া সেখানে আবদ্ধ ছিল; তারপর সে আর একদিন ভারতের মধ্যে বাহির হইয়া আসিয়া এখানকার অন্যান্য ধর্ম্মকে গ্রহণ করিল। তারপর আর একদিন ভারতের বাহিরে সে জয়যাত্রায় চলিল ও বিশ্বমানবকে আহ্বান করিয়া বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করিল। বিচিত্র সাধনার মধ্যে দিয়া আজ বিশ্বভারতী আপনাকে পূর্ণতর করিতে চলিয়াছে।

আমার পরিচয়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিবরের জন্মতিথির উৎসব-উপলক্ষে—কবিবরের সহিত আমার পরিচয় কিরূপে হইল, এবং সে পরিচয়ের পরিণতি কোথায় ও কিরূপে হইয়াছে,—এই বিষয়ে কিছু লিখিবার জন্য আমার কোন বন্ধু আমাকে অনুরোধ করায়, আমি তদনুসারে এই প্রবন্ধে সেই বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।—

দূর পল্লীগ্রামে ছাত্রজীবনে যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তখন কোন সুযোগে কবিবরের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু বৃত্তি পাইয়াছিলাম। আমি দরিদ্রের সন্তান, সুতরাং এই বৃত্তি তখন আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ ও কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয়, বলিবার কথা নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ করিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।

কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতে করিতে, আমার ছাত্রজীবনের শেষ ও সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। আমি দরিদ্র, সুতরাং সহায় সম্পত্তির বলে কার্য্য জুটাইয়া লওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। নিজের যাহা কিছু বিদ্যা ছিল, তাহারই বিনিময়ে পল্লীগ্রামে ও পরে কলিকাতার বিদ্যালয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, আমি সেই সময়ে পিতার দুর্ভর সংসারভার-বহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ উপশমিত করিতে লাগিলাম। আমার দাদা (পিতৃস্বসার পুত্র) শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাটীতে সদর বিভাগে খাজাঞ্চির কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার অফিসে যাইতাম এবং তাঁহার মুখে কবীন্দ্রের বিদ্যোৎসাহিতা ও বিদ্যানুরাগিতার কথা এবং কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা তন্ময় হইয়া শুনিতাম। একদিন জোড়াসাঁকোর বাটীতেই দাদার মুখেই কথায় কথায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিলাম। ছাত্রজীবনে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেখানেই যে কার্য্যেই থাকি না কেন, বিদ্যালোচনা—বিশেষতঃ সংস্কৃতের চর্চ্চা—আমি কখনও ত্যাগ করিব না। এইজন্যই আমি সর্ব্বদাই শিক্ষাবিভাগের কার্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলাম। দাদা বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকেরা পরম সুখে অধ্যাপনা করেন—প্রভুর সমদর্শিতায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়াই বোধ হয় না, অধ্যাপনাদি সকল কার্য্যেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহারের বিষয়ে পরাধীনতা থাকিলেও, তাহা সুখকর ও স্পৃহণীয় কারণ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহই নিয়মিতভাবে সুখভোগ্য অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিক্ষকতায় পরাধীনতার তীব্র আস্বাদের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলাম, সুতরাং ঐরূপ স্পৃহণীয়, বিষয়ের বিবরণ শুনিবামাত্রই, আমার মনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধির

পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, আমি "হংসমধ্যে বকো যথা", সুতরাং, আমার সে আশা উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় নিতান্ত উপহাসাস্পদ, ইত্যাদি নানা প্রকারে, নিজ বিদ্যার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া আমি মনকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করিলাম,—তখন জানিতে পারি নাই যে আমার ভাগ্যবিধাতা আমার অলক্ষ্যে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় আমার সেই অলীক আশা সফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে, আমার দাদা একদিন কবিবরের নিকটে তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত বৃত্তির উল্লেখপূর্ব্বক আমার পরিচয় দিয়া, মফস্বলে আমার জন্য একটি কার্য্যের প্রার্থনা জানাইলে, কবিবর তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করেন এবং তদানীন্তন সদর নাএব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া, আমাকে মফস্বলে কোন একটি কার্য্যে নিযুক্ত করার অনুমতি দেন। ইহার কিছুদিন পরেই আমি কার্য্য পাইলাম—আমি কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইলাম। তখন শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩০৯ সালে শ্রাবণের প্রথমে আমি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরূপে সদর কাছারি পতিসরে উপস্থিত হইলাম। তখন ভয়ানক বর্ষা। পতিসরের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বর্ষার প্লাবনে একাকার হইয়া গিয়াছে—কোথায়ও কিছুই দেখা যায় না, কেবল বহুদূরব্যাপী নিমগ্নপ্রায় হরিত ধান্যশীর্ষসমূহ, আর সেই সবুজ সাগরের মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে দূর হইতে পুঞ্জীভূতরূপে প্রতীয়মান তৃণাচ্ছাদিত গ্রাম্য গৃহসমূহের পঞ্জরনিকর। এইরূপ ভীষণ বর্ষায় ম্যানেজার বাবু আমাকে মফস্বলে যাইতে দিলেন না—আমি কাছারিতে থাকিয়াই কিছু কিছু কার্য্য করিতে ও শিখিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। কবিবর সেই সময়ে জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদিন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে শুনিলাম শ্রীযুত বাবুমশায় (অর্থাৎ কবিবর) শিলাইদহে আসিয়াছেন, দুই এক দিনের মধ্যেই জলপথে এখানে আসিবেন। প্রভুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হইবে ভাবিয়া, আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পরদিন শুনিলাম, শ্রীযুত বাবুমশায় আসিয়াছেন, অদূরে বোটের মাস্তুল ধান্যশীর্ষ ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, অবিলম্বেই বোট ঘাটে আসিয়া লাগিবে। সকলেই দেখা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন, আমিও দেখাদেখি প্রস্তুত হইলাম। এদিকে যথাকালে বোট পতিসরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। কর্ম্মচারীরা পদগৌরবানুসারে অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—আমিও গতানুগতিকের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যথারীতি প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলেন, আমিও সামাজিক নিয়মে সবিনয়ে ভক্তিভাবে নমস্কার করিলাম। আমি নূতন কর্ম্মচারী, সুতরাং, প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার সহিত বিশেষ কথোপকথনের সম্ভাবনা নাই—দুই একটি কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, আমি বিদায় লইয়া আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন—বাবুমশায় আপনাকে ডাকিতেছেন, আসুন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে

বোটে গিয়া বাবুমশায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি স্বাভাবিক সস্নেহে মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন, আমি বসিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে কি কর?' আমি বলিলাম, 'আমিনের সেরেস্তায় কাজ করি।' ইহার পরে তিনি বলিলেন, দিনে সেরেস্তার কার্য্য কর, রাত্রিতে কি কর? আমি বলিলাম, সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ এক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া press-copy প্রস্তুত করি। পাণ্ডুলিপির কথা শুনিয়া বাবুমশায় উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া উহা লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ বইখানি দেখিয়া, কবিবর আমাকে ফিরাইয়া দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইরূপে পতিসরের কাছারিতে আমার শ্রাবণ মাস অতীত হইল। ভাদ্রের প্রথমে একদিন ম্যানেজার বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবুমশায় আপনার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "শৈলেশ! তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।" এ বিষয়ে আপনার মত কি! বলা বাহুল্য, আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বভাবের অনুরূপ হয় নাই, সুতরাং, ম্যানেজার বাবুর নিকটে ঐরূপ অচিন্তিত সুসংবাদ শুনিয়াই আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম আমার আন্তরিক প্রার্থনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল। আমি প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইয়া, বিদায় লইয়া, নৌকায় আত্রাই ষ্টেশনে পৌঁছিলাম এবং রাত্রি (বোধ হয়) দশটার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কার্য্য থাকিলে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমি কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম না, পরদিনই প্রাতঃকালের ট্রেনেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া গুরুদেবের সহিত দেখা করিলাম। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁহার কাছে আসিলাম, গুরুদেব পরিচয় করাইয়া দিলেন। এতদিনে আমার আশায় ফল ফলিল—আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক হইলাম। কিছুদিন অধ্যাপনার পরে, একদিন গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিচরণ! তুমি কি এইস্থানেই অধ্যাপনা করিবে, না পতিসরে ফিরিয়া যাইবে?' আমি উত্তর করিলাম, 'এই আশ্রমের কার্য্য আমার ভালই লাগিতেছে —আমি পতিসরে যাইব না' গুরুদেব সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ! তবে এইখানেই থাক!' আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তদবধি আমি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আমি যখন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলাম, সেই সময়ে পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট কাব্যাংশ ভিন্ন অন্য সংস্কৃত কাব্যের সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। কোন সংস্কৃত কোষের বা পাণিনির পূর্ণ মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই—মল্লিনাথের টীকায়ই খণ্ডিতরূপ কোষাংশ, সূত্রাংশ দেখিয়াছিলাম মাত্র। সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে সম্পূর্ণমূর্ত্তি সংস্কৃত কাব্য কোষ ও পাণিনি দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আমি উৎসাহের সহিত ঐ সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং ক্রমশঃ অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টার ফলে নূতন নূতন বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ

অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ আমি "সংস্কৃতপ্রবেশ" রচনা করিতে আরম্ভ করি। এই পুস্তক-রচনার সময়ে, একদিন কবিবর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্‌লাভাষার অভিধান রচনার কথা বলেন। "সংস্কৃতপ্রবেশ"এর তিন খণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি গুরুদেবের কথানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধানের কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আমাকে কলিকাতায় কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে সঙ্কলিত অভিধানের কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাতজন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও, আমার এই দুঃখ-নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না—কেবল, অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া গুরুদেবের নিকটে মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম। সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না,—আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হইল—গুরুদেবের মন টলিল,—তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তির কথা বলিলেন—মহারাজও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থ-সমস্যার মীমাংসা হইলে, গুরুদেব দেখা করিবার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবিবর ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না—কেবল অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম—বিগলিত অশ্রুধারা মনের ভাব ব্যক্ত করিল, আমি নত হইয়া পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম। আমার হৃদয়গত ভাব কবিবর বুঝিতে পারিলেন—ধীর সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করিয়াছি।' আমি আর কিছুই বলিলাম না, ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরেই, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া, আমি পুনর্ব্বার শান্তি-নিকেতনে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং মহারাজের বৃত্তিলাভে উৎসাহিত হইয়া, বহুদিনের পরে, অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে থাকিলাম। এই সময়ে গুরুদেব একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহার সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু নাই।' কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে—ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালে এই বৃহৎ পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছি। বিশ্বভারতী এই অভিধানের মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাঁহার ইচ্ছায় এই বৃহৎ কার্য্য, দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও, নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহার মুদ্রাঙ্কণও সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায়ই সুসম্পন্ন ও সুসম্পূর্ণ হইবে, আশা করি।

এক্ষণে, উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমার বোধ হয়, উপরি বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা পাঠকের মনে সে অভিপ্রেত বিষয় সুস্পষ্ট প্রতিফলিত করিতে পারিলেও, কিঞ্চিৎ আভাস দিবে, সন্দেহ নাই।

যাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছি—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় উৎসাহিত হইয়া এই বৃহৎ অভিধান সম্পূর্ণ করিয়াছি—যাঁহার সংসর্গগুণে আমার মানসিক মালিন্য অপনীত ও নবজন্ম লাভ হইয়াছে,—সেই কবিগুরু পূজাপাদ গুরুদেবের চরণে এই শুভদিনে আমার এই প্রাণের ভাষাময় সামান্য প্রবন্ধ সবিনয় প্রণতির সহিত সমর্পিত হইল। ইহা তাঁহার সস্নেহ কটাক্ষে সার্থকতা লাভ করুক, ইহা আমার প্রার্থনা।

দ্বিতীয়তঃ, আমি নানা প্রকারে কবিবরের নিকটে যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি, যেন সেই ঋণস্মৃতি আমরণ আমার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া রাখে।

যো দেবানাং প্রভবশ্চে দ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো
রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা
শুভয়া সংযুনক্তু॥

শিশু ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাময়ী দেবী।

প্রকৃতিকে সকল দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন ও তাহার বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আজ জগতের সকল স্থানের সর্ব্বপ্রকার ও সকল অবস্থার মানুষের প্রাণের পূজা পাইতেছেন; কেবল পূজাই নয়, প্রত্যেকে তাঁহাকে তাহারই সমব্যথী বন্ধু বলিয়া অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রীতি শ্রদ্ধায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছে। তাঁহাকে ঘিরিয়া সকল ভক্ত পূজারীর আনন্দ গাথা উঠিয়াছে, শিশুগণও তাহাদের কলকণ্ঠে সেই সুরে সুর মিলাইয়া দিতেছে। শারদোৎসবে, বর্ষায়, বসন্তে শিশুগণ তাহাদের খেলার সাথী, চিরশিশু ঠাকুর্দ্দাকে ঘিরিয়া মুক্তির গান গাহিয়া ফিরিতেছে।

শিশুর মন বুঝিতে হইলে, তাহার মন পাইতে হইলে শিশু না হইলে চলে না। বিশ্ববিশ্রুত কবির অন্তরে যে চিরশিশু রহিয়াছে, তাহারই প্রাণের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার বাণীতে। অস্ফুট আকারে যে বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি শিশুর মধ্যে রহিয়াছে, এমন সুন্দরভাবে সেগুলির বিশ্লেষণ পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে দেখা যায় কিনা জানি না। পশ্চিম

শিশুশিক্ষার, শিশু মনোবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বলিয়া নিজেকে জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের Crescent Moon ও Post Office তাহাদের সম্মুখে অপূর্ব্ব সম্পদ ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছে।

শিশুর মনটীকে এম ভাবে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই চার দেয়ালের গণ্ডী হইতে তাহাকে বাহিরে আনিয়া প্রকৃতির নগ্নক্রোড়ে ফেলিয়া দেওয়ার জন্ত তাঁহার আজীবন সাধনা। আমরা প্রথমে তাঁহার শিশুচরিত্র বিশ্লেষণের কথা কিছু আলোচনা করিয়া তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ করিব।

'শিশু' গ্রন্থখানিতে তিনি শিশুমনের বিচিত্রতা, বিভিন্নস্তরের রূপ সহজ ছন্দে এমন-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে তাহা ছোট বড় সকলেরই উপভোগ্য। কয়েক বছর পূর্ব্বে শিশু ভোলানাথে 'শিশু'রই বাণী সমাপ্ত করিয়াছেন।

মায়ের জন্ম জন্মান্তের সাধনা তা'র স্নিগ্ধতা মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শিশুর রূপ গ্রহণ করিয়াছে; শিশু মায়েরই গড়া পুতুল; তাই মায়ের সঙ্গে তা'র যোগ অবিচ্ছিন্ন। শিশুর বিকাশের প্রতিস্তরে মা যেমন তা' অনুভব করেন, অস্ফুট-ভাবে এই বোধ শিশুকেও চালায়। শিশুর প্রাণময় লীলা খেলা সকলেই প্রায় মায়ের সঙ্গে। শিশু জীবনের প্রথমস্তরের এই রূপটী মায়ের ও শিশুর উভয়ের কথায় কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। শিশু পৃথিবী, আকাশ বাতাস সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতেছে, তা'দের ডাক তা'র ক্ষুদ্র হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে কিন্তু মাকে বাদ দিয়া কিছুই তার কাছে সত্য নয়। সে বলিতেছে—

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে
বলে আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যাবেলা!
আমি বলি 'যাব কেমন করে?'
তারা বলে এস মাঠের শেষে!
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।
আমি বলি মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে?
শুনে তারা হেসে যায় মা ভেসে!
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ
দুহাত দিয়ে ফেল্‌ব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ!

খোকা জানে মা তাকে যত ভাল বাসেন, এমন আর কাহাকেও নয়। এই দাবীর জোরেই সে তার মায়ের উপর অভিমান করিতেছে। পশু পাখীর উপর তার নিজের যত টান, মায়ের তেমন নয়, এই দেখে সে অভি-মান ক'রে বলিতেছে—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি কর্‌তে আমায় মানা!
সত্যি করে বল্
করিস্ নে মা ছল্
বল্‌তে আমায় দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর!
যা মা তবে যা মা

আমায় কোলের থেকে নামা!
আমি খাবনা তোর হাতে
আমি খাবনা তোর পাতে!

টিয়ে হলেও মায়ের কাছে সে আদর পেত না, তাই মায়ের কোল ছেড়ে সে বনে চলে যেতে চায়।

মা'র প্রফুল্ল মুখ না দেখিলে খোকা দমিয়া যায়, তার শিশু সুলভ স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়া তাকেও বিমর্ষ করিয়া দেয়। মা'র দুঃখে ব্যথিত হইয়া সে বাবার দোষ মার্জ্জনা করিতে পারে না। বাবার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ প্রথম-স্তরে বেশীর ভাগ মায়ের মধ্য দিয়া। বাবার চিঠি না পেলে মায়ের কষ্ট হয় ইহা দেখিয়া সে এমন ব্যবস্থা করিতে চায় যে মা যাহাতে সহজে চিঠি পান। সে নিজে মোটা অক্ষরে বাবার চিঠি লিখিয়া দিবে ও তারপর

চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মত বুদ্ধি করে
ভাব্‌ছ দেবো পেয়াদার
ঝুলির মধ্যে ফেলে?
কখ্‌খন না। আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে
ভাল চিঠি দেয়না ওরা পেলে।

বাবা বিদেশে গিয়ে মাকে কষ্ট দিচ্ছেন এটা সে খানিকটা অনুভব করে, তাই সে মাকে বল্‌ছে যে সে বড় হলে খেয়া ঘাটের মাঝি হবে কিন্তু

আবার আমি আস্‌ব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে
বাবার মত যাবনা মা
বিদেশে কোনো কাজে।'

বাইরের আলো বাতাস, ঝড় বৃষ্টি বয়স্ক লোকদিগের মত শিশুর মনকেও দোলা দেয়, বর্ষার সন্ধ্যায় শিশুর অন্য খেলা ভাল লাগ্‌ছে না, মায়ের কাছে বসে গল্প শোনাতেই তার আনন্দ—

ঐ দেখ্‌ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটী লাগ্‌লো না
আর ভালো!
ঘণ্টা বেজে গেল কখন অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল ফেলে এলেম খেলা,
আজকে আমার ছুটী আমার শনিবারের ছুটী
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্‌ এই হেথা চৌকাঠ
বল্‌ আমারে কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ।'

খোকার মনের বীরত্ব—সে যে একটু বড় হয়েছে আরও বড় হবে—মা'কে রক্ষা করার ভার তার উপর, এই সকল ভাবগুলি শিশুর কথায় কেমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশুর জীবনের বিকাশ এইগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। শিশু বল্‌ছে

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌ বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।

* * * *

মাকে সে অভয় দিচ্ছে 'আমি আছি ভয় কেন মা করো।' তারপর ডাকাতের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে সে তাদের হারিয়ে দিল। যুদ্ধের শেষে মায়ের কাছে এসে বল্‌ছে—

* * * *

'বল্‌চি এসে' লড়াই গেছে থেমে
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে।

এই পুরস্কারটুকু খোকার চাই।

রামচন্দ্রের মত বাবার আদেশে খোকাও বনে যেতে রাজী, তবে লক্ষ্মণ ভাই তার সঙ্গে থাক্‌বে। বনবাসের সৌন্দর্য্য সে নানারঙে মনে মনে এঁকেছে; আঁধার রাতে বসে সে বনের মধ্যে মায়ের কথা মনে করবে। খেলার সাথী তার ছোট একটী ভাই সে পেতে চায়; দুজনে মিলে তবে সে খেলায় আনন্দ পাবে। ছোট ভাই বোনদের উপর খোকার করুণা মিশ্রিত স্নেহটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বিজ্ঞ' কবিতায়। 'খুকীর' যে এখনও অনেক বুঝ্‌তে শিখ্‌তে বাকী, খোকাদাদাটি তা বুঝ্‌তে পারছে, খুকীর অজ্ঞতাই তাকে আনন্দ দিচ্ছে—

'খুকী তোমার কিছু বোঝেনা মা
খুকী তোমার ভারি ছেলে মানুষ
ও ভেবেছে তারা উঠ্‌ছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ!

*   *   *   *

খোকা পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, খুকী তার মর্ম্ম জানেনা;—

'সাম্‌নেতে ওর শিশু শিক্ষা খুলে
যদি বলি খুকী পড়া করো
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়্‌তে বসে
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর।

*   *   *   *

'সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি "আস্‌ছে বাবা"—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়
তোমার খুকী এমনি বোকা হাবা।'

খোকা দেখে বাবা বই লেখেন, তবে তার সেগুলি বোধগম্য নয়। সে গল্প চায়, ছড়া চায়; বাবার বইতে তা নাই, তাই তার মতে বাবার বই ভাল না। 'সমালোচক' খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করছে;—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায়না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে:
বুঝেছিলি, বল্ মা সত্যি করে!
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কি হবে?

*   *   *   *

বড় বড় রুলকাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ
আমি যদি নৌকা করতে চাই
অমনি বল নষ্ট করতে নাই।
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

শিশুর কল্পনা তার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকশিত, পূর্ণতর হচ্ছে, যে শিশু খেয়া-ঘাটের মাঝি হতে চেয়েছিল। রামচন্দ্রের মত বনে যেতে চেয়েছিল, কল্পনাকে তার অস্ফুট-বাণীতে প্রকাশ করেছিল। সেই শিশুই পরে নিজের হাতে কাগজের নৌকা বানিয়ে, নিজের নাম লিখে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে তার মনকে উধাও করে দিচ্ছে; এখন তার কল্পনা পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্বদ্ধ হইয়াছে বুঝা যায়। সারাদিন ধরিয়া তাহার নৌকা নানাস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, তারপর—

'রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে,
চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দুধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে
আকাশের তারা মিটি মিটি করে
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি !

শিশুর মন প্রকৃতির উন্মুক্ত রূপ দেখিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য লালায়িত। বন্ধনের কঠোরতা তাহাকে চাপিয়া মারে, স্বভাবের ক্রোড়ে ধীরে ধীরে যে কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিলেই সুন্দর হয়, তাহাকে অযথা অস্বাভাবিক গতিতে বাড়াইয়া তুলিতে গেলেই তাহাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লওয়া হয়। শারদোৎসবে বালকের দল ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সেই মুক্তির বার্ত্তাই প্রচার করিতেছে। ডাকঘরে বালক অমলের প্রাণ প্রকৃতিকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, অযথা বন্ধনের চাপ তাহার কুঁড়ি প্রাণটাকে শুকাইয়া মারিল।

শিশুর পাঠশালায় যাইয়া পড়ার সময় হইয়াছে; কিন্তু গুরুমশায়কে শিশু কোনমতেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না। যে গুরুমশায় কেবলই চোখ রাঙিয়ে শিশুর স্বভাবজাত চঞ্চলতা, স্ফূর্ত্তিকে দমিয়ে দেন, তাঁহার উপর শিশুর বিরাগ হইবে নাই বা কেন? বাবার মত বড় হইয়া শিশু গুরুমশায়কে জব্দ করিবে এই তার ইচ্ছা;—

"গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বল্‌ব ঘরে ;—
তিনি যদি বলেন শেলেট কোথা
দেরী হচ্ছে, বসে পড়া কর !"
আমি বল্‌ব "খোকাত আর নেই
হয়েছি যে বাবার মত বড়।
গুরুমশায় শুনে তখন কবে
"বাবু মশায় আসি এখন তবে।"

পড়া ভুল করিলে গুরুমশায় নির্ম্মমভাবে শিশুর খেল্‌না ভাঙিয়া দেন। শিশু ইহাতে ব্যথা পাইয়াছে ও সেই সঙ্গে তাঁর উপর প্রতিশোধ লইবার তার ইচ্ছা হইয়াছে ;—

মাগো আমি জানাই কাকে
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
এখনি তাঁর কাছে ?
কোন রকম খেলার পুতুল
নেই কি মা, ওঁরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের পরে ?
সকাল সাঁঝে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেননি কি
কোন রকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে
বল্ দেখি মা ওঁর মনে তা'
কেমন তরো লাগে ?

গুরুমশায়ের উপর বিরূপভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহায়ের শেখান বিদ্যার উপরও শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। যে-বিদ্যা তাহার সকল স্বাধীনতা, স্ফূর্ত্তি নষ্ট করিয়া দিতে চায় সে

অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ আমি "সংস্কৃতপ্রবেশ" রচনা করিতে আরম্ভ করি। এই পুস্তক-রচনার সময়ে, একদিন কবিবর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্লাভাষার অভিধান রচনার কথা বলেন। "সংস্কৃতপ্রবেশ"এর তিন খণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি গুরুদেবের কথানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধানের কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আমাকে কলিকাতায় কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে সঙ্কলিত অভিধানের কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাতজন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও, আমার এই দুঃখ-নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না—কেবল, অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া গুরুদেবের নিকটে মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম। সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না,—আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হইল—গুরুদেবের মন টলিল,—তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তির কথা বলিলেন—মহারাজও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থ-সমস্যার মীমাংসা হইলে, গুরুদেব দেখা করিবার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবিবর ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না—কেবল অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম—বিগলিত অশ্রুধারা মনের ভাব ব্যক্ত করিল, আমি নত হইয়া পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম। আমার হৃদয়গত ভাব কবিবর বুঝিতে পারিলেন—ধীর সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করিয়াছি।' আমি আর কিছুই বলিলাম না, ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরেই, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া, আমি পুনর্ব্বার শান্তি-নিকেতনে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং মহারাজের বৃত্তিলাভে উৎসাহিত হইয়া, বহুদিনের পরে, অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে থাকিলাম। এই সময়ে গুরুদেব একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহার সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু নাই।' কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে—ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালে এই বৃহৎ পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছি। বিশ্বভারতী এই অভিধানের মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাঁহার ইচ্ছায় এই বৃহৎ কার্য্য, দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও, নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহার মুদ্রাঙ্কণও সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায়ই সুসম্পন্ন ও সুসম্পূর্ণ হইবে, আশা করি।

এক্ষণে, উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমার বোধ হয়, উপরি বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা পাঠকের মনে সে অভিপ্রেত বিষয়, সুস্পষ্ট প্রতিফলিত করিতে পারিলেও, কিঞ্চিৎ আভাস দিবে, সন্দেহ নাই।

যাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছি—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় উৎসাহিত হইয়া এই বৃহৎ অভিধান সম্পূর্ণ করিয়াছি—যাঁহার সংসর্গগুণে আমার মানসিক মালিন্য অপনীত ও নবজন্ম লাভ হইয়াছে,—সেই কবিগুরু পূজ্যপাদ গুরুদেবের চরণে এই শুভদিনে আমার এই প্রাণের ভাষাময় সামান্য প্রবন্ধ সবিনয় প্রণতির সহিত সমর্পিত হইল। ইহা তাঁহার সস্নেহ কটাক্ষে সার্থকতা লাভ করুক, ইহা আমার প্রার্থনা।

দ্বিতীয়তঃ, আমি নানা প্রকারে কবিবরের নিকটে যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি, যেন সেই ঋণস্মৃতি আমরণ আমার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া রাখে।

যো দেবানাং প্রভবশ্চে দ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো
রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা
শুভয়া সংযুনক্তু॥

শিশু ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাময়ী দেবী।

প্রকৃতিকে সকল দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন ও তাহার বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আজ জগতের সকল স্থানের সর্ব্বপ্রকার ও সকল অবস্থার মানুষের প্রাণের পূজা পাইতেছেন; কেবল পূজাই নয়, প্রত্যেকে তাঁহাকে তাহারই সমব্যথী বন্ধু বলিয়া অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রীতি শ্রদ্ধায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছে। তাঁহাকে ঘিরিয় সকল ভক্ত পূজারীর আনন্দ গাথা উঠিয়াছে, শিশুগণও তাহাদের কলকণ্ঠে সেই সুরে সুর মিলাইয়া দিতেছে। শারদোৎসবে, বর্ষায়, বসন্তে শিশুগণ তাহাদের খেলার সাথী, চিরশিশু ঠাকুর্দ্দাকে ঘিরিয়া মুক্তির গান গাহিয়া ফিরিতেছে।

শিশুর মন বুঝিতে হইলে, তাহার মন পাইতে হইলে শিশু না হইলে চলে না। বিশ্ব-বিশ্রুত কবির অন্তরে যে চিরশিশু রহিয়াছে, তাহারই প্রাণের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার বাণীতে। অস্ফুট আকারে যে বিচিত্র হৃদয়-বৃত্তি শিশুর মধ্যে রহিয়াছে, এমন সুন্দরভাবে সেগুলির বিশ্লেষণ পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে দেখা যায় কিনা জানি না। পশ্চিম

শিশুশিক্ষার, শিশু মনোবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বলিয়া নিজেকে জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের Crescent Moon ও Post Office তাহাদের সম্মুখে অপূর্ব্ব সম্পদ ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছে।

শিশুর মনটীকে এম-ভাবে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই চার দেয়ালের গণ্ডী হইতে তাহাকে বাহিরে আনিয়া প্রকৃতির নগ্নক্রোড়ে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার আজীবন সাধনা। আমরা প্রথমে তাঁহার শিশুচরিত্র বিশ্লেষণের কথা কিছু আলোচনা করিয়া তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ করিব।

'শিশু' গ্রন্থখানিতে তিনি শিশুমনের বিচিত্রতা, বিভিন্নস্তরের রূপ সহজ ছন্দে এমন-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে তাহা ছোট বড় সকলেরই উপভোগ্য। কয়েক বছর পূর্ব্বে শিশু ভোলানাথে 'শিশু'রই বাণী সমাপ্ত করিয়াছেন।

মায়ের জন্ম জন্মান্তের সাধনা তা'র স্নিগ্ধতা মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শিশুর রূপ গ্রহণ করিয়াছে; শিশু মায়েরই গড়া পুতুল; তাই মায়ের সঙ্গে তা'র যোগ অবিচ্ছিন্ন। শিশুর বিকাশের প্রতিস্তরে মা যেমন তা' অনুভব করেন, অস্ফুট-ভাবে এই বোধ শিশুকেও চালায়। শিশুর প্রাণময় লীলা খেলা সকলেই প্রায় মায়ের সঙ্গে। শিশু জীবনের প্রথমস্তরের এই রূপটী মায়ের ও শিশুর উভয়ের কথায় কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। শিশু পৃথিবী, আকাশ বাতাস সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতেছে, তা'দের ডাক তা'র ক্ষুদ্র হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে কিন্তু মাকে বাদ দিয়া কিছুই তার কাছে সত্য নয়। সে বলিতেছে—

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে
বলে আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যাবেলা!
আমি বলি 'যাব কেমন করে?'
তারা বলে এস মাঠের শেষে!
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।
আমি বলি মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে?
শুনে তারা হেসে যায় মা ভেসে!
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ
দুহাত দিয়ে ফেল্‌ব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ!

খোকা জানে মা তাকে যত ভাল বাসেন, এমন আর কাহাকেও নয়। এই দাবীর জোরেই সে তার মায়ের উপর অভিমান করিতেছে। পশু পাখীর উপর তার নিজের যত টান, মায়ের তেমন নয়, এই দেখে সে অভি-মান ক'রে বলিতেছে—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা!
সত্যি করে বল্‌
করিস্‌ নে মা ছল্‌
বল্‌তে আমায় দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর!
যা মা তবে যা মা

আমায় কোলের থেকে নামা !
আমি খাবনা তোর হাতে
আমি খাবনা তোর পাতে !

টিয়ে হলেও মায়ের কাছে সে আদর পেত না, তাই মায়ের কোল ছেড়ে সে বনে চলে যেতে চায়।

মা'র প্রফুল্ল মুখ না দেখিলে খোকা দমিয়া যায়, তার শিশু সুলভ স্ফূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়া তাকেও বিমর্ষ করিয়া দেয়। মা'র দুঃখে ব্যথিত হইয়া সে বাবার দোষ মার্জ্জনা করিতে পারে না। বাবার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ প্রথম-স্তরে বেশীর ভাগ মায়ের মধ্য দিয়া। বাবার চিঠি না পেলে মায়ের কষ্ট হয় ইহা দেখিয়া সে এমন ব্যবস্থা করিতে চায় যে মা যাহাতে সহজে চিঠি পান। সে নিজে মোটা অক্ষরে বাবার চিঠি লিখিয়া দিবে ও তারপর

চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মত বুদ্ধি করে
ভাব্‌ছ দেবো পেয়াদার
ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
কখ্‌খন না আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে
ভাল চিঠি দেয়না ওরা পেলে।

বাবা বিদেশে গিয়ে মাকে কষ্ট দিচ্ছেন এটা সে খানিকটা অনুভব করে, তাই সে মাকে বল্‌ছে যে সে বড় হলে খেয়া ঘাটের মাঝি হবে কিন্তু

আবার আমি আস্‌ব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে
বাবার মত যাবনা মা
বিদেশে কোনো কাজে।'

বাইরের আলো বাতাস, ঝড় বৃষ্টি বয়স্ক লোকদিগের মত শিশুর মনকেও দোলা দেয়, বর্ষার সন্ধ্যায় শিশুর অন্য খেলা ভাল লাগ্‌ছে না, মায়ের কাছে বসে গল্প শোনাতেই তার আনন্দ—

ঐ দেখ্‌ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটী লাগ্‌লো না
আর ভালো !
ঘণ্টা বেজে গেল কখন অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল ফেলে এলেম খেলা
আজকে আমার ছুটী আমার শনিবারের ছুটী
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্‌ এই হেথা চৌকাঠ
বল্‌ আমারে কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ।'

খোকার মনের বীরত্ব—সে যে একটু বড় হয়েছে আরও বড় হবে—মা'কে রক্ষা করার ভার তার উপর, এই সকল ভাবগুলি শিশুর কথায় কেমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশুর জীবনের বিকাশ এইগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। শিশু বল্‌ছে

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌ বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।

* * * *

মাকে সে অভয় দিচ্ছে 'আমি আছি ভয় কেন মা করো।' তারপর ডাকাতের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে সে তাদের হারিয়ে দিল। যুদ্ধের শেষে মায়ের কাছে এসে বল্‌ছে—

* * * *

'বল্‌চি এসে' লড়াই গেছে থেমে
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে।
এই পুরস্কারটুকু খোকার চাই।

রামচন্দ্রের মত বাবার আদেশে খোকাও বনে যেতে রাজী, তবে লক্ষ্মণ ভাই তার সঙ্গে থাক্‌বে। বনবাসের সৌন্দর্য্য সে নানারঙে মনে মনে অঁকেছে; আঁধার রাতে বসে সে বনের মধ্যে মায়ের কথা মনে কর্‌বে। খেলার সাথী তার ছোট একটী ভাই সে পেতে চায়; দুজনে মিলে তবে সে খেলায় আনন্দ পাবে। ছোট ভাই বোনদের উপর খোকার করুণা মিশ্রিত স্নেহটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বিজ্ঞ' কবিতায়। 'খুকীর' যে এখনও অনেক বুঝ্‌তে শিখ্‌তে বাকী, খোকাদাদাটি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছে, খুকীর অজ্ঞতাই তাকে আনন্দ দিচ্ছে—

'খুকী তোমার কিছু বোঝেনা মা
খুকী তোমার ভারি ছেলে মানুষ
ও ভেবেছে তারা উঠ্‌ছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ!

* * * *

খোকা পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, খুকী তার মর্ম্ম জানেনা;—

'সাম্‌নেতে ওর শিশু শিক্ষা খুলে
যদি বলি খুকী পড়া করো
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়্‌তে বসে
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর।

* * * *

'সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি "আস্‌ছে বাবা"—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়
তোমার খুকী এমনি বোকা হাবা।'

খোকা দেখে বাবা বই লেখেন, তবে তার সেগুলি বোধগম্য নয়। সে গল্প চায়, ছড়া চায়; বাবার বইতে তা নাই, তাই তার মতে বাবার বই ভাল না। 'সমালোচক' খোকা মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে;—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায়না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে:
বুঝেছিলি, বল্‌ মা সত্যি করে!
এমন লেখায় তবে
বল্‌ দেখি কি হবে?

* * * *

বড় বড় রুলকাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ
আমি যদি নৌকা কর্‌তে চাই
অমনি বল নষ্ট কর্‌তে নাই।
সাদা কাগজ কালো
কর্‌লে বুঝি ভালো?

শিশুর কল্পনা তার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকশিত, পূর্ণতর হচ্ছে, যে শিশু খেয়া-ঘাটের মাঝি হতে চেয়েছিল। রামচন্দ্রের মত বনে যেতে চেয়েছিল, কল্পনাকে তার অস্ফুট-বাণীতে প্রকাশ করেছিল। সেই শিশুই পরে নিজের হাতে কাগজের নৌকা বানিয়ে, নিজের নাম লিখে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে তার মনকে উধাও করে দিচ্ছে; এখন তার কল্পনা পূর্ব্বাপেক্ষা সুসবদ্ধ হইয়াছে বুঝা যায়। সারাদিন ধরিয়া তাহার নৌকা নানাস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, তারপর—

'রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে,
চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দুধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে
আকাশের তারা মিটি মিটি করে
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি!

শিশুর মন প্রকৃতির উন্মুক্ত রূপ দেখিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য লালায়িত। বন্ধনের কঠোরতা তাহাকে চাপিয়া মারে, স্বভাবের ক্রোড়ে ধীরে ধীরে যে কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিলেই সুন্দর হয়, তাহাকে অযথা অস্বাভাবিক গতিতে বাড়াইয়া তুলিতে গেলেই তাহাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লওয়া হয়। শারদোৎসবে বালকের দল ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সেই মুক্তির বার্ত্তাই প্রচার করিতেছে। ডাকঘরে বালক অমলের প্রাণ প্রকৃতিকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, অযথা বন্ধনের চাপ তাহার কুঁড়ি প্রাণটাকে শুকাইয়া মারিল।

শিশুর পাঠশালায় যাইয়া পড়ার সময় হইয়াছে; কিন্তু গুরুমশায়কে শিশু কোনমতেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না। যে গুরুমশায় কেবলই চোখ রাঙিয়ে শিশুর স্বভাবজাত চঞ্চলতা, স্ফূর্ত্তিকে দমিয়ে দেন, তাঁহার উপর শিশুর বিরাগ হইবে নাই বা কেন? বাবার মত বড় হইয়া শিশু গুরুমশায়কে জব্দ করিবে এই তার ইচ্ছা;—

"গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বল্‌ব ঘরে;—
তিনি যদি বলেন শেলেট কোথা
দেরী হচ্ছে, বসে পড়া কর!"
আমি বল্‌ব "খোকাত আর নেই
হয়েছি যে বাবার মত বড়।
গুরুমশায় শুনে তখন কবে
"বাবু মশায় আসি এখন তবে।"

পড়া ভুল করিলে গুরুমশায় নির্ম্মমভাবে শিশুর খেল্‌না ভাঙিয়া দেন। শিশু ইহাতে ব্যথা পাইয়াছে ও সেই সঙ্গে তাঁর উপর প্রতিশোধ লইবার তার ইচ্ছা হইয়াছে;—

মাগো আমি জানাই কাকে
ওঁর কি গুরু আছে?
আমি যদি নালিশ করি
এখনি তাঁর কাছে?
কোন রকম খেলার পুতুল
নেই কি মা, ওঁরে?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের পরে?
সকাল সাঁঝে তাদের নিয়ে
কর্‌তে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেননি কি
কোন রকম হেলা?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে
বল্ দেখি মা ওঁর মনে তা'
কেমন তরো লাগে?

গুরুমশায়ের উপর বিরূপভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহায়ের শেখান বিদ্যার উপরও শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। যে-বিদ্যা তাহার সকল স্বাধীনতা, স্ফূর্ত্তি নষ্ট করিয়া দিতে চায় সে

বিদ্যার প্রতি শিশু যে বিমুখ হইবে তাহা স্বাভাবিক। শিশু তাই 'মূর্খু' হয়েই থাকতে চায় ;—

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই !
আমি ত মা চাইনা হতে
পণ্ডিত মশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটি পোকার গুটি।
মুর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কিই বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরিত
সমস্ত খন ছুটী।

কবি নিজের শৈশব হইতে অন্তরে অন্তরে এই শিক্ষার উৎপীড়ন অনুভব করিয়া আসিতে-ছিলেন ; শিশুকে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাড়িতে দেওয়া তাহার বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি বিকাশের সহায়তা করাই যে শিক্ষার লক্ষ্য ইহা তিনি যেমন সহানুভূতি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন এমনভাবে আর কেহ দেখিতে পারিয়াছে কিনা জানি না। শিক্ষাদাতা কেবল আলগাভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুর গলাধঃকরণ করালেই শিশু শিখিল না, তাহার নিদর্শন ত' আমরা গুরুমশায়ের চিত্রে দেখিতেছি মুর্খু হইয়া থাকার স্পৃহাটাই কেবল শিশুর বাড়িয়া চলে। শিশুকে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে শিশুর মতই মন লইয়া তাহার কাছে যাইতে হইবে, তাহার কৌতুহলী কল্পনা প্রবণ মনের খোরাক জোগাইতে হইবে। কবির ইচ্ছা, কবির শিক্ষার আদর্শ মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে এই শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতিকে তাহার বিচিত্ররূপে শিশু সম্ভোগ করিবে, শিশুর দেহ মনের সৌন্দর্য্য সম্ভার দিয়া প্রকৃতির পূজা করিবে ; শিশুমনের প্রতিস্তরে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রণালী দ্বারা শিশুকে নব নব জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারে উপস্থিত করা হইবে ; এইরূপে তাহার জ্ঞানলিপ্সা স্বতঃই জাগ্রত, বর্দ্ধিত হইবে—ইহাই কবির উদ্দেশ্য।

শিশুর মনোবিজ্ঞান তিনি যেমন সুন্দরভাবে বুঝিয়াছেন, তেমনি তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল আদর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমন নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা প্রণালীও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশী রাজভাষা শিখান কি দুরূহ ব্যাপার তাহা অনুভব করিয়া শিশুদিগের জন্য 'শ্রুতিশিক্ষা' 'ইংরাজী সোপান' প্রভৃতি লিখিয়া সেই প্রণালীতে এখানকার শিশুদিগকে তিনি নিজে শিখাইয়াছেন ; এখন এখানে ত বটেই ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র তাঁহার শিক্ষা প্রণালী গৃহীত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষা সহজ করিবার জন্য তাঁহার উপদেশানুসারে এখানকার শিক্ষকগণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তদনুযায়ী শিক্ষাদান করিতেছেন। সাহিত্যের রস গ্রহণ যাহাতে এখানকার ছাত্রগণ সহজে করিতে পারে তাহার জন্য নানা প্রকার বিভিন্নস্তরের সাহিত্য সভার আয়োজন আছে। কবির মতে ক্ষুদ্র বালকদিগকেও সুন্দর ও উচ্চ সাহিত্যের রস উপলব্ধ করান যাইতে পারে। ধীরে ধীরে তাহাদের মনের গতির অনুসরণ করিয়া ও স্তরে স্তরে সেইপথে তাহাদিগের মনোযোগ চালিত করিয়া ক্রমশঃ অতি জটিল কাব্যের ও সাহিত্যের রস তিনি নিজে বালকদিগকে

বুঝাইয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। বিদেশী ভাষাকেও আয়ত্ত করিবার প্রণালী তাঁহার নিজের শিক্ষাদান হইতে দেখিবার পরম সুযোগ আমাদের হইয়াছে।

অনেকেরই ধারণা শিক্ষকতাকে তিনি বরাবর ভীতি ও করুণার চক্ষে দেখেন, কিন্তু শিক্ষকের যে আদর্শ তিনি সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা ত আমরা দেখিয়াছি, ও দেখিতেছি। গুরুমশায় চিরকাল ভীতির বস্তু, তাঁহার বেত্র-দণ্ড লইয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করিতে-ছেন। শিশু মায়ের পক্ষপুট ছাড়িয়া উড়িবার জন্য ডানা মেলিতেছে, শিক্ষকের হস্ত প্রসারিত হইতেছে সেই উড্ডীয়মান শিশুশাবককে পুষ্টতর, সবলতর করিবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাসের আলোচনা

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

এটা বাংলাদেশ ও সাহিত্যের গৌরব বলতে হবে যে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার দান বাংলা সাহিত্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, নাট্যকার, সমালোচক ও প্রবন্ধ লেখক। বাংলা সাহিত্যে তিনি কি দান করেছেন ও সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথা সে সব আলোচনার স্থান এখানে নয়। তিনি কবি হলেও, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রতি তাঁর একটা দরদ আছে, তিনি উপনিষদের বাণীতে অনুপ্রাণিত, তিনি ভারতীয় শিল্পের সমজদার। ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন, এবং ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যাকে জাগাবার জন্যে বিশ্বভারতীর স্থাপনা করেছেন। বিশ্বভারতীতে পূর্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় সভ্যতা ও বিদ্যার আলোচনাকে এক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বলেছেন—"এখানে সর্ব্ব মানবের যোগ সাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে—যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে' তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে।" সেইজন্য বিশ্বভারতীতে সর্ব্ব দেশীয় সভ্যতার আলোচনার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাকে এক বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের আলোচনায় পৃথিবীতে আজকাল যাঁরা অগ্রণী, তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে এসেছেন। আচার্য্য সিলভাঁা লেভি, উইণ্টার নিট্‌জ, ষ্টেন কোনো ও ফরমিকি সেই কারণেই আহুত

বিদ্যার প্রতি শিশু যে বিমুখ হইবে তাহা স্বাভাবিক। শিশু তাই 'মূর্খু' হয়েই থাকতে চায় ;—

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই !
আমি ত ম' চাইনা হতে
পণ্ডিত মশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটি পোকার গুটি।
মূর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কিই বা হবে,
মুখু যারা তাদেরিত
সমস্ত খন ছুটী।

কবি নিজের শৈশব হইতে অন্তরে অন্তরে এই শিক্ষার উৎপীড়ন অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন ; শিশুকে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাড়িতে দেওয়া তাহার বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি বিকাশের সহায়তা করাই যে শিক্ষার লক্ষ্য ইহা তিনি যেমন সহানুভূতি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন এমনভাবে আর কেহ দেখিতে পারিয়াছে কিনা জানি না। শিক্ষাদাতা কেবল আলগাভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুর গলাধঃকরণ করালেই শিশু শিখিল না, তাহার নিদর্শন ত' আমরা গুরুমশায়ের চিত্রে দেখিতেছি মূর্খু হইয়া থাকার স্পৃহাটাই কেবল শিশুর বাড়িয়া চলে। শিশুকে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে শিশুর মতই মন লইয়া তাহার কাছে যাইতে হইবে, তাহার কৌতুহলী কল্পনা প্রবণ মনের খোরাক জোগাইতে হইবে। কবির ইচ্ছা, কবির শিক্ষার আদর্শ মূর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছে এই শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতিকে তাহার বিচিত্ররূপে শিশু সম্ভোগ করিবে, শিশুর দেহ মনের সৌন্দর্য্য সম্ভার দিয়া প্রকৃতির পূজা করিবে ; শিশুমনের প্রতিস্তরে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রণালী দ্বারা শিশুকে নব নব জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারে উপস্থিত করা হইবে ; এইরূপে তাহার জ্ঞানলিপ্সা স্বতঃই জাগ্রত, বর্দ্ধিত হইবে—ইহাই কবির উদ্দেশ্য।

শিশুর মনোবিজ্ঞান তিনি যেমন সুন্দরভাবে বুঝিয়াছেন, তেমনি তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল আদর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমন নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা প্রণালীও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশী রাজভাষা শিখান কি দুরূহ ব্যাপার তাহা অনুভব করিয়া শিশুদিগের জন্য 'শ্রুতিশিক্ষা' 'ইংরাজী সোপান' প্রভৃতি লিখিয়া সেই প্রণালীতে এখানকার শিশুদিগকে তিনি নিজে শিখাইয়াছেন ; এখন এখানে ত বটেই ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র তাঁহার শিক্ষা প্রণালী গৃহীত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষা সহজ করিবার জন্য তাঁহার উপদেশানুসারে এখানকার শিক্ষকগণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তদনুযায়ী শিক্ষাদান করিতেছেন। সাহিত্যের রস গ্রহণ যাহাতে এখানকার ছাত্রগণ সহজে করিতে পারে তাহার জন্য নানা প্রকার বিভিন্নস্তরের সাহিত্য সভার আয়োজন আছে। কবির মতে ক্ষুদ্র বালকদিগকেও সুন্দর ও উচ্চ সাহিত্যের রস উপলব্ধ করান যাইতে পারে। ধীরে ধীরে তাহাদের মনের গতির অনুসরণ করিয়া ও স্তরে স্তরে সেইপথে তাহাদিগের মনোযোগ চালিত করিয়া ক্রমশঃ অতি জটিল কাব্যের ও সাহিত্যের রস তিনি নিজে বালকদিগকে

বুঝাইয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। বিদেশী ভাষাকেও আয়ত্ত করিবার প্রণালী তাঁহার নিজের শিক্ষাদান হইতে দেখিবার পরম সুযোগ আমাদের হইয়াছে।

অনেকেরই ধারণা শিক্ষকতাকে তিনি বরাবর ভীতি ও করুণার চক্ষে দেখেন, কিন্তু শিক্ষকের যে আদর্শ তিনি সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা ত আমরা দেখিয়াছি, ও দেখিতেছি। গুরুমশায় চিরকাল ভীতির বস্তু, তাঁহার বেত্রদণ্ড লইয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করিতেছেন। শিশু মায়ের পক্ষপুট ছাড়িয়া উড়িবার জন্য ডানা মেলিতেছে, শিক্ষকের হস্ত প্রসারিত হইতেছে সেই উড্ডীয়মান শিশুশাবককে পুষ্টতর, সবলতর করিবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাসের আলোচনা

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

এটা বাংলাদেশ ও সাহিত্যের গৌরব বলতে হবে যে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার দান বাংলা সাহিত্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, নাট্যকার, সমালোচক ও প্রবন্ধ লেখক। বাংলা সাহিত্যে তিনি কি দান করেছেন ও সাহিত্যে তার স্থান কোথা সে সব আলোচনার স্থান এখানে নয়। তিনি কবি হলেও, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রতি তাঁর একটা দরদ আছে, তিনি উপনিষদের বাণীতে অনুপ্রাণিত, তিনি ভারতীয় শিল্পের সমজদার। ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন, এবং ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যাকে জাগাবার জন্যে বিশ্বভারতীর স্থাপনা করেছেন। বিশ্বভারতীতে পূর্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় সভ্যতা ও বিদ্যার আলোচনাকে এক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বলেছেন—"এখানে সর্ব্ব মানবের যোগ সাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে—যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে' তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে।" সেইজন্য বিশ্বভারতীতে সর্ব্ব দেশীয় সভ্যতার আলোচনার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাকে এক বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের আলোচনায় পৃথিবীতে আজকাল যাঁরা অগ্রণী, তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে এসেছেন। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি, উইণ্টার নিট্জ, ষ্টেন কোনো ও ফরমিকি সেই কারণেই আহূত

হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে তাঁদের চিত্তের সম্বন্ধ বন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে,' সেজন্য তাঁদের আগমনে এখানে ভারত ইতিহাস আলোচনায় উৎসাহ যথেষ্ট বেড়েছিল।

আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দুটো প্রধান জিনিষ দেখতে পাই। একটা হচ্ছে—ভারতীয় সভ্যতার প্রতি দরদ, আর অপরটা বিশ্ব সভ্যতার আলোচনায় ঔৎসুক্য। একদিকে তাঁর মন যেমন বিশ্বব্যাপী, বিশ্বের সভ্যতার সার অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত, অপরদিকে তাঁর মন তেমনি ভারতীয়, তিনি ভারতীয় সভ্যতা জগতে প্রচার করতে ব্যস্ত। তাঁর ইতিহাস আলোচনাতেও আমরা এই দুই দিক দেখতে পাই। আজকাল ইতিহাস বলতে যা বুঝি সেই সব সন তারিখের আলোচনা তিনি করেন নি সত্য। তিনি ঐতিহাসিক বলে পরিচিত হবেন না সত্য, কিন্তু তাঁর ইতিহাস আলোচনায় যে অন্তর্দৃষ্টি আছে তা অনেক তথাকথিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে নাই। তিনি ভারতের ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যা অনেককাল সুধী সমাজে আদৃত হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিক থেকে আমরা পাই তাঁর (১) ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস (৩) শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ (৪) শিখ জাতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের নানক ও শিখজাতির ভূমিকা। এ ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা তুলনা করে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে (১) পূর্ব্ব ও পশ্চিম (২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধান।

সাধারণ ঐতিহাসিকদের গবেষণার পথ ছেড়ে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের আসল কথাটী খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি সেইটাই তিনি সবাইকে জানিয়েছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাস খুজবার চেষ্টা বৃথা। বিলাতী ইতিহাস থেকে এদেশের ইতিহাস যে একেবারে বিভিন্ন তাও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি বলেন—"ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জ্জন না করিলে নয়। * * ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশ মালা ও জয় পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্‌স নাই, সেখানে আবার হিস্‌ট্রি কিসের তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে চান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।"

অনেক বৎসর আগে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর আশ্রমে ছাত্রদের সঙ্গে ইতিহাসের আলোচনা করতেন, তখনও তিনি ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করতেন না, সন বা তারিখ নিয়ে মারামারি করতেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল কথাগুলি তাদের সামনে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতেন। কি করে ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হল, আরণ্যক সভ্যতা কেমন করে গড়ে উঠল, ক্রমে গোষ্ঠপতি ও রাজার কি করে আবির্ভাব হল, গঙ্গা নদীর ধারে ধারে কেমন করে বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠল, কাশীতে কাঞ্চীতে কি ভাবে বিদ্যার কেন্দ্র হল—এ সব কথা তিনি বেশ স্পষ্ট করে ছেলেদের সামনে

ধরতেন। আবার বৌদ্ধযুগে যে ভারতীয় সভ্যতা এতদিন গড়ে উঠল, সেই সভ্যতা কি করে ভারতের বাইরে বিস্তৃত হল, কি করে ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, নৃত্যকলা সব চীন, জাপান, তিব্বত শ্যাম, বালি, যবদ্বীপে প্রচারিত হল; আবার তার পর সঙ্কোচের যুগ হল, ভারতবর্ষ কি করে নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবার আবদ্ধ হল—এ সব কথার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের ইতিকথা বলতেন। ক্রমে মরুভূমিতে মহম্মদের জন্ম হল, যে সব জাতি তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করল তার মধ্যে বেশীর ভাগই যাযাবর জাতীয়। তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ভারতীয়দের সভ্যতা ছিল সামাজিক। সেই সংঘর্ষের ফলে ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হল, মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে শিবজী ও শিখ আন্দোলন দেখা দিল। নানক যে ধর্ম্ম প্রচার করলেন, মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে সেই ধর্ম্ম গুরু গোবিন্দের হাতে এক ক্ষাত্রধর্ম্মে পরিণত হল। পশ্চিম থেকে যে ইংরাজরা এসে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে তা ও 'অনাহূত আকস্মিক নহে।' তার ফলে ভারতবর্ষ পশ্চিমের সংস্পর্শে এসেছে। পশ্চিমের সংস্রব থেকে বঞ্চিত হলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত হত।' এই রকমে খুঁটি নাটীর মধ্যে না গিয়ে তিনি ছাত্রদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা পরিপূর্ণ ছবি দিতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতা আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :— "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

তাঁর "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে," তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিয়েছেন নানা রকম ইতিহাসের মাল মসলা সংগ্রহ করবার জন্য। বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহ করতে, নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ও প্রতিবেশীদের আচার ব্যবহার, ও বাংলার ব্রত পার্বন, গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া সংগ্রহ করতে তিনি ছাত্র সমাজকে আহ্বান করেছিলেন। আর তিনি নিজেই ছেলে ভুলান ছড়া সংগ্রহ করে নিজের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তার স্থান সাহিত্যে অনেক ঊর্দ্ধে।

এ ছাড়া তিনি ছাত্রদের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার একটা ছবি দিতে ও চেষ্টা করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে ইতিহাসের পাঠ্য তালিকা আছে, সেটা এমনভাবে গঠিত যে ছাত্ররা কয়েক বৎসরে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার একটা পরিচয় পায়। অন্য বিদ্যালয়ে যেমন শুধু ভারতের ইতিহাসের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, এখানে সে রকম নয়। একেবারে নিম্নতম শ্রেণীতে ভারতের ইতিহাসের গল্প, বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত ও জাতকের গল্প, পরে ভারতের ইতিহাসের অপরাপর গল্প, এর পরে মিশর, ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস ও রোমের গল্প, তার পর মধ্যযুগের ইসলামীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতা, শেষে ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা ও ভারতের কথা বলা হয়। এই রকমে ছাত্রদের

পৃথিবীর সভ্যতার একটা সম্পূর্ণ ছবি দেবার চেষ্টা করা হয়।

এ সম্পর্কে Wells সাহেব তাঁর ইতিহাসে যে ছবি দেবার চেষ্টা করেছেন, সেই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়া দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক পূর্ব্বে। ছাত্রদের জন্য ইউরোপীয় ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে লেখবার জন্য তিনি অনেক আগে স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন। সম্ভবতঃ, এ বিষয়ে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

তৎ-ত্বম্ অসি

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

জ্ঞানীর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ। তাঁর সাধনার সিদ্ধি হয়েছে। সামনে তাঁর পথ উন্মুক্ত—যে পথে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লাভ নিশ্চিত। মায়ামরীচিকা কাটলো—যেটা তার পরিণামরিক্ততাকে পূর্ণত্বের খোলসে ঢেকে রেখে ভোলাতে চেয়েছিল ও যেটা পথ আগলে ছিল। জ্ঞানী যখন নিরাসঙ্গ নির্ম্মল চিত্ত হলেন, তখনই সব রহস্য ধরা পড়লো। তারপর সৎচিৎ আনন্দের স্বরূপ নিজের মধ্যে দেখে তিনি বলে ওঠেন, এতদিনে আমার সব শেষ হ'লো, পাবার জিনিস পেলাম। এই চরম পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত আমি কি? ভগবান্ আদরে এগিয়ে নিয়ে তাঁকে বলেন পণ্ডিত, তুমি যে আমি।

প্রেমিক ভক্তেরও ঐ দশা, তিনিও চলেছেন, "তনু মন প্রাণ" যাঁর মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ তাঁর কাছে; "চোখের চেয়ে দেখা" "কানের শোনা" "হাতের নিপুণ সেবা" আর "আনা-গোনা"টি পর্য্যন্ত নিয়ে দেবেন বলে। তিনি কিছুই শেষ করতে চাননা "দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া জনম জনম" চালাতে চান। তিনি বলেন "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম যে হতো মিছে" তাই তো "আমায় তুমি অশেষ করেছ।" ভগবান্ তখন হেসে বলেন—সেই জন্যেই তোমায় নইলে আমার চলে না প্রেমিক কবি তুমি যে আমার।

আর চরাচর সমস্বরে বলে ওঠে প্রেমিক তুমি তাঁর, **তুমি তাঁর**।

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

৪

৩রা পৌষ ১৩২৭—তারিখে আশ্রমের অধ্যাপকগণ পূজনীয় বড়বাবু মহাশয়ের কাছে আসিয়াছিলেন এই সময় গুরুদেব বিদেশে গিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদের বলেছিলেন, "যীশুখৃষ্ট তাঁর disciple দের বলতেন, Lord, Lord, আমাকে বলে কি হবে আমার পিতার বাক্য পালন কর। গুরুদেবের দোহাই দিলে কি হবে। গুরুদেব যা' চান তাহাই তাঁহার শিষ্যদের করা উচিত। তিনি চান আশ্রমকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে। এতে ভয় পাবার কি আছে? তিনি সারা পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগ স্থাপন ক'রতে চান আমরা কি তাঁহার কাজে সহায়তা করবো না।"

৬ই পৌষ—আজ কাল গুরুদেবের কথা প্রায়ই বলেন। ৭ই পৌষে আচার্য্যের কাজ কে করিবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। বলিলেন "রবি খুব কাজ করছেন। আমাদের family motto কী, জান?—'Work will win'—রবি সেটা literally পালন করেছেন। আমাদের ভাইদের মধ্যে রবিই সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সতু (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিরীহ ছেলে মানুষ, রবি active, আব আমি কিচ্ছু না। রবি স্বদেশী দলের সঙ্গে মিশতেন, কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের (মহর্ষিদেবের) influence তাঁকে বাঁচিয়েছেন। রবির শিক্ষাকে বাংলাদেশ প্রথমে গ্রহণ করে নাই। দেশের অধিকাংশ লোকেরা এখনও তাঁকে ভাল করে বুঝতেই পারিনি।"

এই সময় তিনি পূজনীয় গুরুদেবকে Graphic পত্রিকা পাঠ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

রবি, ১৬ই জুলাই ১৯২০।

Graphic এ ভারতবর্ষের রাজ্যে তোমার শুভ অভিষেকের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করিয়া আমি যে কীরূপ আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন সেই তোমাকে যখন আমি শ্রীকণ্ঠ বাবুর ক্রোড়ে "ছোড় ব্রজ কী বাঁশরী" কপচাইতে দেখিয়াছিলাম, তখন এরূপ পরমাদ্ভুত অভাবনীয় ব্যাপার আমি যে আমার মর্ত্ত্যজীবনে দেখিব তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। জম্বুদ্বীপের রাজসিংহাসনে তুমি অধিরূঢ় হও বা নাই হও—সাত সমুদ্র পারের শ্বেতদ্বীপের (Albionএর) মনীষী এবং হৃদয়বান মহৎ লোকদিগের হৃদয়দ্বীপে তুমি যে তোমার পুণ্য স্বারস্বত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছ সে বিষয় আর আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের এই অধঃপতিত বিষাদাচ্ছন্ন রোগ শোকে জর্জ্জরিত হতভাগ্য দেশের এক কোণে তুমি যে গোকুলে বাড়িতে ছিলে—ইহা বিশ বৎসর পূর্ব্বে—কাহারও সাধ্য ছিল না ধ্যানেও

উদ্ভাবিত করা। Graphic দৃষ্টে—কী আর বলিব, আমি আশ্চর্য্যে থ বানিয়া গিয়াছি। এই ঘটনাটি শুধু কেবল কালের একটি চল্‌তি গোছের তরঙ্গ নহে, ইহা একটি আবহমান পরবর্ত্তী কালের সর্ব্বথা স্মরণার্হ ঐতিহাসিক জয়স্তম্ভ—অমঙ্গলের ভয়াবহ অন্ধতমিস্র ভেদ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান মঙ্গলের অভয়-জ্যোতিঃ। এ ঘটনাটি সামান্য ঘটনা নহে—এই মর্ত্ত ঘটনাটিতে জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার স্বর্গীয় মহিম'—বরণীয় ভর্গ দেদীপ্যমান। তোমার সহিত সমস্বরে "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি, নমস্তেস্তু, মা মা হিংসী,—পাঠ করিয়া এই খানে আজ ক্ষান্ত হইলাম। সিদ্ধিদাতা বিশ্ববিধাতার অমোঘ প্রসাদ বারি বর্ষণে তোমার অপরাজিত আত্ম প্রভাব হইতে রাশি রাশি অমৃত ফল উদ্বেলিত হইয়া ত্রিতাপ-তপ্ত তৃষিত পৃথিবীর দেশ বিদেশে পরিকীর্ণ হউক ইহাই সেই করুণার সাগরের নিকটে অন্তরের সহিত সকাতরে প্রার্থনা করিতেছে তোমারই

স্নেহেবাঁধা

বড় দাদা

ইংলণ্ড হইতে এই পত্রের প্রত্যুত্তরে পরমারাধ্য পূজনীয় গুরুদেব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ওঁ

শ্রীচরণেষু—

বড়দাদা, এণ্ড্রুজের কাছে আমার সব খবর জানতে পারবেন। য়ুরোপে আমাকে যে এরা এত বেশী সমাদর করে তা আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। এদের এই সম্মান সমাদরের মধ্যে কোথাও কিছু কাঁটা নেই, বাধা নেই। জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর এখানে বড় অসময়—কেউ সহরে থাকে না—সেইজন্য এবারকার পালা যথোপযুক্ত পরিমাণে জম্‌ল না। এরা আমাকে সবাই বলচে আগামী এপ্রেল, মে, জুন মাসে এখানে আসতে। কাজেই আমেরিকা থেকে এই পথ দিয়েই ফিরবো, আর সেই সময়ে একবার যতদূর পারি য়ুরোপে ঘুরে যাব। সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে যদি আমি শান্তিনিকেতনের যোগ স্থাপন করতে পারি তাহলে আমার জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য সার্থক হবে। পৃথিবীর বাইরে আমরা যদি একলা পড়ে থাকি তাহলে আমরা বর্ত্তমান যুগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হব। শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই আয়োজন প্রস্তুত হয়ে আছে এবার অবিলম্বে সেখানে আসর জম্‌বে। চারিদিক থেকেই উৎসাহ পাচ্চি। আমার এবারকার প্রবাস-যাত্রা পূর্ণভাবে সার্থক হবে এই আশা করচি। দেশে যে সব কলহ কোলাহল চলবে, বড় দেশ এবং বড় কালের মধ্যে তাকে বিস্তৃত করে দেখ্‌লে বুঝতে পারি তার মধ্যে কত প্রচুর ব্যর্থতা। আমার প্রণাম জান্‌বেন। বড়দিদি চলে গেলেন—যাবার আগে তাঁকে দেখতে পেলুম না, তাই মনে বড় বেদনা বোধ হচ্চে। ইতি

সেবক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই পত্রখানি লেখা হইয়াছিল। তারপর পূজনীয় বড়বাবু মহাশয় অধ্যাপক লেভি, উইন্‌টারনিট্‌জ, ষ্টেন কোনো ফরমিকী প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীদিগের সহিত আলাপ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া

ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অধ্যাপক ফরমিকীর সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, "আগে আমি রবিকে ঠিক বুঝিনি। তিনি এই পণ্ডিতদের এনে আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ করছেন। এতে ভারতবর্ষের প্রভূত উপকার হইবে।"

মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

জার্ম্মেন প্রোফেসার কার্ল ফন ফ্রিস্ অনেক দিন যাবৎ মৌমাছিদের লইয়া নানা-রকম পর্য্যবেক্ষণের নিযুক্ত আছেন। তাহার এই পর্য্যবেক্ষণে ফলে মৌমাছিদের সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারই ছাত্র রোয়েশ্ (Rosch) সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

দূর হইতে আমরা যখন একটি মৌচাকের দিকে তাকাই তখন চাকের কোন একটি বিশেষ মৌমাছির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। অত মৌমাছির মধ্যে কোন একটি বিশেষ মৌমাছি চোখে পড়া সম্ভবও নয়। প্রথম দৃষ্টিতে চাকের মৌমাছিগুলিকে কী ব্যস্ত বলিয়াই না মনে হয়! যেন উহাদের এক মুহূর্ত্তেরও ফুরসৎ নাই। কেবলি যেন ছুটাছুটি করিতেছে। যেগুলি বসিয়া আছে সেগুলি ও যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নয়; পাখা, পা ও মাথার শুঁড় নাড়ায় যেন উহাদের বিরাম নাই। রোয়েশ্ সাহেব বলেন দূর হইতে চাকের মৌমাছি গুলিকে যেমন ব্যস্ত বলিয়া মনে হয় সব সময়েই সবগুলি মৌমাছিই যে অত ব্যস্ত থাকে, তা নয়। উহাদের মধ্যেও কুঁড়েমি, অলসতা আছে; বসিয়া বসিয়া একটু আরাম ও উহারা করিয়া থাকে; কাজ হইতে ছুটি নিয়া একটু খেলা করিবার ইচ্ছাও যে উহাদের নাই এমন নয়।

চাকের মৌমাছিগুলিকে আলাদা আলাদা দেখিবার আমাদের সুবিধা হয় না বলিয়াই মৌমাছিদের অতগুলি দোষ আমাদের নজরে পড়ে না। সেই জন্য রোয়েশ্ সাহেব নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া চাকের মৌমাছি গুলিকে আলাদা আলাদা পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টায় তিনি কৃত-কার্য্যও হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি চাকের ভিন্ন ভিন্ন মৌমাছিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিহ্নিত করেন—উহাদের তিনি আলাদা আলাদা একটি নামও দেন। একটি মৌমাছির জন্ম হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি-

ছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পাঠকদের সুবিধার জন্য এই বিশেষ মৌমাছিটিকে একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা যাক্। মনে করা যাক্ উহার নাম যেন 'মোলিসা'। (Kipling সাহেবের বিখ্যাত গল্প "Mother Hive" নামক গল্পের নায়িকার নাম হইতে এই নামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।)

'মোলিসা' রাণীও নয় কিম্বা রাণীর সহচর পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাও নহে। সুতরাং চাকের বংশরক্ষা বা বংশবৃদ্ধির জন্য উহাকে ভাবিতে হইবে না। অন্যান্য ভৃত্য শ্রেণীয় যে সকল মৌমাছি চাকে বাস করিতেছে সে উহাদেরই সমজাতীয়।

মক্ষীরাণীর অসংখ্য ডিমের মধ্যে একটি ডিমরূপেই চাকের মধ্যে "মোলিসার" প্রথম জীবন আরম্ভ হয়। তাহার প্রথম কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল যেদিন হইতে সে ডিমের মুখের পাতলা পর্দাটি ছাড়াইয়া মক্ষিকা হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

ছোট্ট কোটরটি (cell) হইতে বাহির হইয়া প্রথমই তাহার কাজ হইল নিজের দেহটিকে পরিষ্কার করা। গায়ে তখনও ছিন্ন-খোলসের দুই এক টুকরা এখানে সেখানে লাগিয়া থাকিতে পারে। তাই সে অতি সাবধানে পা দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া প্রথমে মাথা ও চোখ দুটি পরিষ্কার করিল। তারপরেই সে শুঁড় (feelers) ও ডানা দুটিরদিকে মনোযোগ দিল। এই কাজ করিতে করিতে সে দুই একবার উড়িবার চেষ্টা করিয়াও দেখিল ডানায় জোর হইয়াছে কি না, উড়িতে সে পারে কি না। ততক্ষণে সে উদরে ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিল। চাক ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিবার মত ক্ষমতা এখনও তাহার হয় নাই। কে উহাকে খাওয়াইবে? এই জন্য চাকের বয়োজ্যেষ্ঠ মৌমাছিদের দ্বারা আনিত মধুর উপরই উহাদের নির্ভর করিতে হয়। আহারের জন্য তাহাদের নিকট গিয়া উহারা কখনও শূন্য উদরে ফিরিয়া আসে না। প্রথম জীবন আরম্ভের সময় নবজাত অসহায় শিশু মৌমাছিগুলিকে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মৌমাছিরাই খাওয়াইয়া থাকে।

পা ও ডানা দুটি একটু শক্ত হইলেই উহারা কাজে নিযুক্ত হয়। 'মোলিসার' প্রথম কাজ হইল চাকের শিশু-গৃহ (nursery) গুলি পরিদর্শন করা। এইজন্য চাকের প্রায় প্রত্যেকটি ছোট ছোট কোটরগুলিতে (cell) মাথা ঢুকাইয়া তাহাকে দেখিতে হইল। দুই একটি শূন্য কোটরে সে মাথা ঢুকাইয়াই বাহির হইয়া আসিল। কোনটায় ঢুকিয়া দুই এক মিনিট দেরী করিল; কোনটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে উহার বেশ একটু দেরী হইল।

কোটরগুলিতে ঢুকিয়া বাহির হইতে 'মোলিসার' দেরী হইবার কারণ? যে কোটরগুলিতে 'মোলিসা' ঢুকিয়াছিল যদি সেই কোটরগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে ঘণ্টাখানিক যাইতে না যাইতেই মক্ষীরাণী সেই সকল কোটরে ডিম পাড়িতে আসিয়াছে মক্ষীরাণী কখনও অপরিষ্কার কোটরে ডিম পাড়িবে না। নবজাত মৌমাছিগুলির প্রথম কাজ শূন্য কোটরগুলি পরিষ্কার রাখা। শূন্য কোটরগুলি পরিদর্শন করিয়া যাইবার পর মক্ষীরাণী সেই সকল কোটরে ডিম পাড়িতে আসে নাই, এমন কখনই দেখা যায় না।

মক্ষীরাণী যখন ডিম পাড়িবার সময়ে বাহির হয় তখন সবগুলি শূন্য কোটরই যে পরিষ্কার অবস্থায় থাকে, তা নয়। যে কোটরটি সে পরিষ্কার দেখিতে না পায় উহার ভিতর মাথা ঢুকাইয়া সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে; সেখানে সে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিবে না। একটু পরেই 'মোলিসার' মত একটি নবজাত ঝাড়ুদার মৌমাছি হয়তো ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। শূন্য কোটরটি যে অপরিষ্কার তাহা বুঝিতে উহার দেরী হইল না। অমনি সে উহার ভিতর মাথা ঢুকাইয়া পা দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কোটরটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। এইবার মক্ষীরাণী ঘুরিতে ঘুরিতে এইদিকে আসিলেই উহার ভিতরে ডিম পাড়িবে।

শূন্য কোটরগুলি পরিষ্কার হইয়া গেলে নবজাত শিশুগুলির বিশ্রামের সময়। 'মোলিসা' বিশ্রাম করিবার জন্য চাকের মধ্যে গরম দেখিয়া একটি জায়গা বাছিয়া লইল। কোন-কিছু-না-করিয়া দুই এক ঘণ্টা কাল সে সেখানে হয়তো বসিয়াই কাটাইবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে কাজে নিযুক্ত হইতে সে ইতস্ততঃ করিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যেমনই শিশু-গৃহটির (nursery) এক স্থানের তাপ মাত্রা কমাইয়া দেওয়া গেল অমনি বিশ্রাম-রত মৌমাছিগুলি চারিদিক হইতে সেইখানে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানটিকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া সেই স্থানটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

তৃতীয় দিন হইতে সে আর কেবলমাত্র শিশু গৃহগুলির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে না। এখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইবে সে যেন এখন আর চাকের একজন আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র নহে—চাকের ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্বপূর্ণ মৌমাছি-দের মধ্যেও সেও যেন একজন। এখন হইতে তাহাকে যখন তখন চাকের ভাণ্ডারের দিকে—যেখানে মধু ও ফুলের রেণু সঞ্চিত হয়—সেই দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে দেখা যাইবে। যে-সকল মধু-পোকার (larva) আহারের প্রয়োজন তাহাদের মুখে সে হয়তো একটু মধু কিম্বা ফুলের রেণু তুলিয়া দিবে। মাঝে মাঝে এক একবার শিশু গৃহটিও পরিদর্শন করিয়া আসিবে। কোন একটি কোটর অপরিষ্কার আছে দেখিতে পাইলেই উহার ভিতর ঢুকিয়া কোটরটি পরিষ্কার করিবে। কিন্তু এখন হইতে উহার প্রধান কাজ মধু-পোকাগুলিকে (larva) খাওয়ান। কিন্তু সে সমস্তদিন ধরিয়াই উহাদের খাওয়ায় না। একটু খাওয়াইয়া হয়তো সে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে বসিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া পা ও ডানা দিয়া ঘসিয়া গা-টি পরিষ্কার করিবে। কখনও কখনও কিছু না করিয়া কেবল চুপ করিয়া বসিয়াই থাকে। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ এক জায়গায় উহাদের বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে নিজ হইতেই আবার কাজের জন্য উহারা উঠিয়া পড়ে। 'মোলিসা' মৌ-পোকাগুলিকে খাওয়ায় বটে কিন্তু সব রকমের মৌ-পোকাদের খাওয়ানই উহার কাজ নয়। নিকটে মৌ-পোকা থাকিতেও উহাকে অন্য মৌ-পোকার খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। মৌ-চাকের যে পোকাগুলি দুই একদিনের মধ্যে ফুটিয়া মৌমাছি হইয়া বাহির হইবে কেবল উহাদেরই 'মোলিসা' খাওয়াইয়া থাকে। পোকা-

গুলির (larva) প্রথম অবস্থায় চারদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত বয়োজেষ্ঠ্য মৌমাছিগুলি উহাদের খাওয়ায়। তখন উহাদের খাদ্য জেলির (jelly) মত এক রকম নরম পদার্থ। 'মোলিসা' যখন উহাদের খাওয়াইবার ভার লয় তখন উহাদের খাদ্য হয় ফুলের রেণু ও মধু। কিন্তু 'মোলিসা' ও উহার সমবয়স্ক মৌমাছিগুলি যে কি করিয়া পোকাগুলির (larva) ভিন্নভিন্ন অবস্থা বুঝিতে পারে এখনও তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

'মোলিসার' এতদিন পর্য্যন্ত চাক-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা চাকের শিশু-গৃহ ও খাদ্য-ভাণ্ডারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এইবার সে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবার জন্য চাকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিদর্শন করিতে বাহির হইল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ইহা যেন তাহার পক্ষে বড় শ্রমসাধ্য কাজ। একটু চলিয়াই সে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত এখন উহার আর আতঙ্কের ভাব নাই। পূর্ব্বে একটি মৌমাছিকে মধু লইয়া চাকের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেই ভয়ে কেমন জড়সড় হইয়া যাইত, এখন পথের মধ্যে থামাইয়া তাহাদের নিকট হইতে মধু চাহিয়া লইতেও সে আর ভয় পায় না। চারিদিকেই এখন তাহার কেমন সজাগ দৃষ্টি। মৌমাছিগুলি যখন বাহির হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চাকে ফিরিয়া আসিয়া অন্যান্য মৌমাছিদের নূতন নূতন ফুলের সংবাদ জানাইবার জন্য চাকে বসিয়া নৃত্য করিতে থাকে (ফ্রিশ্ সাহেবের মতে মৌমাছিরা নৃত্য দ্বারা পরস্পরের মধ্যে খবরের আদান প্রদান করিয়া থাকে) তখন সে অতিশয় কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে উহাদের দেখিতে থাকে।

'মোলিসা' ঘুরিতে ঘুরিতে চাকের দুয়ারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে মৌমাছি দলের খুবই ভিড়। সেখানে দলে দলে মৌমাছি মধু লইয়া একবার চাকে প্রবেশ করিতেছে, মধু রাখিয়া পর-মুহূর্ত্তে মধুর অন্বেষণে আবার বাহিরে যাইতেছে। চারিদিকের এইকর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যে পড়িয়া 'মোলিসা' নিজকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। কোন্ এক অজানার আকর্ষণে সেও এতদিনের পরিচিত গৃহটি পরিত্যাগ করিয়া বহির্গামী একদল মৌমাছির দলে ভিড়িয়া গেল।

'মোলিসা' উড়িল। কিন্তু মধু অন্বেষণের জন্য নয়। এই ওড়া শুধু মনের কৌতূহল তৃপ্তি করা, বাহির পৃথিবীর সহিত একটু পরিচয় লাভ করা। সকলকে উড়িতে দেখিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই সেও সকলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

আমরা মৌমাছিদের উড়িতে দেখিলেই মনে করি মধুর অন্বেষণে উহারা বাহির হইয়াছে। 'রোয়েশ' সাহেব এ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে মৌমাছিদের প্রথম এই ওড়া মোটেই আহার অন্বেষণের জন্য নয়। যে-মৌমাছিগুলি প্রথম উড়িল, উড়িবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদের মুখের কাছে আহার্য্য রাখিয়া দেখিয়াছেন, আহার্য্যের দিকে উহাদের বিশেষ মন নাই। বরং বাহির হইতে উহারা যখন চাকে ফিরিয়া আসিল তখন অন্যান্য মৌমাছিদের নিকট হইতে মধু চাহিয়া উহারা খাইল। তিনি বলেন উহাদের প্রথম ওড়ার উদ্দেশ্য রাস্তা চেনা, চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা। 'মোলিসা' ও তাহার সমবয়স্ক মৌমাছিগুলি চাক হইতে প্রথম বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াই চাকের

দিকে মুখ ফিরায়। সেই অবস্থাতেই চাকের দিকে মুখ রাখিয়া চারিদিকে পাক খাইয়া চাকটিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ভবিষ্যতে বাহির হইতে হইলে রাস্তা চিনিয়া উহাদের চাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং চাকের চারিদিকটি উহাদের ভাল করিয়া দেখিয়া রাখা প্রয়োজন। যে মৌমাছিটি প্রথম উড়িয়া চাকে ফিরিয়া আসিল উহাকে চাক হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সে রাস্তা চিনিয়া সহজেই চাকে ফিরিয়া আসিতে পারিল। যে মৌমাছিটি চাক ছাড়িয়া কোন দিন বাহির হয় নাই উহাকেও দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেখা গিয়াছে সে রাস্তা চিনিয়া চাকে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পরিষ্কার দিন দেখিয়া 'মৌলিয়া' আরও দুই একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু এই নবলব্ধ জ্ঞান লাভের উত্তেজনায় সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় নাই। বাহির হইবার পূর্ব্বে এখন ও আরও কিছুকাল উহাকে চাকে থাকিতে হইবে। চাকের ভাঁড়ারে মধু কিম্বা ফুলের রেণুগুলিকে পৌঁছাইয়া দেওয়া, চাকের শূন্য কোটরগুলি পরিষ্কার রাখা, বাচ্চাগুলির কোটর হইতে বাহির হইবার সময় মুখের পর্দ্দাগুলি সরাইয়া উহাদের বাহিরে আনিবার সাহায্য করা, সর্ব্বোপরি চাকটিকে চৌকি দেওয়, এই সকল কাজ উহাকে আরও কিছু কাল চাকে থাকিয়া করিতে হইবে।

এইবার 'মৌলিয়া' চাকের পাহারায় নিযুক্ত হইল। সকালে মৌমাছির দল মধুর অন্বেষণে চাক হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে চাকের দুয়ার আগলাইয়া বসিয়া আছে। তার মত এইরূপ আরো অনেক মৌমাছির কাজ চাকটিকে পাহারা দেওয়া। কেহ দুয়ারের সামনে, কেহ দুয়ার হইতে দূরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যত মৌমাছি বাহির হইতে চাকে ঢুকিবে সকলকেই উহারা একবার পরীক্ষা করিয়া লইবে। যাহারা চাকে না বসিয়া চাকের নিকটেই একটু উপরে গুন্‌গুন্ করিয়া উড়িতে থাকে উহাদেরও একবার পরীক্ষা না করিয়া তাহাতে ছাড়িবে না। উহাদের এই সতর্কতা —যদি বন্ধুরূপে শত্রুপক্ষের চর চাকে ঢুকিয়া পড়ে? সকলেরই নিকট গিয়া উহারা মাথার শুঁড় দুটি ও পিঠের ডানা দুটি নাড়িয়া দেখিবে। কোন অপরিচিত মৌমাছি চাকে ঢুকিবার চেষ্টা করিলেই পথ বন্ধ। নিমিষের মধ্যে শত্রুপক্ষের আগমনের সংবাদ চারিদিকে রটিয়া যায়। তখন পাহারা-ওয়ালার দল চারিদিক হইতে দুয়ারের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে। পরক্ষণেই দুই পক্ষে লড়াই! কামড়াইয়া, হুল ফুটাইয়া দুই দলই দুই দলকে কাবু করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। চাকের দুয়ারের সামনে শত্রু পক্ষের সহিত যে লড়াই হয় তাহাতে কেবল পাহারা-ওয়ালার দলই যোগ দেয়। অন্য মৌমাছিরা যে যেখানে যে-কাজে নিযুক্ত আছে নিশ্চিন্ত মনে সে সেই কাজ করিতে থাকে—মধু আনা যার কাজ সে নিশ্চিন্ত মনে তেমনি মধু আনিবে, বাচ্ছাগুলিকে খাওয়ান যার কাজ সে নিশ্চিন্ত মনে তেমনি বাচ্চাদের খাওয়াইবে, চাকের ছোট ছোট ঘরগুলি তৈরী করা যার কাজ সে তেমনি নিশ্চিন্ত মনে তেমনি ঘর বাড়ি তৈরী করিবে।

অনেকের বিশ্বাস একদল মৌমাছির কাজ বুঝি বরাবর চাকটিকে পাহারা দেওয়া,

তা নয়। মধু অন্বেষণে চাক হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে সকল মৌমাছিকেই পাহারা ওয়ালার এই শিক্ষানবিশী করিতে হয়। 'রোয়েশ্' সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিছুকাল একদল হয়তো পাহাড়ার কাজ করিল উহাদের সময় উত্তীর্ণ হইলেই অন্য এক দলের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া উহারা অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

এই চৌকি দিবার সময় কতকগুলি মৌমাছি যে একটু কুড়েমি না করে তাও নয়, আবার কতকগুলির চৌকি দিবার উৎসাহ এত বেশী যে, দিন রাত্রির মধ্যে দুয়ারটি ছাড়িয়া উহারা বড় একটা কোথাও যায় না। মাঝে মাঝে বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য একটু দূরে গেলেও লড়াইয়ের একটু সাড়া পাইলে এমন উত্তেজিত হইয়া ওঠে যে ব্যস্তভাবে লড়াইয়ের স্থানে ছুটিয়া আসিতে আসিতে দুই চারিটা মৌমাছিকে পায়ের নীচে মাড়াইয়া দিতেও ছাড়ে না। পাহারা-ওয়ালাদের মধ্যেও কতকগুলি লড়াই সম্বন্ধে এমন নির্ব্বিকার যে ঘোর লড়ায়ের সময়ও উহাদের ভাঁড়ারে খাওয়ার তুলিতে ব্যস্ত দেখা গিয়াছে।

'মোলিস' এইবার তাহার জীবনের শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এইবার তাহাকে চাক ছাড়িয়া বাহিরে মধু ও ফুলের রেণু আহরণের জন্য বাহির হইতে হইবে। কিন্তু কে উহার মনে এই তাগিদা জাগাইল? সে মধুই সংগ্রহ করিবে না ফুলের রেণু সংগ্রহ করিবে (কারণ মধু ও রেণু দুইই কখনও একই মৌমাছি সংগ্রহ করে না) ইহাই বা কে উহাদের নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল? ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত মধু অন্বেষণের জন্য প্রথম বাহির হইবার সময় সে অন্য কোন মৌমাছিকে অনুসরণ করে না। নিজের অন্তর্দৃষ্টির বলেই সে নূতন নূতন ফুল খুঁজিয়া বাহির করে। প্রতিদিনই দলে দলে নূতন নূতন মৌমাছি এইরূপে নূতন নূতন ফুল হইতে মধু আহরণ করে। কাজেই চাকের চারিপার্শ্বে নিকটে বা দূরে এমন একটি ফুল ও ফুটে না যাহা উহাদের দৃষ্টিতে না পড়ে।

'মোলিসার' জীবনের তারপরের কালই অন্তিম কাল। উহাদের জীবনের পরমায়ু খুব বেশী নয়। সাধারণতঃ চার সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহের বেশী উহারা বাঁচে না। কোন কোন মৌমাছিকে আট সপ্তাহ কালও বাঁচিতে দেখা যায়, কিন্তু উহাদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। যাহারা রাণীর সহচর তাহারা এ বিষয়ে একটু বেশী ভাগ্যবান তাহারা দুই তিন মাসও বাঁচিয়া থাকে। *

---

* Discovery. May, 1926.

স্মৃতি (Le Ricordanze)

(মূল ইতালিয়ান্ হইতে)

কবি জাকমো লেওপার্দি—(১৭৯৮—১৮৩৭)—ইনি ইতালির একজন শ্রেষ্ঠ কবি, প্রবন্ধ লেখক ও পণ্ডিত। সাহিত্য ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত পেত্রার্কার পরেই ইঁহার নাম। জর্ম্মন কবি হাইনের মত তিনি যৌবন হইতে চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলেও মন পূর্ব্বাপর একান্ত সতেজ ছিল, তাঁহার কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীই ইহার প্রমাণ। নিম্নে অনূদিত কবিতাটী তাঁহার আত্মজীবন মূলক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই নাতি-বৃহৎ কবিতাটিতে লেওপার্দি তাঁহার সমস্ত জীবনের একটী সুন্দর ছবি দিয়াছেন। মূলের সৌন্দর্য্য অনুবাদকের অক্ষমতায় স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ হইলেও পাঠক ইহা হইতে লেও-পার্দির কতক পরিচয় পাইবেন আশা করা যায়।

ভাবি নাই হে সুন্দর সপ্তর্ষিতারকা,
ফিরিব আবার তব অভ্যস্ত ধেয়ানে;
ঝিকিমিকি হেরি তোমা গৃহোদ্যানশিরে,
পুনঃ আলাপন হবে তোমা সনে হেথা—
বসি এই বাতায়নে, এই গৃহে মোর—
এ ভবনে—যথা মোর কাটিল শৈশব,
অবসান দেখিলাম যত আনন্দের।
জাগাইত কত ছবি কত না কল্পনা
একদিন চিত্তে মোর তব দরশন,
আর তব সহচর যত তারাদলে।
ধরার শ্যামলাসনে বসিয়া তখন
কাটিত অনেক বেলা সন্ধ্যায় আমার,
নীরবে চাহিয়া ঊর্দ্ধে শুনি দূরাগত
পল্লী-প্রান্ত-হতে-আসা দাদুরীর গান;
উদ্যানবৃতির পাশে ভ্রমিত জোনাকি
কেয়ারির পরে পরে; উদ্যান বীথিকা
আর বনভূমি মাঝে 'সাইপ্রেস' লতা
বাতাসেতে দিতে শীষ, মোর গৃহতল
ধ্বনিত ইহত রহি রহি এই স্বরে,
নিশ্চিন্ত কর্ম্মেতে রত ভৃত্য কলরবে।

কত না ভাবনাচয় মধুর স্বপন
চিত্তে জাগাইত ওই দূর সমুদ্রের
ছবিখানি, আর ওই নীল শৈলরাজি
হেথা হতে দৃশ্যমান, যাহা একদিন
লঙ্ঘিব ভাবিয়াছিনু, এ আশে—জীবনে
মিলিবে রহস্যরাজ্য, রহস্য সুখের!
নাহি জানিতাম ভাগ্য! কত কত বার
চাহিব যে স্ব-ইচ্ছায় মরণের সহ
দুঃখময় এই শূন্য-প্রাণ-বিনিময়।

হৃদয় কহেনি মোরে সবুজ বয়সে
হেন অভিশাপ ছিল—খোয়াইতে তারে
বর্ব্বর লোকের মাঝে—নীচমনা যারা
তত্ত্ব ও জ্ঞানেরে ভাবে হাস্য কৌতুকের
উপাদান, ঘৃণা করি দূরে যায় স'রে,
নহে সে মাৎসর্য্যবশে দেখিয়া আমার
গৌরবের অভিনয়, কিন্তু মনে মোর
এ প্রত্যয় ছিল [illegible] আমি শ্রেষ্ঠ সবাকার,—
বাহিরে প্রকাশ কভু যদিও করিনি
কারো কাছে। গেল হেথা এই যে বয়স

ত্যক্ত ও অজ্ঞাত—প্রেমহীন প্রাণহীন—
সহজে কঠোর তাই হইতে হইল
অকরুণ সেই প্রাণীযূথের মাঝারে।
করুণা ও সাধুবুদ্ধি লইল বিদায়,
হইনু মানবদ্বেষী, হেতু ছিল তার
মোর আশে পাশে যত মূঢ় প্রাণীদল।
এরি মাঝে অপসৃত হে প্রিয় যৌবন!
প্রিয়তর কীর্ত্তি হতে জয়মাল্য হতে,
প্রিয়তর সমুজ্জ্বল দিবালোক আর
প্রাণবায়ু হতে, আমি হারানু তোমায়
নিরানন্দ অমানুষ-প্রবাসে বৃথায়,
হে কুসুম অপরূপ শুষ্ক প্রাণশাখে?

পল্লী মন্দিরের চূড়ে ঘণ্টার শবদ
বহিয়া আনিছে বায়ু; দিত সে আশ্বাস
শিশুকালে এই শব্দ—মনে পড়ে এবে
অন্ধকার ঘরে নিত্য নিয়ত তরাসে
অঘুমে কাটিত রাত, যবে দীর্ঘশ্বাসে
প্রভাতের প্রতীক্ষায়। নাই হেন কিছু
দেখিলে যাহারে এবে অথবা শুনিলে
অন্তরে না জাগে ছবি, মধুময় স্মৃতি
—স্মরণেই মধুময়—কিন্তু দুঃখ লয়ে
আসে আজ চিন্তা, আর অসার নিষ্ফল
বাসনা সে অতীতের—যদিও বিষাদে—
আর এ ভাবনা হায়—কখনো ছিলাম...
ওই যে বারান্দা হোথা ফিরি দিবসের
অবসান রশ্মি-পানে, চিত্রিত দেয়াল
এই আঁকা পশুপাল, নির্জ্জন প্রদেশে
নব সূর্য্যোদয়, আনি হর্ষ শত শত
ভরে অবসর মোর, ভ্রান্তি বলবতী
মুখরা সদাই পাশে যথা থাকি নাক।
এ পুরাণো গৃহে বায়ু, তুষার প্রভায়
শীষ দিয়া বহে এই বড় জানালায়
ধ্বনিত করিয়া তুলি উৎসুক উল্লাস
আর অবসর মোর, তুচ্ছ সুকঠোর
সংসার রহস্য যবে দেখা দেয় আসি
পূর্ণ মাধুর্য্যের রূপে, তখন যুবক
মুগ্ধ প্রণয়ীর মত জীবন কুহকে
সপ্রশংস কল্পনায় ভাবে ইহা এক
অখণ্ডিত অনাভুক্ত নন্দনের শোভা।

অয়ি আশা! হে আমার প্রথম বয়সে
সুন্দরী ছলনাময়ী, ফিরি তোমা পানে
সদাই কহি যে কথা, যেহেতু না জানি
কেমনে ভুলিব তোমা, যদিও সময়
চলে যায়, হয় অন্য প্রেম ও ভাবনা,
বুঝিয়াছি—যশোমান অসার কল্পনা,
সুখৈশ্বর্য্য বৃথা আশা, নিষ্ফল জীবন
অর্থহীন ক্লেশ, তবু যদ্যপি আমার
সারাটী বয়স শূন্য আর অন্ধকার
পরিত্যক্ত যদিও এ মর্ত্ত্যের জীবন,
ভাগ্য না বঞ্চিল মোরে, হায়! যতবার
ফিরিয়া তোমায় ভাবি, হে আশা অতীত
আর মোর যৌবনের প্রিয় স্বপ্নরাজ!
যবে চেয়ে দেখি এই হীন দুঃখময়
জীবনের পানে, আর সেই মরণেরে
যে আজো রয়েছে বাকী শত আশা মাঝে—
হৃদয় রুধিয়া আশে, মনে হয় যেন,
অদৃষ্টে সান্ত্বনা তরে নাহি কিছু জানি।

যখন নিকটে এই প্রার্থিত মরণ
আসিবেক আর হবে যত দুর্ভাগ্যের
অবসান যেই দিনে, এই বসুন্ধরা
হইবে বিদেশ ভূমি, মোর দৃষ্টি হতে

মুছে যাবে ভবিষ্যৎ, তখনো নিশ্চয়
স্মরিব তোমারে আমি সে স্বপ্ন তখনো
দীর্ঘশ্বাস বহাইবে আর মিশাইবে
দারুণ চরমদিনে মাধুর্য্যে বিষাদ।

কতবার ডাকিয়াছি মৃত্যুরে প্রথম
যৌবনের ঝঞ্ঝা মাঝে—সুখ ও দুঃখের
কামনার—বহুদিন ধরে ভাবিয়াছি
বসি ওই উৎসতীরে, ওই বারিমাঝে
শেষ করে দিতে এই আশা ও দুঃখের।
তারপর অলক্ষিতে রোগের পীড়নে
জীবন সন্দেহাকুল, কাঁদিলাম কোথা—
সুন্দর যৌবন আর কুসুম নিচয়
নিঃস্ব দিবসের যাহা অকালে ঝরিল।
গভীর নিশায় নিত্য নিয়ত বসিয়া
মোর সমদুঃখভাগী শয্যার উপর
ব্যথিত অন্তরে ক্ষীণ দীপের আলোকে
বিলাপি' নিশীথ আর নীরবতা সহ
ছন্দ রচি পলাতক প্রাণের উদ্দেশে
দুঃখভরে গাহি নিজ মৃত্যুর সঙ্গীত।

কে স্মরিতে পারে তাহা দীর্ঘশ্বাস বিনে
হে যৌবন, তোমার যে প্রথম প্রবেশ
সে সুন্দর দিন গুলি--বচন অতীত—
যেই দিনে তরুণীরা স্মিতহাস্যে চাহে
প্রথমবারের মত মুগ্ধযুবা পানে,
পরস্পরে স্পর্দ্ধা করি হাসে সেই দিনে
প্রতিবস্তু ; সুপ্ত ঈর্ষা তখনো জাগেনি
কিম্বা মৃদু (অনভ্যস্ত বিস্ময় যে ইহা !) ।
জগত ক্ষময়ে এবে ভুল ভ্রান্তি তার
বাড়ায় দক্ষিণ হস্ত সাহায্যের তরে,
নূতন প্রবেশে তার জীবন প্রাসাদে
সংসার উৎসব করে, আর নতি করি'
তাহারে বরিয়া এবে লয় প্রভু বলি।
পলাতক দিনগুলি বিদ্যুতের মত
হয় অন্তর্হিত, বল কোন মর্ত্ত্যজন
না জেনে থাকিতে পারে দুর্ভাগ্য তাহার
বৃথা চলে যবে তার কাছ হতে
সে সুন্দর ঋতুখানি—যায় সুসময়—
যৌবন—যৌবন—হায় ! হয় অবসিত
এই স্থান তব কথা কয়, হে নেরিণা !
শুনি আমি, শুনি তাহা ; মোর চিন্তা হতে
স্খলিতা নহগো তুমি ; কোথা আছ এবে ?
শুধু যে স্মৃতিটী তব পাই আজ হেথা
হে মোর মাধুর্য্যময়ি ! এই জন্মভূমি
আর না দেখিবে তোমা, পরিত্যক্ত এবে
সেই বাতায়নখানি, যথা হতে তুমি
আমারে কহিতে কথা আর যেইখানে
তারার বিষণ্ন রশ্মি ঝরিয়া পড়িত,
বল তুমি, কোথা এবে শুনি না যে আর
তব কণ্ঠধ্বনি সেই আগেকার মত
তব ওষ্ঠে-উচ্চারিত দূর-হতে-শোনা
প্রতিস্বর শ্রুতিমাঝে পশিয়া যখন
মুখের বরণ মোর করিত বদল।
সে আরেক কাল ছিল গেছে ফুরাইয়া
তোমার সে দিন আজ মধুময়ী প্রিয়া !
অপসৃতা তুমি আজ, এই পৃথ্বী পরে
নিয়তির নিয়োজনে ভ্রমে আন জন,
ফিরে সুবাসিত শৈলে অন্য প্রাণীচয়
কিন্তু ত্বরা চলে গেলে, তোমার জীবন
আছিল স্বপ্নের মত—নৃত্যময়ী তুমি,
হর্ষ-দীপ্ত তব ভাল, নয়নে তোমার
উজ্জ্বল বিশ্রব্ধ স্বপ্ন যৌবনের জ্যোতি
নিবাল জীবন দীপ্ নিয়তি যখন।

হে নেরিনা! আজো হৃদে বিরাজিছ সেই
পূর্ব্বপ্রেম, যদি আমি এখনো কদাপি
সভা ও উৎসবে যাই, বলি মনোমাঝে
হে নেরিনা, আর তুমি সভা ও উৎসব
শোভা নাহি কর আর তথা না বিচর;
মধুমাস এলে যবে কুসুমমঞ্জরী
সঙ্গীত লইয়া সাথে তরুণ প্রেমিক
তরুণী সমীপে যায়, তখনো মনেতে
ভাবি আমি, তব তরে নেরিনা আমার!
বসন্ত কখনো আর আসিবে না ফিরে,
ফিরিবে না প্রেমলীলা; প্রতি শান্ত সাঁঝ,

প্রতি পুষ্পময়ী তুমি যা দেখি নয়নে
প্রত্যেক হর্ষোচ্ছ্বাস অনুভব করি',
ভাবি আমি আর সে ত আনন্দ করে না
নেরিনা আমার, আর চাহিয়া দেখে না
বসুধারে ও আকাশে, হায় আজ তুমি
চলে গেছ, আমি চির দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
চলে গেছ, মোর প্রতি মধুর স্বপনে
সর্ব্ব সুকোমলভাবে বিষাদে ও প্রেমে
হৃদয় স্পন্দিবে যবে এই তিক্ত স্মৃতি
হইয়া রহিবে মোর জীবনের সাথী।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

বাতিঘর

১

সূর্য্যাস্তের ভরা-ডুবি হয়েছে হোথায়
ডুবে গেল দিবসের সকল সম্বল;
রক্ত পীত হিরণ্যাক পণ্য যত হায়
একে একে ডুবে খোঁজে সমুদ্রের তল।
শীর্ণ চাঁদ ভেসে আসে একতারা সাথে
তুলে নিতে তরণীতে নিমগ্ন-জীবন—
সিন্ধু-শকুনেরা ওই অসংখ্য পাখাতে

কর্কশ চীৎকার করি ছড়ায় মরণ।
হে নাবিক তুলে লও যেও নাকে ঘুরে
অস্তাচল চূড়ালম্বী একখানি প্রাণ—
সূর্য্যাস্তের শেষ-রাগে দেখা যায় দূরে
জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী সমুদ্র মহান্।
রেখে দাও উজ্জ্বলিয়া পশ্চিম-শিখর
অতর্ক-যাত্রির লাগি দীপ্ত বাতিঘর।

আকাশ কুসুম

২

ধূলি-পাণ্ডু নভতলে রুক্ষ গিরিরাজি
জড় শিলা স্তূপ বলে মনে হয় আজি—
তবু রাত্রিকালে পূর্ণ চাঁদের ধূলোটে
সমগ্র দ্যুলোক খানি লক্ষ দলে ফোটে
আকাশ কুসুমসম। মনে হয় আর
ক্ষুব্ধ গিরিশ্রেণী ফেলি পাষাণের ভার
ছিন্নপক্ষ লাভ করি চলেছে উড়িয়া

সুদূর মানসতলে। আছে থমকিয়া
শীর্ণ শাখা অন্তরালে জালে-পড়া চাঁদ
অবসর প্রতীক্ষায়। প্রান্তর অগাধ
তারা গুণে জেগে থাকা ময়ূরের ডাকে
স্বপ্নভেদী বান শূন্যে ছোঁড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
পূর্ণচন্দ্র ছোঁড়ে বসি স্বপ্নের কুসুম—
কে বলিল সত্য নয় আকাশ-কুসুম।

অনাহূতা

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল।

কত প্রিয়জনে মোরে বাসিয়াছে ভালো
ভুলায়েছে কত শশী কত ছলনায়,
বিহঙ্গের ডানা, সলিলে সন্ধ্যার আলো,
কত মেঘহীন রাতি তারায় তারায়।
দেখিয়াছি কত শত মানবের জাতি
সভ্য ও অসভ্য; কত বিভিন্ন আচার,
রাগের দ্বেষের ঘরে জ্বালায়েছি বাতি
একা; ডুবিয়াছি আমি দুঃখে বারে বার।
এলেম যখন ক্লান্ত এত বোঝা নিয়ে
তুমিই প্রথম মোরে চিনেছিলে প্রিয়ে,
স্খলিত জীবন মম বাঁধি প্রেম-ডোরে
নিজে বিরাজিলে মোর হৃদয়ের ঘরে।
সকল সৌন্দর্য্যে আজ তোমারেই পূজি
তোমার রহস্য মাঝে অসীমেরে খুঁজি।

১৯শে চৈত্র

বঙ্গ-ভাষার প্রতি

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

তুমি আমায়
এনে দিলে গান,
কাব্য দেশের মণসভায়
রাখলে মোর মান।

তাই যা দেখেছি সূর্য্যালোকে,
আভাস দিল কল্পলোকে
অস্ত-শশির প্রবাল-গৃহে
যামী-মরণে;

ভালো লাগল যত কিছু,
আমায় ঘিরে আগে পিছু,
সে সব আজি পড়ে লুটি,
তব চরণে।

বিশ্ব রাজের গানের-সভায়,
মুছে ফেলি সব অপমান,
তুমি জিনি দিলে আমায়
এ ভারতে স্থান।

২৪শে ফাল্গুন ১৩৩২

জন্ম মৃত্যু

মন্দিরের প্রতিমারে বিসর্জ্জন করি,
দাও না, ত পরাণের দেবতারে ছাড়ি।
আবার নূতন করি গড়িয়া প্রতিমা,
কতবার রচিতেছ অসীমের সীমা।
ভাঙ্গন গড়ান তাঁর কিবা আসে যায়,
সে যে মুক্ত চির সত্য ব্যক্ত বিশ্বময়।

মরিয়া মানব হ'য়ে পঞ্চে পরিণতি,
সীমা ছেড়ে হ'য়ে যায় অসীমে সংহতি।
আবার গড়িয়া উঠে নূতন করিয়া,
মরণে ক্রন্দন কেন গগন ভেদিয়া।
বারি—বাষ্প—মেঘ—বৃষ্টি রূপান্তর প্রায়,
শিশু—যুবা—বৃদ্ধ—মৃত্যু—জন্ম, এ ধরায়।

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

বিশ্বভারতী-সংবাদ

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনো সুযোগে দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্যদের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অতি অল্প সময় তাঁহাদের নিকটে ছিলাম - কিন্তু সময়ের সেই ক্ষুদ্র অঞ্জলি তাঁহারা রসে এমনি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহা শীঘ্র ভুলিব না। তখন কিছুদিন হইল মাত্র ফাল্গুনীর পালা শেষ হইয়াছে কিন্তু তখনো দাক্ষিণ পবনের শেষ তরু মর্ম্মরটি তাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল।

এখানে যে কয়েকটি তরুণ যুবকের সহিত আলাপ হইল—দেখিলাম তাঁহাদের রসপিপাসু চিত্ত সঙ্গীত ও সাহিত্যের উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই তাঁহারা সাহিত্য-ব্যবসায়ী নহেন। সংসারের দাবী মিটাইবার জন্য কেহ বা ডাক্তার কেহ বা অন্য কিছু। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকা বা লেজার বই তাঁহাদের চিত্তের সব রস শোষণ করিয়া লইতে পারে নাই। হৃদয়-বৃত্তির এই উদ্বৃত্ত অংশ দিয়া তাঁহারা যে ক্ষুদ্র সাহিত্য জগৎটি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা দিল্লীর মত প্রাকৃতিক রস বিবর্জ্জিত নগরে দেখিয়া আমি মোটেই বিস্মিত হই নাই। দিল্লী নগরী বহু সাম্রাজ্যের দায়াদ—তাহার বক্ষে যে লাঞ্ছনা তাহা কখনো জয়ের কখনো পরাজয়ের কিন্তু কদাচ অপমানের নহে। বিবিক্ত চিত্তে সে কখনো হিন্দু কখনো পাঠান কখনো মোগল বা ইংরাজের সিংহাসন বহন করিয়াছে—বড় বড় সম্রাট তাহার ক্রীড়া পুত্তলি—বড় বড় সাম্রাজ্য তাহার ক্রীড়ার প্রাঙ্গন। পর্ব্বতখচিত প্রাস্তরতলশায়িনী—কেল্লামিনারমসজিদ গম্বুজ-

মন্দিরের বুদ্বুদময়ী এই নগরী এমন একটি ঐক্যের সাধনায় ধ্যানস্তিমিতা যে স্বপ্নেও জানেন—যমুনা তাহার পদতল হইতে কত সরিয়া গিয়াছে—ময়ূরতখ্‌তের স্থানে সমুদ্র পারের কোন্‌ রাজভৃত্য আসন পাতিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্নজাতি শিখ, মারাঠা, রাজপুত, বাঙালী, ভারতবর্ষের বিভিন্নকাল—ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্ত্তমান। নিখিল ভারতের ঐক্য চক্র এখানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

দিল্লীবাসিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই মহত্বের ভাগ পাইয়াছেন। সংসারের সব ক্ষুধা মিটাইয়া এই যে প্রাচুর্য্য ইহাই শিল্পের প্রাণ। আমার তো মনে হয় না কোনো কর্ম্ম-প্রধান ক্ষুদ্র নগরে থাকিলে একয়টি তরুণ চিত্ত এমন রসের অবকাশের মধ্যে ছাড়া পাইতেন। কোনো বৃহৎ নগর কখনই কেবলমাত্র কর্ম্ম-প্রাণ হইতে পারে না। আমি বাংলা দেশের যত ক্ষুদ্র সহর দেখিয়াছি—তাহার মধ্যে রাজসাহী, নাটোর, পাবনার মত এত বড় মন-ছোট-করা সহর দেখি নাই। সহরের মধ্যে ইহারা upstart, ইহাদের না আছে গ্রামের শান্তি—না আছে বড় সহরের উদারতা। এই মধ্যবিত্ত সহরগুলি আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এই সব সহরের অলিতে গলিতে উকীল মোক্তার পোনেতিনগণ্ডা লাভ-করা দোকানদার, শতকরা পাঁচশত টাকা সুদ ও আড়াই পয়সার পালং শাক-খোর মহাজনের আড্ডা। এই সব philistine সহরের এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া—যে বাহিরের লোক গেলে দুই দিনেই মন-মরা হইয়া যায়।

এই সব সহরে অনেক তরুণ উকীল ডাক্তার দেখিয়াছি কিন্তু তাহাদের ব্যবসায়ের নিরেটত্বার মধ্যে কোথাও অবকাশের বাতায়ন নাই।

দিল্লীর বেঙ্গলি ক্লাবের সভ্যগণ পরম পূজনীয় আচার্য্যদেবের জন্মদিনে একত্র হইয়া উৎসব করিয়াছিলেন ও তদুপলক্ষ্যে তাঁহাকে এই কথাটিই বিশেষভাবে জানাইয়াছিলেন যে তিনি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন—তাহার স্পর্শ তাঁহাদের চিত্তেও লাগিয়াছে।

*　　*　　*

আশ্রমের দুইজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও অধ্যাপক কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শান্তিভবন

২ নং নেবু বাগান লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাক্তন ছাত্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত বি, এ, কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের আদর্শে একটি ছোটখাট বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজি, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ই পড়ান হইবে। এখানে ছাত্রদের নিয়মিত সঙ্গীত, চিত্রকলা, মডেলিং, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত পাঠ-

চর্চ্চা হইবে। পূজার সময় একমাস ও গ্রীষ্মের সময় দেড়মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে সৎসংসর্গে থাকিয়া আনন্দে শিক্ষালাভ করে এবং যাহাতে তাহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক, অনুসন্ধিৎসু, সুস্থ ও সবল হইতে পারে তাহাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর ছাত্র থাকিবে। (১) যাহারা সকালে আসিয়া পাঠান্তে বিকালে চলিয়া যাইবে (২) যাহারা এখানে ছাত্রনিবাসে থাকিবে। প্রথমোক্ত ছাত্রদের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা, এক টাকা স্পোর্টিং এবং ৬৲ টাকা ভর্ত্তি ফী লাগিবে। শেষোক্ত ছাত্রদের মাসিক বেতন ২৩৲ টাকা ভর্ত্তি ফী ২০৲ টাকা এবং এক টাকা স্পোর্টিং ফী দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের কাগজ কলম, বই পেন্সিল প্রভৃতির জন্য ভর্ত্তির সময় ১০৲ টাকা জমা দিতে হইবে। ৵১০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে এই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী পাঠান হয়। চিঠিপত্র ও বেতনাদি নিম্নলিখিত ব্যক্তির নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
২ নং নেবুবাগান লেন
বাগবাজার, কলিকাতা।

•

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে আশ্রমের দলের সহিত বোলপুরের ফুটবল দলের তিনটি খেলা হইয়াছিল। অন্যান্য বারের মত তাহারা পরাজিত হইয়াছে।

* * *

এ বৎসর সুহৃদ কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম বর্গ জয়লাভ করিয়া কাপ পাইয়াছে।

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে আশ্রমের দলের সহিত কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের দুই দিন ফুটবল খেলা হয়। প্রথম দিন তাহারা দুই গোলে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় দিন এক-এক গোলে সমান সমান খেলা হইয়া ছিল।

* * *

গত বৎসরে আশ্রমের দল ক্যাম্বোর্ণ কাপ পাইয়া ছিল। এ বৎসর উক্ত কাপ প্রতি-যোগিতায় প্রথম খেলা হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দল হেতমপুর রাজকলেজের দলকে সাত গোলে পরাজিত করিয়াছে।

* * *

এবৎসর আশ্রমের ছাত্রদের মধ্যে খেলোয়াড় হিসাবে শ্রীমান নলিনী, নক্ষত্র ও নির্ম্মাল্যের নাম উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীবীরেন্দ্র সেন ধীরানন্দ বিশ্বনাথ ও সচ্চিদানন্দের (আলু) নাম ও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি আশ্রমের কাজে যোগ দিয়াছেন। ইনিও একজন ভালো খেলোয়াড়।

সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু মহাশয় সম্প্রতি বিশ্বভারতীয় অধ্যাপকরূপে এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁদের দুইজনকে পাইয়া আশ্রমের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

* * *

গ্রীষ্মাবকাশের পর মাদ্রাজের ডাক্তার জে, এইচ, কজিন্স আশ্রমে আসিয়া একমাস বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন ধারাবাহিক ভাবে এশিয়ার ভাবসম্মিলন ও ইংরাজী সাহিত্য

সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ইহার কাছে বিশ্বভারতী বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের সম্মিলনীর জন্য নিম্নলিখিতেরা কার্যকারক নিযুক্ত হইয়াছেন। সভা-সম্পাদক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীসুধীরকুমার খাস্তগীর। পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীসুকুমার দেউস্কর। ইহাদের উৎসাহে ও আয়োজনে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রাবণী নামে বর্ষার একটি সঙ্গীত উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

* * *

পূজনীয় আচার্য্যদেব ভিয়েনাতে গিয়াছিলেন। সেখানকার হৃৎ-রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার হৃৎ-যন্ত্রের কোনো বৈকল্য ঘটে নাই। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে আচার্য্যদেব, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী প্রতিমাদেবী মিউনিক ও প্যারীস হইয়া লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ঘোষ সমবায় পদ্ধতিতে বৃৎপত্তি লাভের জন্য রোম নগরে অবস্থান করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নূতন বই

পূরবী

নূতন কবিতার বই। "পূরবী", "পথিক" ও "সঞ্চিতা" এই তিন ভাগে মোট ৮৮টি কবিতা আছে। "পথিক" অংশের ৬১টি কবিতা ১৩৩১ সালে কবির বিদেশ ভ্রমণের সময় লেখা।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। উপহার দিবার উপযোগী। ডিমাই ৮ পেজি, ২৫৪ পৃষ্ঠা।

মূল্য—২৲ বাঁধাই—২॥০

এণ্টিক কাগজ—২৸০ ও ৩।০

গীতি-চর্চ্চা

সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত নূতন গানের বই। শান্তি-নিকেতন আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে ও অনুষ্ঠানাদিতে যে সকল গান গাওয়া হয়, সেই সব সংগ্রহ করিয়া ২০০ গান দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটি গান এবং বেদগানও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৬০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ৸০ ও ১৲ টাকা।

সঙ্কলন

কাব্য গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করা "চয়নিকা" অনেক দিন বাহির হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোন বই এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। এইবার গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করা হইল। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। পূর্ব্বে কোন বইতে প্রকাশিত হয় নাই এমন লেখাও আছে।

ডবল ক্রাউন প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য ১৸৴০ ও ২।০।

মায়ার খেলা

নূতন স্বরলিপির বই। মোট ৬১টি গানের স্বরলিপি আছে।

মূল্য—২৲ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 899.]

[৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।

শান্তিনিকেতন পত্র

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রতি সংখ্যা তিন আনা।]

[বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য তিন আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্য্যন্ত "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময়মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দর সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠা ৬৲, আধ পৃষ্ঠা ৩৷৹, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া জানিতে হয়।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৬। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

৭। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৮। পুরাতন বা নূতন গ্রাহকগণ মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার সময়ে কুপনে নাম ও ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

পোঃ শান্তিনিকেতন,
(বীরভূম)

শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডারের অংশীদারদিগকে তাঁহাদের তৃতীয় কিস্তির দেয় এক টাকা পরিশোধ করার জন্য পুনঃপুনঃ লেখা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা এখনও তাঁহাদের দেয় পরিশোধ করেন নাই, তাঁহাদের দেয় কিস্তি পরিশোধ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে। এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের দেয় অংশ পরিশোধ করিবেন না, তাঁহাদের অংশ কোম্পানিতে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং কোম্পানির Bye-Laws অনুসারে ইহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যতে আর কোন দাবি দাওয়া থাকিবে না। ইতি—

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়,
সম্পাদক।
শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৭ম বর্ষ } কার্ত্তিক, সন ১৩৩৩ সাল { ১০ সংখ্যা

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

আমাদের এখানকার এই প্রান্তরে যে প্রতিষ্ঠান দুইটি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং স্রোতের মত নিজের পথ কতকটা নিজেই করিয়া চলিয়াছে, তাহার ভিতরের কথাটি কি, সে আলোচনার আজ একটি বিশেষ সার্থকতা আছে ।

শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার ভিতর দিয়া আনন্দের ভিতর দিয়া ছেলেদের মন বিকশিত হোক্ জড়তা সংস্কার অভ্যাসের দাসত্ব ঘুচিয়া যাক, ভিতরের দিক হইতে জীবনে মুক্তি ফুটিয়া উঠুক, গত পাঁচশ বৎসর তাহারই ব্যবস্থা করিয়া পূজনীয় আচার্য্যদেব এখানে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন । তিনি যেদিন একথা বলিয়াছিলেন তখন ইয়োরোপে 'নব-বিদ্যালয়ের' কোনও সূচনা দেখা যায় নাই । এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের জীবনের একটি পূর্ণ আইডিয়াল হইবে, ইহাকে মানুষের সমগ্র জীবনের ক্ষেত্র করিয়া তুলিবেন, এখানে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা সাধক হইবেন, তপস্বী হইবেন, ছেলে-দের অধ্যাপনা সেই পরিপূর্ণ জীবন যাত্রার অঙ্গ হইবে—এই ছিল সেদিন তাঁহার আশা ।—পল্লী সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আজ অনেকের মুখে শোনা যায়—কিন্তু স্বদেশী ও সমাজ প্রবন্ধে, সর্ব্বপ্রথম যেদিন তিনি বলেন, গ্রামের মধ্যে যে সমাজ আছে তাহা আমাদের ভিত্তি, সেদিন তাঁহার প্রতি সমস্ত দেশের বিরুদ্ধতা ও ব্যঙ্গের আর শেষ ছিল না । দেশের নেতারা তখন রাষ্ট্র নৈতিক লড়াইকেই সব চেয়ে বড় বলিয়া জানিতেন ।

আমরা সকলেই জানি সেকালে যাঁহারা

চাকরি প্রভৃতিতে বিদেশে যাইতেন তাঁহারা দিল্লীতে গিয়া বড় বড় বাড়ি ফাঁদিতেন না, তাঁহাদের পরিবারবর্গ উৎসবে আনন্দে গ্রামকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। সম্বৎসরের পার্ব্বনে গ্রাম সজীব থাকিত, আহার্য্য ও পানীয়ের সেখানে অভাব ঘটিত না। আজ ম্যালেরিয়ায় সমস্ত উজাড় হইয়া যাইতেছে, গ্রামে বাস করা আর সম্ভবপর নহে।

বস্তুতঃ গ্রামই দেশকে খাওয়ায়। তাহা উজাড় হইয়া গেলে, সর্ব্বত্রই সমস্যা কঠিন হইয়া উঠে, বড় বড় সভ্যতা বিনষ্ট হয়। গ্রামের জীবন যাত্রাকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের সামাজিক প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। এ যদি শুকাইয়া যায়, তবে আমরা কিছুতেই বাঁচিব না। এই সহজ কথাটা বলিতে গিয়া তাঁহাকে সে দিন কত গালাগালি সহিতে হইয়াছিল, আজ তাহা কল্পনা করাও কঠিন। ছাত্রেরা অনেকে তখন দেশের জন্য কি করিবেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেন। তিনি তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বলিতেন, 'গ্রামকে জয় কর, তোমাদের বিশ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী চেষ্টায় এক একটি গ্রামের সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া দেখাও, ভারতবর্ষের কি করিয়া যথার্থ সেবা করা যায়—এই ছিল তাঁহার বাণী।—বলা বাহুল্য উত্তেজনার মত্ততা তাহাতে নাই। বাহবা নাই, হাততালি নাই, এমন কাজে সেদিন লোক জোটে নাই। সেদিন লোহার দরজায় ঘা দিয়াছেন, মনে হইয়াছে পারিবেন না—রুদ্ধ দরজায় মুষ্টির আঘাত করিয়া নিজেই রক্তাক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি হাতাশ্বাস হন নাই।

তাঁহার নিজের জমিদারীতে তিনি অন্ন বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামের সমস্যা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু কাহাকে দিয়া কাজ করাইবেন? আমাদের সকলের সমগ্র শিক্ষা পুঁথিগত বলিয়া, এখানেও বিশেষ কিছু গড়িয়া উঠিল না। গভর্ণমেণ্টের কৃষিতত্ত্ববিদ্‌দের দিয়া চাষ করাইলেন—অনেক বেশী খরচ করিয়া উৎপন্ন যাহা পাওয়া গেল তাহা চাষাদের শস্যের চেয়ে কম। কিন্তু তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি বাঁচিতে চাই, বড় হইতে চাই, তবে দেশের যাহারা মানুষ তাহাদের বড় করিতে হইবে। বাঁচাইতে হইবে—যেখানে তাহারা বসুধাকে আঁকড়াইয়া আছে, সেখানে ঐশ্বর্য্যের বাধা দূর করিয়া দিতে হইবে।

আমরা জমিদার, ডাক্তার, উকীল ডেপুটী অধ্যাপক কেহই কিছু উৎপন্ন করিতেছি না। বাংলাদেশে একজন মাত্র উৎপন্ন করিতেছে, সে চাষী—স্তরে স্তরে আমরা সকলে তাহাকে শোষণ করিতেছি—ইহাতে কি কল্যাণ আছে!

পৃথিবীর নানা স্থানে সমবায়ের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, জীবন যাত্রার দুঃখের একটি বড় সমাধান তাহার মধ্যে আছে, এই তথ্যটির প্রতি দেশের মনকে নানা ভাবে তিনি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই আশ্রম বিদ্যালয়ের সহিত আশপাশের গ্রামবাসীদের জীবনের যোগ কি করিয়া স্থাপন করা যায়, কি করিলে চাষীদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায়, বরাবরই ইহা তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদের এই কথাই বলিয়াছেন—ক্লাসের নোট লইয়া টাকা

উপার্জ্জন করার জন্য দুর্লভ মানব জন্ম নয়, দেশের চিন্তনীয় যাহা আছে তাহা তাহাদের ভাবিতে হইবে, করণীয় যাহা আছে তাহা করিতে হইবে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষাকে তাহারা নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। —শ্রীনিকেতনের পত্তন করা হইল এখানকার জমি জল লোকবল সবই প্রতিকূল দেখিয়াও তিনি এইখানেই এই মনে করিয়া কাজ সুরু করিয়া দিলেন যে যদি এই সকল বাধা অতিক্রম করা যায়, তবে সমস্ত দেশের মনে গভীরভাবে আশা হইবে—আমরাও বাঁচিতে পারি; ইহাও সম্ভবপর। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে না মিলিতে পারে, কিন্তু যেখানে পেটের দায় আছে, সাংসারিক সুখ দুঃখের ক্ষেত্রে তাহারা মিলিবে।—মিলনের দ্বারা পরস্পরের সহায়তায়, তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, খাইবার পরিবার দুঃখ ঘুচিয়াছে, স্বাস্থ্যের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই মাটির ভিত্তি সব মিলনের প্রশস্ত স্থান। দারিদ্র্যের উৎকণ্ঠায়, নৈরাশ্যে যাহারা পীড়িত, জীবিকার সংগ্রামে চিরকাল যে পরাভূত সেও সেও তখন নূতন আনন্দে বাঁচিয়া উঠিবে। বিজ্ঞানের যে শিক্ষা তাহা ত আছেই, চতুর্দ্দিকের গ্রামের লোকের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া উঠিবে, দেশের পক্ষে সেও একটি অমূল্য সম্পদ হইবে। যাঁহারা বিশেষভাবে কোনও বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আশ্রম তাঁহাদের আশ্রয় দিবে, তাঁহারা লাইব্রেরী ল্যাবোরেটারির সুবিধা এখানে পাইবেন। ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চারি পাশে আসিয়া জড় হইবে—মধ্যযুগে ইয়োরোপে যেমন করিয়া ইউনিভার্সিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এখানেও তাহা সেই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা এখানে আকৃষ্ট হইয়া আসিবে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই আশা এবং কামনার উপর শ্রীনিকেতনের ভিত্তি। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের যোগে একটি সমগ্রতাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। মানুষের দুইটি দিক আছে—একটি জীবিকার অন্যটি উচ্চতর জীবন যাত্রার। এখানে আমরা বৃহৎভাবে ব্যাপক ভাবে সহযোগিতা মূলক কৃষির চেষ্টা করিব, তাহার লাভ কাহারও একলার নহে;—গভীরভাবে কূপ খনন করাইয়াই হোক, বাঁধ বাঁধিয়াই হোক, এখানকার জলাভাবের সমস্যা আমরা সমাধান করিব, আমাদের প্রয়াস গ্রামের মধ্যে ব্যাপ্ত করিব, আমাদের এখানকার ছাপাখানা, কারখানা, সমবায় ভাণ্ডার, টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে আশ্রয় দিবে। এখানকার মিউজিয়ম, এখানকার কলাভবন, মানুষের চিত্তকে জাগ্রত করিয়া রাখিবে। এই আয়োজনের মধ্যে আমাদের শিশুরা বাড়িয়া উঠিবে। তাহারা মাটি খুঁড়িবে লোহা পিটিবে—এবং বড় যে জীবন, জীবনে তাহাকে গ্রহণ করিবে, তাহারও সাধন করিবে। এমনি করিয়া ইহার আর্থিক পরমার্থিক দুই দিক বড় হইয়া উঠিবে।

একটি মহা প্রাণের সাধনা সব বাধা সব আবর্জ্জনাকে দূর করিয়া এই উদ্যোগের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম

শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, এম, এ।

জ্ঞানপন্থী নিউটন বলিয়াছিলেন অনন্তের উপকূলে তিনি শুধু উপলখণ্ড কুড়াইতেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।" উপলখণ্ড হয়ত কালের আঘাত সহিতে অধিক সক্ষম। কবি বলেন,—তাহা হউক—

"সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়।"

কারণ, সে ফুল আপনার সৌরভের সঙ্গে,

"মনে আনে রবিকর নিমেষ স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস,
* * *
বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশ।"

ভাবসম্পদের বিচিত্রতাই এই কাব্য কুসুমের সৌরভ। এই সৌরভ হইতেই আমরা কুসুমের বিশিষ্টতা চিনিতে পারি—কবি কীট্‌স্ যেমন অন্ধকার বনভূমিতে শুধু গন্ধ দিয়া ফুল চিনিতে পারিয়াছিলেন। এক একটী ফুল জীবনের বৈচিত্র্যের এক একটী প্রকাশ। মানব জীবনের যত কিছু গভীর সুন্দর, শাশ্বত সনাতন সত্য আছে—এই সব বিপুল বিরাট অনুভূতি কবি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের মত মালা গাঁথিয়া মানবকেই উপহার দেন। কবির কাজই তাই। তিনি নিজে তাহা খুবই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; তাই গাহিয়াছেন:—

"কান্নাহাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে সারা জীবন বইব গানের ডালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা?"

তাই বিশ্ব কবির মালাগুলির এক একটী ফুলের সৌরভের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের সকলে পরিচিত অনুভূতির অভিজ্ঞতা পাই।

কাব্য মাত্রেরই প্রধান বিষয় সাধারণতঃ হয় প্রেম। সকল কবিই অল্প বিস্তর প্রেমের কবি। রবীন্দ্রনাথে আমরা তাহার ব্যতিক্রম ত দেখি না, বরং দেখি কবি মানব জীবনের এই চিরন্তন অনুভূতির নব নব বিকাশ ফুটাইয়া তুলিয়া, নরনারীর হৃদয় পদ্মের কোমলতম কোরকটুকুও আঁকিয়া কাব্য পিপাসুকে মুগ্ধ করেন।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" "প্রভাত সঙ্গীত" প্রভৃতি কবির অল্প বয়সের রচনাগুলিতে প্রেমমূলক গভীর বা সুন্দর কবিতার অভাব নাই। তবে সেগুলি মামুলি প্রথামত ভঙ্গীতে রচিত। মিলন বিরহ প্রভৃতি প্রেমের সকল অঙ্গই আছে। কিন্তু সেগুলি আর সব কবির কাব্যে যেমন ভাবে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে পাই। কবির বিশিষ্টতার ছাপ তাহাতে তখনও পড়ে নাই পড়িবার কথাও নয়, কারণ, কবি তখন তরুণ, তাঁহার কাব্য "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। "গান" নামক সঙ্গীত পুস্তকেও এই সময়ের রচিত অনেক লোকপ্রিয় প্রেম সঙ্গীত ঐ মামুলিভাব ও বর্ণনাতে রচিত। যথা,—

"ওগো, রেখে দে সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা,
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়ে,
জীবনের সুখ নাশা।"

* * *

"ওগো, কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাই যে,
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।"

* * *

"ওগো, এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরি।"

ইত্যাদি।

"ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল" প্রভৃতিতে এইরূপ কবিতা অনেক পাওয়া যায়। কবিত্ব হিসাবে, ভাষার লালিত্যে, ভাবের মাধুর্য্যে ইহাদের স্থান উচ্চেই কিন্তু এ সকলই প্রেমের বহির্ম্মুখী বিকাশ সম্বন্ধীয়। অন্তরের যে প্রেম বন্ধনে, বহির্ম্মুখী বিকাশকে তুচ্ছ করিয়া, প্রাণের অনুভূতির গভীরতায়, নরনারীর হৃদয়, জলে বুদ্বুদের মত অখণ্ড আনন্দে মিশিয়া যায়, সে অনুভূতি কবির এখনকার কবিতায় অধিক পাই না। "ভানুসিংহের পদাবলী" সাধারণ প্রেম মূলক কাব্য হিসাবে প্রশংসিত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কবিতার ভাবগাম্ভীর্য্যের তুলনায় দাঁড়ায় না।

কিন্তু কবির কাব্য জীবনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কখন অজ্ঞাতসারে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুকুলপ্লাবী, নৃত্যপাগল, উজ্জ্বল সঙ্গীতস্রোত বহিয়া আসিতেছে, সে সঙ্গীত ক্রমশই উদার গম্ভীর সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। তাই "কড়ি ও কোমলের" শেষ অথবা মাঝামাঝি হইতে প্রেমমূলক কবিতা সম্বন্ধে একটু নূতন সুর পাই। কবির কাব্য নির্ঝর গতি বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গতানুগতিক ভাব নিবন্ধ আর একসুরে বাজে না। সেই চির পুরাতন সুরে কবি নিজস্ব মূর্চ্ছনা মীড় জুড়িয়া আপনার বিশিষ্ট ছাপ দিয়া দিতেছেন। "পূর্ণ মিলন", "পবিত্র প্রেম", "অঞ্চলের বাতাস"—"তনু" ইত্যাদিতে আমরা এই নূতন সুর পাই। এই সব কবিতাগুলিতে প্রেমের বাস্তব অথবা দৈহিক দিকই পরিস্ফুট। অন্তত বাহিরের আকার (form) টুকু তাহাই। কবি সংস্কৃত কবিগণের সনাতন কাব্যরচনার নিয়মটুকু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন একভাবে প্রেমকাব্যের বিচিত্রতা সাধন করিয়াছেন। অন্তরের গভীরতা, পবিত্রতা, মধুরতা, নিছক বাস্তবের রূঢ়তার উপর কামনাহীন অকলুষ স্বর্গীয় মায়া মাখাইয়া দিয়াছেন।

"জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার?

* * *

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,

* * *

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।"

"পূর্ণ মিলন" প্রভৃতিতে অন্তর ও বাহিরের নিবিড় মিলনের আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। জীবনের গভীরতা, বিরাট সত্বা, ধীরে ধীরে প্রেমস্বপ্নের মাঝেও ভাবমুগ্ধ চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে। তাই প্রণয়ী ডাকিয়া বলিতেছে—

"এস ছেড়ে এস সখি, কুসুম-শয়ন।

* * *

হাসি কান্না ভাগ করি, ধরি হাতে হাত,
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

উপরে উদ্ধৃত কবিতার তৃতীয় ছত্র হইতে আমরা স্বকীয়া প্রেমের প্রকাশের সূচনা পাই। এতদিন যত কিছু প্রেমমূলক কবিতা পাই, সবই সনাতন প্রথামত পরকীয়া প্রেমকে বিষয়ীভূত করিয়া রচিত। এই কবিতায় প্রথম দেখি, কবি পরকীয়া প্রেমকে "সুখরৌদ্র মরীচিকা" বলিতেছেন। তাহার চেয়ে হাতে হাত ধরিয়া "সংসার সংশয় রাত্রি" যাপন শ্রেয়ঃ।

এই স্থলে "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিলে বোধ হয় অবান্তর হইবে না। সেখানে আমরা এই ভাবটীর পূর্ণ পরিণত সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাই। এক সময়ে সামান্য নারীরূপে অর্জ্জুনের আরাধনা করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া বর্ষকাল অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী নারীরূপে থাকিবার বর প্রার্থনা করিয়া লইলেন। কিন্তু এই বর্ষকালে প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে চিত্রাঙ্গদার রমণীহৃদয়ে প্রেম জাগিয়াছে। তাই শেষ রজনীতে চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রত্যাখ্যানের কথা বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন,—

"প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি। সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। * * *
সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবি নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী!
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি দাও অনুমতি
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!"

প্রেমের সার্থকতা শুধু জ্যোৎস্নালোকে কুসুম আসনে তরুণ তরুণীর মিলন-লীলায় নহে। সে ত "দুদণ্ডের জীবনের অকলঙ্ক শোভা!" সে ত থাকে না দুর্দ্দিনের ঝড়ে টিঁকিয়া থাকে না। তাই চিত্রাঙ্গদার সুললিত লাবণ্য শোভা বর্ষকাল মাত্র রহিল। কিন্তু যাহা রহিল তাহা, "অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়।" দুর্দ্দিনে সহচরীরূপে, জীবনে সহধর্ম্মিণীরূপে, সন্তানের সুমাতারূপে এই প্রেমিকা রমণীহৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় মেলে—প্রেমের বাসন্তী মধুমিলনক্ষণে নহে। তাই অর্জ্জুন কহিলেন, "প্রিয়ে, ধন্য আমি আজ।"

কবির চিত্তের এই গভীরতা, পূর্ণ প্রণতি

এখনও আমরা পাই না। ইহার আভাসটুকু মাত্র "কড়ি কোমলের" মরীচিকাতে পাই।

সাধারণতঃ কাব্যে যে প্রেম আমরা পাই, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে তাহা পরকীয়া প্রেম লইয়াই রচিত। স্বকীয়া প্রেমে না কি পরকীয়া মধুরতা নাই। বৈষ্ণবরস তত্ত্বে আমরা তাহাই পাই। মানব জীবনের ধর্ম্মই, অপ্রাপ্য অখণ্ড পূর্ণতার সন্ধানে অনন্তকাল তৃষাতুর হইয়া ছুটিয়া বেড়ান। কোথাও সে পূর্ণতার খণ্ডবিকাশ জ্ঞানস্বরূপে, কোথাও শিবস্বরূপে, কোথাও সুন্দরস্বরূপে, কোথাও আনন্দ বা প্রেমস্বরূপে। এ সকলই পূর্ণ সত্য স্বরূপের আংশিক বিকাশ মাত্র। মানব আপন সহজাত ধর্ম্ম অনুযায়ী প্রকৃতি বিশেষের বশে, পূর্ণতার এই খণ্ড খণ্ড বিকাশ মুঠির আয়ত্ত করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায়। পাশ্চাত্য কবি Browning এ এই সত্যের বড় সুন্দর প্রতিধ্বনি পাই :—

"It is but to keep the nerves at a
strain,
To dry one's eyes and laugh at
a fall,
And baffled get up and begin
again,
So the chance takes up ones life,
that's all."

এ সন্ধানেই জীবনের গঠন হয়। এই সন্ধানই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। সে যে রূপেই হোক। কারণ, পূর্ণতাই ব্রহ্ম ;—আমাদের উপনিষদ এই উপদেশই আমাদের দেন। এই যে সন্ধান ইহার শেষ নাই। শেষ হলেই, মুঠির ভিতর আসিলেই ত ফুরাইয়া যায়। প্রাণের গুহায় ইহার আদি অব্যক্তে, অন্তও অব্যক্তে! "From the great deep to the great deep it goes."—"Deep, calling unto deep." তাই আমাদের সকল সন্ধান, জ্ঞানেই হোক, প্রেমেই হোক, অব্যক্তে মিশায়। বৈষ্ণব-কবি আনন্দরূপী, রসরূপী ভগবানের সন্ধান তত্ত্ব, প্রেমরূপী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, রূপকচ্ছলে দিয়া, এই অব্যক্তের স্বরূপ পরকীয়া প্রেমে দিয়াছেন। বুঝিবার দোষে সেই মধুর রস-তত্ত্বের ব্যভিচার হয়। তাই বৈষ্ণব কবির অদৃষ্টে নীতিবাগীশের গালি জুটে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে ন্যায্য সম্মান দিয়াছেন। তিনি মানব হৃদয়ের স্বধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

"আর পাব কোথা?—
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"

কিন্তু প্রেমের এ গভীর তত্ত্ব, কবির অনুভূতিতে প্রথম জীবনে আসে নাই। প্রথাগত হিসাবে, পরকীয়া প্রেম বিষয়ীভূত করিয়া কতকগুলি মধুর সঙ্গীত বা কবিতা রচনা করিয়াছেন মাত্র।

ক্রমে এই প্রথাগত শ্রুতিমধুর ছন্দে পরকীয়া প্রেমচর্চ্চা কবি ঠিক মনের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না। লৌকিক, সামাজিক, ভীতি জাগিতেছে। কারণ এতদিন অবধি এই প্রেমকে নরনারীর হৃদয় নিমিত্ত করিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনেচ্ছা বলিয়া না চিনিয়া সাবিকার বহির্মুখীন প্রেম সম্বন্ধ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই ইহার কুসুম-শয্যা ছাড়িয়া "সংসার সংশয়রাত্রি" কে বরণ করিয়া লইলেন। কুঞ্জবনের কুসুম শয়নের প্রিয়া কর্ম্মজীবনে ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রেয়সী হইলেন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই কাব্যে বা উপন্যাসে প্রেমের এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ হয়। যতক্ষণ নিছক পরকীয়া থাকে, ততক্ষণই সাধারণতঃ কবি বা ঔপন্যাসিকের কল্পনা প্রেম চর্চ্চায় মাতিয়া থাকে। বিবাহ মন্ত্রপাঠ ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণতঃ "মদন-ভস্ম" হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। "মানসী"তে যতগুলি প্রেম কবিতা পাই, অধিকাংশই এমন প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত, যাহার হাতে হাত ধরিয়া কবি "সংসার সংশয়রাত্রি" নির্ভয়ে যাপন করেন। "হৃদয়ের ধনে"--দেখি কবি বহির্ম্মুখী প্রেম সম্বন্ধের নিস্ফলতা বুঝিয়া বলিতেছেন —"হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?" তারপর "নিভৃত আশ্রমে" দেখি কবি বলিতেছেন—

"অনুপম জ্যোতিস্ময়ী মাধুরী মূরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে,
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
* * *
ভ্রমর যেমন থাকে কমল শয়নে,
* * *
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয় মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথীসনে।"

কবির এই নিজের ভাষা অপেক্ষা আরও সুন্দর স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মানসিক গতিনির্ণয় করা যায় না। আমরা বেশ বুঝি বাহির ছাড়িয়া আত্মা কেমন আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতেছে। আর তাহার সহিত লোকালয়ে, কর্ম্মজীবনে, প্রেম সম্বন্ধের পবিত্র সত্বার একটী আভাস পাওয়া যায়। অন্তর ও বাহির মিশিয়া "তপোবন" রচিত হইতেছে।

ইহার পরে "মানসী"র সব প্রেম কবিতাগুলিই এই লোকালয়ের আবেষ্টনের ভাব লইয়া রচিত। মানব হৃদয়ের সকল সহজ সুকুমার ভাব মাধুর্য্যে কবিতাগুলির পরিকল্পনা পুষ্ট। "বিচ্ছেদ," "শ্রান্তি," "মানসিক অভিসার," "পত্রের প্রত্যাশা," শূন্য গৃহে, প্রত্যেকটী মধুর। পত্রের প্রত্যাশার কয়ছত্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকা যায় না—

"দিবা যেন আলোহীনা, এই দুটী কথা বিনা
তুমি ভাল আছ কিনা, আমি ভাল আছি,
স্নেহ যেন নাম ডেকে, কাছে এসে যায় দেখে
দুটী কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।"

"শূন্য গৃহের" কয়েক ছত্রে মৃতা প্রেয়সী বা পত্নীর স্মৃতি বিজড়িত গৃহের বিপুল শূন্যতা বড় করুণ।—

"আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ নাই চাঁদমুখ,
শূন্য পড়ে আছে সেই, নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নাই জীবনের সুখ।"

"পুরুষের উক্তি," "নারীর উক্তি," "গুপ্তপ্রেম," "ব্যক্ত প্রেম"– এই কবিতা কয়টীর প্রথমটা দ্বিতীয়টার উত্তর, আর তৃতীয়, চতুর্থ একটী অপরটার অংশ। শেষ দুইটী পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধীয় হইলেও সংযত। প্রথম দুইটাতে অতি সুন্দর ভাবে জটিল মনস্তত্বের বিশ্লেষণ হইয়াছে।

"মানসী"তে আর কয়টী প্রেমের কবিতা পাই। একই চিরন্তন অনুভূতিকে কবি নব নব রূপে বিকাশ করিয়া দিতেছেন। "পূর্ব্বকালে" কবি বলিতেছেন,—

প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসিয়াছে
এতদিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক,

তবু তুমি ভবে চির গৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভালো কি বাসিতে পারে ?

ইহা মুগ্ধ মানব চিত্তের সনাতন অর্থহীন অথচ পরম সত্য মধুর প্রলাপ। এমন সরস সুন্দর সহজ প্রকাশ আর ত কোথাও দেখি না। "অনন্ত প্রেমে" এই একই কথা পাই—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ।"

কবির হৃদয়ের সমস্ত ভাব গম্ভীর উচ্ছ্বাস "মেঘদূতে" উথলিয়া উঠিয়াছে। "মানসী"র শেষ দিকের কবিতাগুলির সুর ক্রমশঃ গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের উদ্বেলিত ভাব স্রোতে কাব্য পিপাসুর মন আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রিত আকাশের মত পরিপূর্ণ হইয়া যায়। "বিদায়," "সন্ধ্যা," "শেষ উপহার," "মৌনভাব" অতি গম্ভীর, সংযত অথচ হৃদয়ের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস। "আমার সুখে"—নূতন ভাবে প্রেমের কবিতার নূতন রূপ পাই। এই কবিতাগুলির ভিতর কোনো লঘু চঞ্চলতা নাই—আছে গভীর বেদনা ও গভীর প্রেম।

"তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমা রেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ, এ বাতাস দিতে পার ভরে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
এক বার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা।"

অনন্ত পরিপূর্ণ আনন্দরূপী প্রেম স্বরূপ আর কেমন করিয়া সান্ত মানবের চোখে ধরা দিতে পারেন ? এই ত প্রেমরূপী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এখানেই ত Absolute love এর পরিণতি। মানুষ যখন এমনি অসীমভাবে ভালবাসে, তখন ভগবান ত দূরে থাকেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ একটী গানে সাধক ও প্রেমিককে একই স্থান দিয়াছেন—

"কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস,
ওগো সাধক, ওগো পথিক, ওগো প্রেমিক,
তুমি ধরায় আস।
এই অকুল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে
বীণা ঝঙ্কারে

ইহা ত লঘু চঞ্চল মায়াময় তরুণ তরুণীর মোহ মুগ্ধ মিলন নহে। ইহা আত্মায় আত্মায় নিবিড় গভীর মহা মিলনের সুরে অসীমের রাগিনীর আলাপ। এ প্রেম সংসারের অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী। তাই সাধক ও প্রেমিকের স্থান পাশাপাশি। একজন "দেবতাকে প্রিয়" করেন, অপর জন "প্রিয়রে দেবতা" করেন। আমরা ভয় পাই, ভাবি দেবতার আসনের বুঝি অপমান হইবে। কিন্তু সত্যকার প্রাণের ঠাকুর আমাদের ভয় দেখিয়া হাসেন—আমাদের অজ্ঞতায় স্নেহ মাখা করুণার দৃষ্টিপাত করেন। তিনি জানেন, তিনিই প্রিয়রূপে দেবতা ও দেবতা রূপে প্রিয়। তাই শাস্ত্রের

বিরাজিছে, শেলীর এপিসাইকিডিয়ন্‌ এত গভীর, এত পবিত্র, এত মধুর, এত অপার্থিব।

"মানসীর" পর হইতে ক্রমশঃ অনুভব হয়, কবি চিত্তের গভীরতা ও প্রসার উভয়ই বাড়িতেছে। "সোনার তরী" কবির কাব্য কাননের অতি সুন্দর ফুল। জীবনের বিরাট বৈচিত্র্য অরণ্যের চঞ্চলতার নৃত্যকে গুরু গম্ভীর ছন্দ দান করিতেছে। গভীর ভাব, গভীর ভাষায় প্রকাশিত। রোমান্স ও দর্শনের বড় সুন্দর মিলন নাই। "দেউল" কবিতায় পাই, কবি আপন মনে স্বরচিত দেউলে দেবতা বসাইয়া আপনার পূজা অর্চনায় মাতিয়া ছিলেন। আপন "সৃষ্টি ছাড়া সৃজনের" মাঝে আপনি বসিয়া আছেন।

"ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে,
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
চিত্ত মোর নিমেষ হত
ঊর্দ্ধমুখী শিখ'র মত,
শরীর খানি মূর্চ্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ,
এমান করে গিয়েছে কত দিন।

তখন দেবতা জাগিয়া উঠিলেন—

"একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে
পাষাণ রাশি টুটিয়া, তখন
"সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি।

"দেবতা পানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমা রাশি
ললাটে তার উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদ হাসি
অধর চারিধার।"

সেই "প্রসাদ-হাসি"র আভায়

"সরমে দীপ মলিন একেবারে।"

বেদনা আসিয়া বজ্ররবে যখন জীবনের জাগরণ আনিয়া দিল, তখন আত্মা অপনার মহিমায় আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এতদিন কবি যেন ক্রোড়ের বীণাটিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। রুনুঝুনু সুরটুকু মধুর লাগিতেছিল সত্য, এইবার আত্মস্থ চিত্ত নিজের সুর বুঝিয়া লইলেন।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে
আমার দীপ জ্বালিল রবি।
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ হারে—
কি গান আজি উঠিল চারিধারে।"

জীবন স্রোতে সুরে সুর মিলাইয়া চিত্ত তখন "বিশ্বনৃত্যে"র সঘন আনন্দে মগ্ন।—

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক্‌ বিশ্ব বাজনা
উঠুক্‌ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ
নব সঙ্গীত নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাক্‌ নবীন বাসনা।"—

কবির এই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। পরবর্তী সমস্ত কাব্যই এক নূতন আলোকে মণ্ডিত। তাঁহার প্রেমের কবিতাও এই নূতন আলোক সম্পাতে নবভাবে বিকশিত হইয়াছে। "দুর্ব্বোধ" কবিতাতে কবির হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসহীন, অনুদ্বেল, অতলস্পর্শ অনুভূতি পাই।—

"তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন করে'
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।"

ক্ষুদ্র, সসীম কোনো কিছুর সহিত প্রেমিক আপনার গভীর অনুভূতির তুলনা পান না। এ সমুদ্রের চেয়েও বড়।

"এ যদি হইত শুধু মণি,
পরাতেম গলায় তোমার,
"এ যদি হইত শুধু ফুল,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।
এ যদি হইত শুধু সুখ,
মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয় বারতা
এ যদি হইত শুধু দুখ
নীরবে প্রকাশ হত কথা"

কিন্তু

"এ যে সখি সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল কোথা কূল
দিক হ'য়ে যায় ভুল
অন্তহীন রহস্য নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী
এ তবু তোমার রাজধানী।

কাব্যে এ রকম অভিনব পরিপূর্ণ প্রেম-নিবেদন আর কোথাও পাই বলিয়া মনে পড়ে না। কোনো চঞ্চলতা নাই, কোনো উচ্ছ্বাস নাই, কোনো লীলা বা বিকার নাই!

"এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম,
সুখ দুঃখ বেদনার
আদি অন্ত নাহি যার
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম।"
"নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ কর রাত্রি দিন ধরে'।
বুঝা যায় আধ প্রেম আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন।

"মানসীর" শেষে "আমার সুখ" কবিতায় পূর্ণতর অভিব্যক্তি পাই। এই ভাব গাম্ভীর্য্য পরবর্ত্তী কবিতাগুলির সর্ব্বত্র পাই। "সোনার তরীর" "ঝুলন" কবিতায় নূতন ভাবে নূতনরূপে আত্মার সহিত পরমাত্মার ঝুলন-লীলা দেখি।

"বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল।
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিল্লোল।
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল।
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল,
বাজে কঙ্কন, বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল
দে দোল্ দোল্।

* * *

আয় রে ঝঞ্ঝা পরাণ বধুর
আবরণ খানি করিয়া দে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্
দে দোল্ দোল্।
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখী আজ,
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ

বৈষ্ণব কবির ঝুলন লীলা অবলম্বনে কবি কেমন নূতন এক সৃষ্টি করিলেন। কবির দৃষ্টি বাস্তবের সীমার পরপারের আলোক রেখা দেখিয়াছেন—রসরূপী পূর্ণতার আলোক। আত্মা আপনার "পরাণ-বধু"কে চিনিয়া লইতেছে! লৌকিক নর নারীর প্রেমলীলা কেন্দ্র করিয়া কবির চিত্ত আত্মা ও পরমাত্মার মহামিলনলীলায় প্রসারিত হইতেছে। "চিত্রা," "কল্পনা," "চৈতালি" সর্ব্বত্র দেখি, ভাষার সৌন্দর্য্যে, ছন্দের নব নব ঝঙ্কারে কবি চিত্তের উন্মেষিত নব প্রেমানুভূতি নূতন করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। "অন্তর্যামী"তে বড় সুন্দর ভাবে এই নূতন প্রেম কবিতার পরিচয় পাই। সবটুকু তুলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

"তবে তাই হোক্ দেবি, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে, নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নবরূপে ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
এবারের মত পূরিয়া পরাণ,
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান,
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।"

এই বেদনার আঘাতেই নূতন প্রেমসঙ্গীতের মীড়গুলি মর্ম্মের অন্তস্থল গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। "দেউলে" এই বেদনাই বজ্রের আঘাতে কবির একাকী নির্জ্জন সৃষ্টি ছাড়া সাধনার মন্দির ভাঙ্গিয়া বিশ্বের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। নরলোকের প্রিয়া, কবির মানসী ও সাধকের সাধন ধন মিশাইয়া এক হইয়া যাইতেছে। প্রেমের কবিতার এই নূতন পরিণতির মাঝে মাঝে সাবেক মামুলী ভাবের প্রেম সঙ্গীত অল্প দুই একটা আছে। সঙ্গীত হিসাবে ও ভাবের মধুরতায় এগুলি প্রশংসার্হ। যথা "সঙ্কোচ," "প্রার্থী," "সকরুণা" প্রভৃতি। এগুলি পূর্ব্বের প্রেম-সঙ্গীত অপেক্ষা শিল্পগুণে অধিক আদরণীয়। কিন্তু এই সময়কার গানগুলির মধ্যে ইহাদের স্থান ঠিক নহে। "কল্পনার," "অশেষ," "ঝড়ের দিনে"র সহিত ইহাদের সুর মেলে না।

এই নব প্রেমানুভূতির প্রতিটী নিমেষ কবির কাছে মহামূল্য, কারণ জীবনের গঠন, পূর্ণতা যে এই নিমেষগুলির মধ্যেই ঘটিতেছে। "ক্ষণিকা"তে এই মুহূর্ত্তগুলি অমর করিয়া রাখার সুন্দর প্রয়াস পাই। ইহার একটী কবিতাও "সোনার তরী"র "দুর্ব্বোধ বা "ঝুলনের" মত পূর্ণ মিলনের গান নহে। "মানসীতে" একস্থানে পাই—

"মহাসুন্দর একটী নিমেষ
ফুটেছে কানন শেষে,

আমি তারি পানে ধাই ছিঁড়ে নিতে চাই
ব্যাকুল বাসনা সঙ্গীত গাই
অসীম কালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।"

এই কবিতাটী হইতে "ক্ষণিকার" অর্থবোধ হয়।—

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান, গারে আজি প্রাণ।

"ক্ষণিকা"কে অনেক ওমর খৈয়ামের সহিত অভিন্ন করিয়া বলেন, উহা জীবনের গভীরতা, শাশ্বত সত্য বা শান্তির সন্ধান দিতে পারে না, অশান্তিই আনে। হইতে পারে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, কবির দৃষ্টি গভীরেই আছে। প্রতি নিমেষের মধুরতা-গুলি গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা করিয়া কবির পরিতে সাধ। ছোট ছোট নিমেষগুলিই ত সেই মালা গাঁথিয়াছে। তাঁহার "লিপিকা" যেন গদ্যে এই "ক্ষণিকার" আবৃত্তি। অল্প কথায় দুই একটী অস্ফুট রেখাপাতে অনন্তের একটী নিমেষ ছোট করিয়া ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছোট কিন্তু অনন্তেরই ত অংশ। মনে পড়ে--

"তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে"

কারণ কুসুম,

"মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস
বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশ।"

"ক্ষণিকার" প্রেমের কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাবগুলি গূঢ় ও উপভোগ্য। কিন্তু বাহিরের আকার ছোট ছোট, সুন্দর, মধুর।

"একটু হাসি, একটু সরম,
দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়,
নিতান্তই এ সোজাসুজি।"

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটী বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।
আমি শুনি শুয়ে
বিজন বালুভুঁয়ে,
তুমি শোন্ কাঁখের কলস
ঘটের পরে থুয়ে।
তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

"ক্ষণিকা"তে কবির বিচিত্র ভাবানুভূতির একটী সলীলস্পন্দন পাই। নিমেষগুলি যে থাকে না, ফুরায়, যতই সুন্দর বা মধুর হউক—এই বেদনা টুকু যেন মাথান। কোথাও বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া অশ্রুর উপর হাসি টানিয়া স্ফূর্ত্তির চেষ্টা পাই। ব্যথাটুকু যেন তাহাতে ঘন হইয়া উঠে। কোথাও পাই, এক অজানা ভীতি—কোথায় কোন অজ্ঞাত অনন্ত পারাবারে এই নিমেষ গুলি টানিয়া লইয়া যাইতেছে। "অতিথি"তে এই ভাবটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। যত শেষের দিকে যাই, বেদনা তত মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, হাসিবার প্রয়াসে বা বাক্‌চাতুরীতে আর ঢাকা থাকে না।

"বলিনে ত কারে সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম সাজেতে।

যাহা মুখে আসে, গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলে চাই,
তোমাপানে চাই স্বপনে।”

“অন্তরতম”র এই কয় ছত্রে কবির সকল কথা প্রকাশ হইয়া, “ছদ্মসাজ” খসিয়া যায়।

“নৈবেদ্যের” গঙ্গোত্রীর গৈরিকধারা স্নাত চিত্তে রচিত পরবর্ত্তী প্রেম কবিতা গুলি এক অপূর্ব্ব পুণ্যালোকে মণ্ডিত হইয়াছে। অনেকে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিতেছেন। হয়ত তাহাই। কিন্তু অসীমের প্রেম ত সসীম ছাড়া নহে। সীমার লীলাই অসীমের বক্ষের স্পন্দন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা লৌকিক নরনারী মিলনগণ্ডী অতিক্রম না করিয়াই এক অপূর্ব্ব গভীরতা ও প্রসাদগুণ লাভ করিয়াছে। আর, এইযে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমলীলা, ইহা ত কঠোর নীরস দার্শনিক ভাবে প্রণোদিত নহে। অতিমধুর সনাতন, চির পুরাতন হৃদয়ানুভূতির উপর একটা বিশেষ বৈচিত্র্য সাধন করা হইয়াছে। ইহা কবির উদ্ভাবিত বা স্বকপোল কল্পিত নহে। এই প্রেম সম্বন্ধ উপনিষদের কবি ও অনুভব করিয়াছিলেন। একটা পাখী অমৃত ফল খায়, আর এক দেখে ও আনন্দ পায়। পক্ষীজীবনের এই প্রণয়ের রূপকে উপনিষদের ভাবমুগ্ধ কবি, আত্মা ও পরমাত্মার মিলন লীলা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের লীলায় নরনারীর হৃদয়ের বিচিত্রতার মাঝে একই জিনিষ ফুটাইয়াছেন। “খেয়া”, “গীতাঞ্জলি”, “গীতিমাল্য”, “গীতালি”, এ সকল কাব্যের কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম—কিন্তু সে মানবমানবীর মিলনে নহে। জগতের মাঝখানে যে দুইটী মাত্র পরম প্রণয়ী বাস করে, যাহাদের মাঝখানে তৃতীয় কেহই নাই।—সেই যে দুইটী মাত্র বিরহী আত্মা একজন, আর একজনের জন্য কাঁদিয়া নিত্য নবমেঘদূত রচনা করে,—জীব ও ব্রহ্মের সেই মিলন লীলাই এই প্রেমকবিতার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এইখানে সাধক ও প্রেমিককে শুধু সমান করেন নাই, অভিন্ন করিয়াছেন।

এই যুগের দুইটী গানে কবির মনের অবস্থার সন্ধান পাই। সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী-হৃদয়ে আসিতে উন্মুখ কিন্তু হৃদয়ের কমলাসন ত এখনো বিকশিত হয় নাই কমলাসনার আসন কৈ?—

“লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি গো ঠাঁই?
চেয়ে দেখ আপন পানে
পদ্মটী নাই পদ্মটী নাই!”

বাতাস “ম্লান হতাশ” হইয়া কাঁদিয়া ফিরে; আকাশ সজল আঁখি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। তখন হঠাৎ অনুভূতি আসিল—এই ত পদ্মাসন মেলিয়াছে।—কই চের ত পাই নাই।

“যে দিন ফুটল কমল, কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে,
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে যে রইল সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,
স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ ছোটে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে।

কবি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—

"কে জানিত দূরে ত নেই সে —
আমারি গো, আমারি সেই যে,—
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে—
আমার হৃদয় উপবনে।"

এই কমলের মাধুরীতে সমস্ত পরবর্ত্তী কবিতা সুবাসিত। কোথাও প্রেমের কণ্ঠের এই পদ্মমালা "ভীষণ তরবারী" হইয়া দেখা দিয়াছে, জীবনের পথে—প্রিয়ের সন্ধানের যাত্রা-পথে সংগ্রাম করিবার জন্য বিরহিনী তাহাই মাথায় লইয়া যাত্রা করিল। কোথাও পদ্মটীর গন্ধটুকুই আকুল করিয়া দিয়াছে—দেখা নাই, বিরহী আত্মা কাঁদিয়া বলিতেছে—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি—
* * *
জেগে দেখি দখিন হাওয়ায় পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া!"

এই এক মিলন বাঞ্ছাই সমস্ত কবিতার প্রাণ। কোথাও বিরহ, কোথাও মিলন—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম,
পুণ্য হ'ল অন্তর।
আলোকে মোর চক্ষুদুটী
মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি—
* * *
এই জনমে ঘটালে মোর জন্মজনমান্তর।

প্রিয়তমের সহিত মিলন মহাসুন্দরের মধুর সঙ্গ কবির চিত্ত ভরপুর রাখিয়াছে। তাঁহার বাণী, তাঁহার সাহচর্য্য,—আর কিছু কামনা নাই। আত্মা, বধুটীর মত প্রেমাস্পদের বক্ষের আশ্রয় খুঁজিতেছে—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো,
হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশ খানি দিও।

তাঁহার "রাজা" নাটকে এই প্রেমের কবিতার চরম অভিব্যক্তি পাই। সেখানে "ঠাকুরদাদা"র একটী সুন্দর গান আছে—

"আমার সকল নিয়ে বসে আছি
শুধু সেই সর্ব্বনেশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি,
পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা
যায় যে দেখে
ভালবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায়।

এই এক প্রেমাঞ্জন চোখে মাখিয়া কবি ঋতুর বৈচিত্র্য প্রকৃতির লীলা, একই দেখিতে-ছেন।

বসন্ত যেন প্রিয়তম সাজিয়া আসিয়াছে, বেণুবন, আমের মঞ্জরী, রবির আলো সব বধূ সাজিয়া মিলনোন্মুখ।

বসন্ত ডাক দিয়া কহে,—

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি—"
তোমরা আমায় চেন কি?

সন্ধ্যাবেলার চামেলী, সকাল বেলার মল্লিকা শুভ্র সুন্দর মুখটী দুলাইয়া বলিয়া উঠিল—

"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ।
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।"

বসন্ত কহে "ঘর ছাড়া পাগল" আমি— কে আমাকে ডাক দিল? আমের বন হইতে

গন্ধ মধুর মৃদু উত্তর আসিল,—সে আমি,—আমের মঞ্জরী। তোমাকে "না চিনিতেই ভাল বেসেছি।" বিদায়ের ক্ষণে ঝরাফুলে ছাওয়া পথে সঙ্গী খুঁজতে তরুণ করবী প্রীতি প্রফুল্ল মুখে আসিয়া হাত ধরিল।

আবার দেখি—

বসন্ত আসিবে,—আমের বন লাজনত মুখ খানি ঘন পল্লবের ঘোমটায় ঢাকিয়া বধুটীর মত ভাবিতেছে—

"যদি তারে নাই চিনি গো
সেকি মোরে লবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে
জানিনে, জানিনে।

শরতের প্রভাতে শিউলীর তলায় রাঙ্গাবৃন্ত গুলি শুভ্র ফুলের রাশির মাঝে উঁকি দেয়—মুগ্ধ কবি চাহিয়া ভাবেন, এ বুঝি প্রিয়তমের চরণের রক্তিম আভা।—

"আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে।"

ঝড়ের দিনে মনে হয়—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু গো আমার।"

শ্রীরাধিকা বুঝি এইরূপ ভাবাবেশে নবনীল মেঘ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন, তমালের শ্যাম ছায়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেন।

প্রভাতে প্রথম রবিকর আসিয়া পড়ে যেন নীল সমুদ্রের পরপারে প্রবাসী প্রণয়ীর পত্রটীর মত। শ্যামা, তন্বী, ধরণী, তাল তমালের ছায়ায় পিঠে চুলের রাশি এলাইয়া পা ছড়াইয়া সেই প্রতিদিনকার এক পত্রখানি মেলিয়া প্রিয়সম্ভাষণ পড়িতে বসিয়া যায়ঃ—

"হে ধরণী,
কেন প্রতিদিন,
তৃপ্তিহীন,
একই লিপি পড়ো বারে বারে?"
(পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী)

জীবনের সকল অনুভূতিতে, বাস্তব, অবাস্তব সকল রাজ্যে, কবি প্রেমকে এক নূতন অভিনব মধুর বিচিত্র বিকাশ দিয়াছেন। এমন বৈচিত্র্য আমরা কোথাও পাই না। এই বৈচিত্র্যের প্রবাহে, কাব্য ও দর্শনের, উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের, জ্ঞানের ও প্রেমের মধুর মিলন আমরা অনুভব করি। সত্যং শিবং সুন্দরং আনন্দং এই চারিস্বরূপ এক অখণ্ডরূপে কাব্য পিপাসুর মানস নেত্রে প্রতিভাত হয়। "লিপিকা"তে এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন—"সকল সুরই এসে সুন্দরের ধুয়োয় মিল্‌বে।" তাঁহার কাব্যে, অক্ষরে অক্ষরে এই সত্য আমরা অনুভব করি।

গান

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তি ভরা কোন্ বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে
কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি
খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী,
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়
মর্ম্মরিছে গহন বনে বনে।
যে নৈরাশ্য গভীর অশ্রুজলে
ডুবেছিল বিস্মরণের তলে।
আজ কেন সে বনযূথীর বাসে
উচ্ছ্বসিল মধুর নিঃশ্বাসে
সারা বেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়
গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা -া। গা -া রা -মা I মগা -া। -া -া -া -া I গা -পা।
ম ॰ ধ্যা ॰ দি ॰ নে র্ ॰ ॰ ॰ ॰ বি ॰

গা -পা পা -হ্মা I পা -া। পা -হ্মা পা -া I পগা -া।
জ ন্ বা ॰ তা ॰ য় ॰ নে ॰ ক্লা ন্

গা -মা পা -া I পা -র্সা। -া -া -া -া I না -র্রা। র্রা -র্সা র্রর্সা
তি ॰ ভ ॰ রা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ কো ন্ বে ॰ দ

-া I না -পা। পা -হ্মা ধপা -া I মা -া। গা -রা রা -মা I
॰ না র্ মা ॰ য়া ॰ স্ব প্ না ॰ ভা ॰

মগা -া। -া -া -া -া I গা -া। রা -া রা -পা I পমা -গা।
সে ০ ০ ০ ০ ০ ভা ০ সে ০ ম ০ নে ০

রগা -রসা -ন্া -া II
ম ০ ০ ০ নে ০

II { পা -হ্মা। ধা -া পা -া I পর্সা -া। র্সা -া র্সা -া I
কৈ ০ শো ০ রে ০ যে ০ স ০ লা জ্

র্সা -া। না -র্রা র্সা -না I র্র্সা -া। -া -া -া -নধা I ধা -া।
কা ০ না ০ কা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ খুঁ ০

না -া র্সা -া I র্সর্রা -া। -া -া -া -র্সা I র্সা -র্গা। র্গর্রা -া র্সা
জে ০ ছি ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ প্র ০ থ ম্ প্রে

-া I না -া। ধা -া পা -া } I র্গা -া। র্রা -া র্সা -া I না -া।
০ মে র্ বা ০ ণী ০ আ জ্ কে ০ ন ০ তা ই

ধা -পহ্মা পা -হ্মা I পা -হ্মপা। পগা -া -া -া I পা -হ্মপা। পগা
ত প্ ত ০ হা ও য়া ০ ০ ০ হা ও য়া

-া -া -মা I গা -া। গা -া রা -া I সা -া। সা -া রা -া I
০ ০ য়্ ম র্ ম ০ রি ০ ছে ০ গ ০ হ ন্

রপা -া। পগা -া -া -মা I রগা -া। রসা -া -ন্া -া II
ব ০ নে ০ ০ ০ ব ০ নে ০ ০ ০

II { ধা -া। ধা -ণা ণধা -া I পা -া। -া -া -ধা -মা I
যে ০ নৈ ০ রা ০ শা ০ ০ ০ ০ ০

মা -া। পা -ধা পা -মা I গা -া। -া -া -মা -রা I রা -গা।
গ ০ ভী র অ ০ শ্রু ০ ০ ০ ০ ০ জ ০

রা -পা পমা -া I গা -া। গা -রা সা -ন্ I ন্ -া। ন্ -া
লে ০ ডু ০ বে • ছি ০ ল ০ বি • স্ম •

সা -া I সা -মা। -া -া -মা -গা I রা -গা। রা -পা পমা -া I
র ০ ণে • ০ ০ ০ র্ ত ০ লে • ডু ০

গা -া। গা -রা সা -া } I পা -া। ধা -া পা -া I পর্সা -া।
বে ০ ছি ০ ল ০ আ জ্ কে ০ ন ০ সে •

র্সা া র্সা -া I র্সা -া। না -র্রা র্সা -না I র্র্সা -া। -া -া -া
ব ০ ন ০ যুঁ ০ থী র্ বা ০ সে • ০ • •

-নধা I ধা -া। না -া র্সা -া I র্সর্রা -া। -া -া -া -র্সা I র্সা -র্গা।
• ০ উ ০ চ্ছ ০ সি ০ ল • • ০ ০ ০ ম •

গর্রা -া র্সা -া I না -া। ধা -া পা -া I র্গা -া। র্রা -া
ধু ০ র • নিঃ ০ শ্বা ০ সে • সা ০ রা •

র্সা -া I না -া। ধা -া পা -া I ক্ষপা -া। পগা -া -া -া I
বে • লা • চাঁ ০ পা র্ ছা ০ য়া ০ ০ •

ক্ষপা -া। পগা -া -া -মা I গা -া। গা -া রা -া I সা -া।
ছা ০ য়া ০ ০ য়্ শু ন্ জ ০ রি ০ য়া •

সা -া রা -া I মপা -া। গা -া -া -মা I রগা -া। রসা -া
ও ০ ঠে ০ ক্ষ • ণে ০ ০ • ক্ষ • ণে •

-ন্ -া II II
• ০

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

কুণাল

বৃদ্ধ ঘাতক দাঁড়ায়ে সমুখে
কম্পিত-কায় স্তম্ভিত-মুখে
লুণ্ঠিত অসি ভুঁয়ে—
বলি-চিহ্নিত ললাটে তাহার
ক্লান্ততা ভরে দোলে স্বেদহার
নিঃশ্বাসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দীর্ঘ জীবন যাপিল যেজন
মৃত্যু-আদেশ করিয়া সেবন
আজি সে মৌন কেন—!
কোন্ দ্বিধা আজ জাগে তার মনে ?—
ওই বুঝি তার পাংশু নয়নে
জ্বলিছে অশ্রু যেন !

রাজার কুমার কিশোর কুণাল
—বিশ ফাগুনের অর্ঘ্যের থাল—
কহিল ডাকিয়া তারে
"এসো গো নলক দিন হল শেষ
পালন করহ তোমার আদেশ
বলিতেছি বারে বারে।

পরুষ হস্তে মলিন বসনে
মুছিয়া অশ্রু শুষ্ক নয়নে
বৃদ্ধ কহিল—"হায়—
শেষকালে মোর এই ছিল লিখা
তোমার তনুর রক্তের শিখা
দহিল আমার কায়!"

"রক্ত সন্ধ্যা দিবসের শেষে
মিলায় যেমন আঁধারের দেশে
আঁখির আড়াল হ'তে
ছেড়ে দাও মোরে কুমার কিশোর
চলে যাই আমি অরণ্যে ঘোর
ত্যজি রক্তিম পথে।"

"যেয়োনা যেয়োনা শোন গো নলক
শোন মোর কথা—মোছ দুই চোখ।
তাকাও আমার পানে—
শৈশব হ'তে দেখিয়াছ মোরে
পালন করেছ বুকে কাঁধে ক্রোড়ে
কতনা গল্প গানে !"

"তোমার হাতের এ দণ্ডটুক্
সহিতে আমার কাঁপিবে না বুক
যতনা কঠিন হোক্—
শৈশবস্মৃতি বিজড়িত করে
ভয় কি বন্ধু সাহসের ভরে
ফেলো তুলে মোর চোখ !"

"মৃত্তিকা-মদ ঢালিয়া তূর্ণ
আমার জীবন হ'য়েছে পূর্ণ
বর্ষে বর্ষে ভাই
বিশ ফাগুনের বিশখানি মালা
আজো জাগে তারা চিরসুধা ঢালা
কোথাও ম্লানিমা নাই।"

"কত লোক যারা আছে চোখ মেলি
ধরণীর শোভা যায় পায়ে ঠেলি
দেখে নাকো চোখ চেয়ে—

আঁখি মেলি আমি এই বসুধার
লভিয়াছি স্বাদ সকল সুধার
উঠিয়াছি গান গেয়ে।"

"চোখ যদি যায় এমন কি ক্ষতি
মানস-প্রদীপে করিব আরতি
মানসী দেবীরে মোর—
আঁখি যদি যায় যাবে মোর আলো
উজল ভুবন লাগিবে ঘোলালো—
যাবে নাকো আঁখি লোর।"

"বনের বিজনে ফুটিবে করবী
ফাগুন প্রাতের হৃদয়ের ছবি
শিশিরেতে সমাকুল—
শিরিষ শাখায় ফুলের জোয়ার
ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে আবার
ডুবায়ে শাখার কূল"—

"আর না এ সব হেরিবরে চোখে
কত ছবি হায় দ্যুলোকে ভূলোকে
কত বরণের ধারা—
বিদায় লভিলে নয়নের আলো
ভেদিয়া সন্ধ্যা আঁধারের কালো
জাগিবে নাকি গো তারা"!

পূর্ণিমা

জ্যোৎস্নার মৃণালসূত্রে বুনিতেছে নিত্য তুমি জাল
ঊর্ণনাভ তুমি
তেমনি রচিছে নিত্য স্বপ্নছায়া স্মৃতির জাঙাল
এই মর্ত্ত্যভূমি।
দিগন্তের দীর্ঘশ্বাসে মাঝে মাঝে টুটি যায় পাশ
আসে পৌর্ণমাসি—
বেদনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিত দুরন্ত নিঃশ্বাস—
তাই বাজে বাঁশী।

কি ছলনা জানো তুমি-আপনারে কেন বারম্বার
ওগো কলানাথ—
তিমির সমুদ্রতলে পদেপদে ডুবাও আবার
খেলা কার সাথ!
আজিও কি হয় নাই শেষ তব অপূর্ব্ব আদিম
সমুদ্র মন্থন—
থাকা-না-থাকার লীলা দোলা দেয় রহস্য-অসীম
অস্তিত্ব আপন।
তোমার সে ডাক লাগে লক্ষ্মীছাড়া সাগরে
সাগরে
তরঙ্গ-স্তনিম
তোমার সে ডাক লাগে রমণীর রক্তের সায়রে
ছন্দে রিম ঝিম

তোমার সে ডাক লাগে ধরণীর অন্তঃস্থল ভেদি
মর্ম্মের ভিতরে—
তিলে তিলে কক্ষ ছাড়ি উপেক্ষিয়া সংসারের বেদী
ধায় শূন্য তরে।

পূর্ণিমায় ডাকো যবে অন্তহীন সান্ত্বনার রবে
সে বারতা শুনি
অমাবস্যা অন্ধকারে কোথা হ'তে টানেরে নীরবে
শব্দ-সুরধুনী
অন্তহীন তমিস্রায় ভরো পাত্র আরেক অমৃতে
লাগে লাগে নেশা—
অসংখ্য তারার স্বপ্ন ভেসে ওঠে ধরণীর চিতে
আলোক-আবেশা।

সে কোন্ অলক্ষ্য এক অতিদূর চাঁদের নেশায়
জাগিল জোয়ার—
সংসার পাষান-তটে অতলের তরঙ্গেরা হায়—
কাঁদে বারম্বার—
হে সৌম্য হে একবন্ধু অন্তভীরু সন্ধ্যাতারকার
ধরণী-বল্লভ—
প্রেম ক্ষুব্ধ চক্ষুসম লজ্জাভারে আতন্দ্র তোমার
নয়ন-পল্লব।

তোমারো মহান্ এক অতিদূর আছে নিত্যশশী
যাহার ইঙ্গিতে—
মাঘের সহস্র কুঁড়ি—বন্ধটুটি ওঠেরে উচ্ছসি
একটি-সঙ্গীতে
যেথা হ'তে স্বপ্নধনু গাঁথা সেই সৌন্দর্য্য সাগরে
লাগে-লাগে টান
বিকশি বল্লরি ওঠে রমনীর তনু তন্ত্রীপরে
গীত দৃশ্যমান্

সেখানে লুকানো আছে মানুষের সকল অমৃত
সব সুখ আশা
তাহারি উদ্দেশে ফেরে চিরকাল একান্ত তৃষিত
তপ্ত ভালবাসা—
আমায় সকল গান লক্ষ্য করি সেই অলক্ষ্যেরে
ওঠে নিত্য দিবা—
মুমূর্ষু মাণিক সম উজ্জ্বলিয়া তোলে ওরে এরে
স্বর্গী সেই বিভা।

প্রভাত অরুণ কান্তি খুঁজিতেছি রাখীর বন্ধন
তোমারি আশায়—
জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত সূক্ষ্মশুচি পান্নার বরণ
পোড়েন-টানায়—
বিরহ-বিচ্ছেদে বোনা হাসিকান্না-পুষ্প-অভিনব
জীবনউত্তরী
হে অলক্ষ্য হে একান্ত একদিন দিব পায়ে তব
সেই আশা করি।

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

[আগামী মাসে প্রাচীন আসামী কবি পশুপতিরামের জীবনী প্রকাশিত হইবে]

১

সহস্র স্মৃতির মৌন জপমালাটিরে
বারম্বার আবর্ত্তিয়া চিত্ত মাঝে ধীরে
ফিরিতেছি নিজ মনে ; দিবস কৃপণ
রেখে দিল লুকাইয়া তার সর্ব্ব ধন
সন্ধ্যার গুহার তলে ; বর্ষন-শেষের
মুক্তা-স্বচ্ছ বৃষ্টি-বিন্দু দোলে দিগন্তের
ললিত বেণীর প্রান্তে ; জুড়ি পথতল
পুষ্পশ্বাস স্পন্দমান আতপ্ত শাদ্বল
অন্ধকারে সাড়া দেয়। না চলে নয়ান
তবু বুঝি শুভ্রযূথী গন্ধ-অনুমান
প্রস্ফুটিত লুপ্ত বনে। ক্লান্ত ঝিল্লি ধ্বনি
ক্ষণেক বিশ্রাম মাগে—ডাকিবে এখনি।
পাওয়া-না পাওয়ায় বোনা জাল খানি ধীরে
ফেলি আর টেনে তুলি জীবনের নীরে।

২

স্মৃতির মঞ্জুষা খুলি দেখিতেছি গণি
কয়েকটি আছে আজো তব স্পর্শমাণ
ভীরু-পাখী বারে-ফিরে-ফিরে-ডাকা
মধু-রস সৌরভেতে আনমিত শাখা
নিকুঞ্জের ; মধু-কান্তি মৃণাল রুচির
চন্দ্রকান্ত মণি খানি পূর্ণিমা রাতির
মৃদু ; শিশির-ক্ষণিক স্পর্শ চিরন্তন
পাশে আপনারে বন্দী করি। লুব্ধ মন
উলটি পালটি দেখে প্রতিটিরে তুলি
চেতনার সূর্য্যালোকে—করে ঝলমল
বেদনার ইন্দ্রধনু কল্পনা-সম্বল
আপনার শূন্যতায় আপনি আকুলি।
ব্যথার বজ্রেতে বিদ্ধ স্মৃতির মণিতে
এক খানি গাঁথি মালা গনিতে গণিতে।

৩

গোধূলির চিতাভস্ম সর্ব্ব অঙ্গে মাখি
চলে গেল অস্তপথে বিরাগী দিবস—
মণিবন্ধচ্যুত শেষ রবি-রশ্মি-রাখী
ফেলে গেল অবহেলে বীত-সর্ব্ব-রস।
স্মৃতি বিভূতিতে তব সর্ব্ব তনু ঢাকি
আজি আমি ঘুরিতেছি গৃহ হ'তে দূরে
কভু জন কোলাহলে কখনো একাকী
সর্ব্বদাই চিত্ত বাঁধা তব মুগ্ধ সুরে।
বৈশাখের খর রৌদ্রে তাম্রগিরি চূড়ে
প্রাসাদ-প্রাকার জাগে অতীত-অঙ্কিত ;
ইস্পাত-ধবল গঙ্গা চলে ঘুরে ঘুরে
বালুর বন্ধন ডোরে বড়ই শঙ্কিত।
নল দময়ন্তী সম এ দুটি প্রাণীরে
অখণ্ড বসন-ভাগা কোথা টানে ধীরে।

৪

তুমি ছিলে কৈশোরের পাষান পুরীতে
আপনারে না জানিয়া তন্দ্রাতলে লীন
আমি এনু অকস্মাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে
অপূর্ব্ব-পথিক-পথে পান্থ উদাসীন।
যৌবনের স্বর্ণকাঠি খেলিবার ছলে
সহসা রাখিনু সখি শিথানে তোমার

অজ্ঞান তুষার গলি নয়নের জলে
শ্যামলতা প্রকাশিল গিরি শ্রেণী তার।
চরণের চঞ্চলতা রাজিল নয়নে
কৈশোরের প্রান্তে এলো প্রথম গোধূলি—

অলক্ষ্য বীণার তারে যেন ক্ষণে ক্ষণে
কেঁপে ওঠে মূর্চ্ছনায় দশটি অঙ্গুলি।
মনে রেখো আমিই সে দিয়েছিনু বলে
তুমি নারী—সর্ব্ব আগে—এই বিশ্ব তলে।

স্বস্তি

প্রিয়সুহৃদে রোমকবিদুষে

শ্রীমতে তুচ্চয়ে—

অপ্রিয়ৈঃ সহ সংযোগো বিয়োগশ্চ প্রিয়ৈঃ সহ।
দুঃখাবিত্যাহ সম্বুদ্ধস্তৎ তথেতি ন সংশয়ঃ ॥১॥
গুণস্ত্বতিমহান্ কশ্চিদ্ বিয়োগস্য প্রিয়ৈঃ সহ।
সম্বুদ্ধেনাপি নো তেন লক্ষিতঃ প্রতিভাতি মে ॥২॥
প্রিয়ো বহির্হি সংযোগে বিয়োগে ত্বন্তরেব সঃ।
নূনং তেন বিয়োগোঽপি সংযোগ এব জায়তে ॥৩॥
তদ্দূরমপি গচ্ছংস্ত্বমাগচ্ছস্যন্তরেব মে।
সংযোগমাবয়োরেবং কশ্ছেত্তুং প্রভবেদিহ ॥৪॥
অপৈতি চিন্তিতং ক্বাপ্যচিন্তিতমপ্যুপৈতি চ।
স্বপ্নেঽপি চিন্তিতা কেন হন্তেদং যদুপাগতম্ ॥৫॥
নূনমবিতথং প্রেয়ন্ সাম্প্রতমুপলভ্যতে।
বিদ্বদ্ভির্যদ্ বিচার্য্যোক্তং "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" ॥৬॥
কিমন্যদুচ্যতামস্মিন্নবকাশে বতেদৃশে।
গতিস্তেঽস্তু ভবত্বেষা পুনরাগতয়েঽচিরম্ ॥৭॥
ভূয়াৎ তে কুশলং শশ্বদ্ ভূয়াদ্ বিজয় উত্তমঃ।
প্রীতিঃ পরস্পরস্মৃত্যা ভূযাচ্চোপচিতা চিরম্ ॥৮॥

বি. স. ১৯৮২ বিধুশেখরস্য।

কার্ত্তিককৃষ্ণৈকাদশ্যাম্।

* বিলম্ব হেতু আশ্রমসংবাদ এ মাসে বাহির হইল না। উৎসব-পূর্ব্ব সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আশ্রমের খবর প্রকাশিত হইবে।